

সেনপথে

ভারত-ভ্রমণ ।



A

GUIDE TO TRAVELLERS IN INDIA.

১৮৮৫

শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষাল প্রণীত ।

কলিকাতা

মশজীদবাগী ষ্ট্রীট ২ সংখ্যক ভবনে

সেনপথে

শ্রীহীরালাল ঘোষদ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত ।

১২৯১ শাল ।

বিজ্ঞাপন।

—•—

আমি কার্যাবশতঃ কয়েকবার ভারত ভ্রমণের সুবিধা পাইয়াছিলাম। চতুর্দিক রেলওয়ে সমাচ্ছন্ন হওয়ার সকলেই ভ্রমণকরিতে সমুৎসুক। বস্তুতঃ ভ্রমণের দ্বারা ঐতিহাসিক পদার্থ আর কিছুই নাই। বাণিজ্য, জীবিকা ও তীর্থের জন্তও বহুলোক যাত্রায় কলঙ্কিত। কিন্তু কেহ বা দর্শনযোগ্য পদার্থ সকল না জানিয়া, কেহ বা প্রভাবিত, কেহ বা বিপদাপন্ন, কেহ বা পীড়াগ্রস্ত ও কেহ বা অর্জুপথে অর্থহীন হইয়া ভ্রমণমানে দেশে প্রত্যাবর্তন হন। এই সকল কারণ বশতঃ সাধারণের হিতার্থে এই পুস্তক প্রকাশিত করিলাম। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে পোশোয়ার ও পোশোয়ার হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত রেলওয়ের সুবিধামত প্রত্যেকস্থানে দেখিবার যোগ্য পদার্থ, পণ্যদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য, পথ, ঘাট, তীর্থ, দেবালয়, মন্দির, প্রাচীনস্থান, দেশের আচার ব্যবহার, ভাষা, ইতিহাস, বন, উপবন, পর্বত, উপত্যকা, নদ নদী সাগর ও তৎপরিবর্তন সকল যথাসাধ্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বিনিবেশিত করিয়াছি। পুস্তক সাধারণের জন্ত অস্পৃশ্য, অস্পৃশ্যের জন্ত সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষেপের জন্ত অনেকস্থানের বর্ণন নীরস করিতে হইয়াছে।

এখনও কার্যানুরোধে, উত্তর ও পূর্ব, বাঙ্গালার সততঃ ভ্রমণ করিতেছি। একত্র প্রায় ৪ বৎসর হইল এই পুস্তক একবার মুদ্রিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন পুনরায় মুদ্রিত হইল। সাবকাশ্যভাবে অল্পকাল শোধন করিতে সক্ষম হই নাই। কেবল কয়েকটি মাত্র ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলাম। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দোষ মার্জনাপূর্বক পাঠ করিবেন। অবকাশ হীন গ্রন্থকারের এই রূপ প্রত্নদ্বারা যদি সাধারণের কিছু মাত্র উপকার বোধ হয় তাহা হইলেই ভ্রম মার্জক ইতি।

কলিকাতা।

১৪৭ নং কটন স্ট্রীট

২৫ পৌষ সম ১২৯১।

ঐশ্বর্যনাথ দেবশর্মা।

সূচীপত্র ।

—••—

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
কলিকাতা ...	১	মিহিজাম ...	১৪
হাবড়া ...	৫	জামতাড়া ...	১৪
কোননগর ...	৬	খরমাতার ...	১৪
ঐরামপুর ...	৬	মধুপুর ...	১৪
বৈষ্ণবাটী ...	৬	পার্শ্বনাথ ...	১৪
চন্দননগর ...	৬	বৈষ্ণনাথ ...	১৪
ভুগলী ...	৬	শিমুলতলা ...	১৫
সাতগাঁ ...	৭	নওয়াদি ...	১৫
মগরা ...	৭	গিধোর ...	১৫
ত্রিবেণী ...	৭	জামুই ...	১৫
পাণ্ডুরা ...	৮	লক্ষ্মীসরাই ...	১৫
বর্দ্ধমান ...	৮	গুজরা ...	১৫
কাহ্ন ...	১১	বোলপুর ...	১৫
মানকর ...	১১	আমদপুর ...	১৬
পানাগড় ...	১১	সাইতা ...	১৬
অণ্ডাল ...	১১	সিউড়ী ...	১৬
রাণীগঞ্জ ...	১২	অষ্টাবক্রতীর্থ ...	১৬
মেছাড়শোল ...	১২	মল্লারপুর ...	১৬
সীতারামপুর ...	১৩	নলহাটি ...	১৬
বরাকর ...	১৩	মুরশিদাবাদ ...	১৭
শিটকোআদি ...	১৩	মুরারি ...	১৮

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
রাজগাঁ ...	১৮	জৈনদেরপাবাপুরী ...	৩১
পাকুড় ...	১৮	দানাপুর ...	৩২
বাহোয়া ...	১৮	তাড়কারবন ...	৩২
তিনপাহাড় ...	১৯	আরা ...	৩২
রাজমহল ...	১৯	বৌদ্ধদেরমহাসর ...	৩৩
মহারাজপুর ...	২০	বিহিয়া ...	৩৩
সাহেবগঞ্জ ...	২০	ডুমরাও ...	৩৩
কহোলগ্রাম ...	২০	বকসার ...	৩৩
ভাগলপুর ...	২১	জমানীয়া ...	৩৪
শুলতানগঞ্জ ...	২১	মোগোলসরাই ...	৩৪
বরিয়ানপুর ...	২২	কাশী ...	৩৪
জামালপুর ...	২৩	অন্তরগৃহযাত্রা ...	৪১
মুন্ডের ...	২৩	পঞ্চকোশীযাত্রা ...	৪২
লক্ষ্মীগরাই ...	২৪	জৌনপুর ...	৪৩
পথিকেরসতর্কতা ...	২৫	দোপাপুরতীর্থ ...	৪৩
মোকামা ...	২৬	অযোধ্যা ...	৪৪
বাড় ...	২৬	প্রাচীনপ্রাবল্টি ...	৪৭
পাটনা ...	২৬	লক্ষৌ ...	৪৭
বাঁকীপুর ...	২৭	নৈমিষারণ্য ...	৫২
হাজিপুর ...	২৭	কান্ধকুজ ...	৫৩
প্রাচীনবৈশালী ...	২৭	প্রাচীন,সাংক্যা ...	৫৪
বাথরা ...	২৭	সাজেহানপুর ...	৫৪
গয়া ...	২৮	বরেলী ...	৫৪
জরাসন্ধেররাজগৃহ ...	৩০	বৌদ্ধদেরপিলিভিত্ত ...	৫৪
গিরিব্রজ ...	৩১	দ্রোণেরঅহিচ্ছত্র ...	৫৫
মলিনাগেরবারাগ্রাম ...	৩১	পাণ্ডুদেরআশ্চর্য্যভূগ ...	৫৫
বিশ্বামিত্রযজ্ঞস্থান ...	৩১	রূপদেরকাপ্পিলানগর ...	৫৬

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
শরন বা শূকরক্ষেত্র	... ৫৬	মৎস্ত বা বিরাট	... ৭৯
মুরদাবাদ	... ৫৭	আজমীর	... ৭৯
নৈনিতাল	... ৫৭	পুষ্পরতীর্থ	... ৭৯
পাণ্ডুরদ্রোণমাগর	... ৫৭	মথুরা	... ৭৯
আলমোড়া	... ৫৮	বৃন্দাবন	... ৭৯
পঞ্চপ্রয়াগ	... ৮৫	আলিগড়	... ৮৩
বদরীনারায়ণতীর্থ	... ৫৮	দিল্লী	... ৮৩
কেদারনাথ	... ৫৮	ইন্দ্রপ্রস্থ	... ৮৮
কৈলাসেরপথ	... ৫৯	কুতবমিনার	... ৯২
চুণার	... ৬০	ভোগল্লাকাবাদ	... ৯৬
বিস্বাপর্বত	... ৬০	দিল্লীহইতেবিদায়গ্রহণ	... ৯৮
মির্জাপুর	... ৬০	মিরট	... ৯৮
নইনি	... ৬১	হস্তিনা	... ৯৯
প্রয়াগ বা এলাহাবাদ	... ৬১	সরধন	... ৯৯
প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর	... ৬৩	সারনপুর	... ১০০
প্রাচীনকোশাষী	... ৬৪	হরিদ্বার	... ১০০
রামায়ণেরশৃঙ্গবেরপুর	... ৬৪	দক্ষযজ্ঞ স্থান কনখল	... ১০১
কাণপুর	... ৬৪	মধ্যবার	... ১০২
ইটোয়া	... ৬৪	কণ্ঠ ও শকুন্তলার আশ্রম	... ১০২
আগরা	... ৬৪	দেহরাডুন	... ১০২
কেলা	... ৬৪	মসৌরি ও লাণ্ডর	... ১০২
ভাজমহল	... ৬৪	হিমালয় শৃঙ্গের পরিচয়	... ১০৩
এতমর্দোলা	... ৭৩	যমুনা পুল অতিক্রম	... ১০৩
সেকেন্দ্রা	... ৭৪	অম্বালা	... ১০৪
ফতেপুরশিকরী	... ৭৫	কুষ্কক্ষেত্র	... ১০৪
ভরতপুর	... ৭৭	সিমলা	... ১০৬
জয়পুর	... ৭৮	রাজপুরা ও পতিয়ালা	... ১০৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
সরহিন্দ ১০৭	মারকুও ১২৪
লুধিয়ানা ১০৭	চিত্রকূট ১২৪
শতজ্ঞ নদীপার ১০৭	সতনা ফেসন ও রেওয়া ১২৪
জলন্ধর ১০৭	জর্জলপুর ১২৫
নগর কোট তীর্থ ১০৮	নর্মদার ঘাট ১২৬
মনিকর্ণি উষ্ণ প্রভাবন ১০৮	নর্মদার প্রপাত ১২৬
জ্বালামুখী তীর্থ ১০৮	মার্কেল পাহাড় ১২৬
কিরতার পুর ও কপূরতলা ১০৮	প্রাচীন ত্রিপুর নগরের	
বিপাশা পার ১০৮	অবশেষ ১২৭
অমৃতসর ১০৯	নর্মদা পার ১২৭
মিয়ান মিয়ান ১০৯	বিস্ফাটবী ১২৭
আনার কুলী ১০৯	পথিকের সতর্কতা ১২৮
লাহোর ১১০	নর্মদা প্রদেশ ১২৮
পঞ্চাবের আচার ১১১	খাণওয়া ১২৮
মুলতান ১১১	মালব রাজ্য প্রবেশ ১২৮
ইরাবতী ও চন্দ্র ভাগা পার ১১২	বিস্ফোর সৌন্দর্য ১২৮
জুজরাট ১১২	ঐক্যের মহাদেব ১২৯
কাশ্মীরের পথ ১১৩	মণ্ডলেশ্বর ১২৯
কাশ্মীর জমণ ১১৫	কার্তবীর্ষ্যের রাজধানী মাহি-	
হিমালয়ে আরোহণ ১১৮	অতী ১২৯
কাশ্মীরের তীর্থ ১১৯	জমদগ্নির আশ্রম ১২৯
কাশ্মীরের আচার ১২২	ইন্দোর ১২৯
পেশোয়ার ১২২	উজ্জয়িনী ১২৯
আশ্চর্য্য প্রান্তর ১২৩	আশীরগড়ের কেল্লা ১৩২
অশ্ব যাত্রা ১২৩	বুরহানপুর ১৩২
নৈনিতে আরোহণ ১২৩	তাণ্ডী নদী পার ১৩২
বিস্ফোর শোভাদর্শনারস্ত ...	১২৩	নাগপুর প্রবেশ ১৩২

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
আজ্ঞাটার গুহা ...	১৩৩
নিজামরাজ্যে আরাজাবাদ	১৩৩
অশ্রমিক দৌলতাবাদ ...	১৩৩
জগদ্বিখ্যাত ইলোরার গুহা	১৩৪
দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটী ...	১৪৭
নাগিক তীর্থ ...	১৪৭
গোদাবরীর উৎপত্তি ...	১৪৮
পাণ্ডুলিনা ও চামারলিনা গুহা	১৪৮
গোদাবরী পার ...	১৪৯
রেল সঙ্ঘ শৈলে আরাহণ	১৪৯
আশ্চর্য্য কোশল আশ্চর্য্য	
সুরঙ্গ ...	১৪৯
সঙ্ঘের ভীষণ অভ্যন্তর ...	১৪৯
সঙ্ঘ হইতে অবরোহণ ...	১৪৯
কল্যাণী ...	১৫০
সলসিট দ্বীপ ...	১৫০
টানা ...	১৫১
বস্বে ...	১৫১
গোরাপুরী দ্বীপ ...	১৫৩
গুজরাট ...	১৫৪
সোমনাথরৈবতাচল ...	১৫৫
ঘারকা ...	১৫৫
কচ্ছ দেশ ...	১৫৫
পশ্চিম সাগরের উপকূল ...	১৫৫
সুরট ...	১৫৬
তাপী সঙ্গম পার ...	১৫৭
নর্থদা সাগর সঙ্গম ...	১৫৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
ডেড়োচ বা ভূগুতীর্থ ...	১৫৭
জগতের মধ্যে প্রকাণ্ড বট	১৫৮
গাইকবাড়ের রাজধানী ...	১৫৮
বড়োদা ...	১৫৮
যযাতির স্বর্গপতন স্থান ...	১৫৯
মহীসাগর সঙ্গম তীর্থ ...	১৬০
আহমদাবাদ ...	১৬০
গুজরাটের ব্যবহার ...	১৬০
অর্কুদাচল বা আবু পাহাড়	১৬১
মহারাত্রী দেশ ...	১৬১
মহারাত্রী ভাষা ...	১৬১
মাধিরন নগর ...	১৬২
সঙ্ঘের শোভা ...	১৬৩
কার্লির গুহা ...	১৬৪
বাদছা বেদছা গুহা ...	১৬৪
পুনা ...	১৬৫
সেতারা ...	১৬৬
মহাবলেশ্বর ...	১৬৬
কৃষ্ণার উৎপত্তি স্থান ...	১৬৬
পুণ্ডরপুর তীর্থ ...	১৬৭
ভীমানদী পার ...	১৬৭
সোলাপুর ...	১৬৭
বিজাপুর ...	১৬৭
গুলবর্গা ...	১৬৮
সাহাবাদ ...	১৬৮
ওয়ার্ডি ...	১৬৮
অন্ধ্র রাজ্য ...	১৬৮

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
হরদরাবাদ ১৬৮	তানজোর ১৭৮
তৈলকী ভাষা ও আচার ১৬৯	কাঞ্চীপুর তীর্থ ১৭৯
গোলকণ্ডা ১৭০	আরকট ১৭৯
কুষ্মাপার ১৭০	ভিলোর মন্দির ১৮০
রাইচোর ১৭১	বঙ্গলুর ১৮০
বর্গাটী ভাষা ও আচার ১৭১	ত্রিপুরপত্তন ১৮০
যুজ ভজাপার ১৭২	মহীশূর ১৮১
বল্লারী ১৭২	সালেম ১৮১
কিকিদ্ধা দর্শন ১৭২	কাবেরীপার ১৮২
পম্পা ও স্বাম্যক ১৭২	কোয়ম্বাটুর ১৮২
মালাবান ১৭৩	নীলগিরিতে আরোহণ ১৮২
রিজয় নগর ১৭৩	পালঘাটে প্রবেশ ১৮৩
কডপ নগর ১৭৪	মলয় দর্শন ১৮৩
মহেন্দ্রাচল ১৭৫	মলবারের ব্যবহার ১৮৪
বালাজী তীর্থ ১৭৫	পশ্চিম সাগর ১৮৪
মাস্ত্রাজ ১৭৫	ছনাবার ১৮৫
ভীষণ পূর্ব সাগর ১৭৫	জগদ্বিখ্যাত প্রপাত ১৮৫
জাবিড়ী ভাষা ১৭৬	মোকর্গ তীর্থ ১৮৭
চেঙ্গলপট্ট ১৭৭	ত্রিচূণাপল্লী তীর্থ ১৮৭
মহাবলীপুর ১৭৭	ত্রীমঙ্গলীর মন্দির ১৮৮
পণ্ডিচরী ১৭৭	ভিণ্ডিগল ১৮৮
তিকনমালী তীর্থ ১৭৭	মহুরা ১৮৯
ত্রিবিকেরো ১৭৭	পাণ্ডাদেশ ১৮৯
কডালুর বন্দর ১৭৮	কন্ডাকুমারী তীর্থ ১৮৯
ময়বরম তীর্থ ১৭৮	মাদ্রাস ১৮৯
কম্বুকোনম ১৭৮	মুক্তা আহরণ ১৮৯
কাবেরী সঙ্গম ১৭৮	মেতুবক ক্রামেশ্বর ১৯০

অশুদ্ধ শোধন ।

—••—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
লইয়া ...	হইয়া ...	৩ ...	২২
রাজেশ্বর ...	রাজা রাজেশ্বর ...	৪ ...	১১
বিচ্ছিন্ন ...	বিচ্ছিন্ন ...	৫ ...	৬
প্রতিবর ...	প্রতিরব ...	৮ ...	১৮
কয়র শোলের ...	খয়র শোলের ...	১১ ...	২২
পাশমতে ...	পান্নমতে ...	৪১ ...	৭
সান্ধকাশা ...	সান্ধাশা ...	৫৪ ...	১০
প্রস্তরের ...	প্রস্ততের ...	৬০ ...	২৩
মুণ্ডী ...	মুণ্ডী ...	৬১ ...	২৭
ভ ...	ভগ্ন ...	৬৯ ...	২৮
হুইটী ...	হুইটী ...	৭১ ...	১০
মমতাজ মহল ...	মমতাজ মহল ...	৭২ ...	১৫
ইস্ত্রাপন্ন * * * কবর ৮০ ...	৮০ ...	২৮
ফেরোজ সাহ'র ...	ফেরোজ সাহের ...	৮৩ ...	২০
এখনও লোকে ...	এখনও লোকে ইস্ত্রাপত বলিয়া থাকে । ফেরোজের কোটলা হইতে জমায়ূনের কবর ... ৮৮ ... ২৮		
মার্কেল লাল ...	মার্কেল ও লাল ...	৮৯ ...	১৮
উচ্চতায় ...	উচ্চতার ...	৯১ ...	১৫
চন্দ্র যন্ত্রের ...	যন্ত্র যন্ত্রের ...	৯১ ...	২২
কোলদান ...	কোলদার ...	৯৫ ...	১৯
দুর্গে ...	দুর্গ ...	৯৭ ...	১
ভিক্ষুক ...	ভিক্ষকের ...	৯৭ ...	৫
সহিত ১০২ ...	১০২ ...	২
গঙ্গাদার ...	গঙ্গাদারের ...	১০২ ...	৯
ব্রহ্মাবর্ত ...	ব্রহ্মাবর্ত ...	১০৫ ...	২৪

অশুদ্ধ শোধন ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তব্বারির	তব্বারির	১০৬	৯
কোলে	কোণে	১০৮	১১
চতুর্কোণ	চতুর্কোণ	১০৯	৮
কদমা	কদম	১০৯	৯
ত্রিমারের	ত্রিমাবের	১১১	১৯
সকলেই	সকলেরই	১১৩	৪
ঐদ	ঐদ	১১৩	১৪
পথ	পদ্ম	১১৫	২১
মলোকরাজ	অশোক রাজ	১২০	১৪
কুণ্ড	কুণ্ড	১২০	১৭
গ্রহ	গ্রন্থ	১২১	১১
উপরি ভাগে	উপরি ভাগ	১২৪	২৬
বর্ষি	•	১২৭	২৭
জেলার	জেলায়	১২৮	২০
অট বিভাগে	আট বিভাগে	১৩০	১২
ছরিন	ছরিন	১৩০	২৫
সরল	সরস	১৫১	১৭
রামতাড়া	তামড়া	১৫৫	১০
সেতু	•	১৫৬	১৩১৪
নিধি	নিধি	১৫৬	২৪
ইছারই	•	১৫৬	২৬
ভাল	মনে	১৭১	১১
আমাদের,	আমাদের	১৭১	২৩
বা সিংড়ার	•	১৭৪	১৩
পঞ্চের	পঞ্চের	১৮২	১৯
সরস্বতী	সরস্বতী	১৮৬	১৫
মহুয়ার	মহুয়ার	১৮৮	২৭
নাই	নর	১৯০	২৭

১৮৮৫

রেলওয়ে

ভারত-ভ্রমণ ।

প্রথম অধ্যায় ।

বঙ্গালা, বিহার ও কালী বিভাগ ।



কলিকাতা হইতে আমরা দেশ ভ্রমণে নির্গত হইলাম । কলিকাতা দুই ভাগে বিভক্ত, সহর কলিকাতা ও সহরতলী কলিকাতা । সহর ও সহরতলী কলিকাতা লইয়া এই মহানগরী গঙ্গার পূর্বতীরে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ ও দুই ক্রোশ বিস্তীর্ণ । ইংরেজেরা কয়েকটি কারণ বশতঃ তিন ক্রোশ দীর্ঘ ও দেড় মাইল বিস্তৃত স্থানকে সহর কলিকাতা নাম দিয়াছেন । সহর কলিকাতায় চারি লক্ষ লোকের বাস । কিন্তু সহরতলী কলিকাতা লইয়া লোকের বাস অত্যন্ত অধিক । সহর কলিকাতায় ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, গ্রীক, চীন, মগ, ভুটানী, নেপালী, আমেরিক, পারস্য, মোগল, পাঠান, আরব, তুরকী, হাযমী ম্যালেয়া প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় স্থানস্থিত ভিন্ন বেশী ভিন্ন ভাষী ও ভিন্ন ধর্মী লোকগণ দিবানিশি কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে । ইহার ত্রিশ বাজার, দশ পটি ও পাঁচ চক দ্রব্যে পরিপূর্ণ । প্রত্যহ লক্ষ লোক প্রবেশ করিতেছে ও লক্ষ লোক বাহির হইয়া যাইতেছে । প্রত্যহ মফস্বল হইতে ৭৥ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রবেশ করিতেছে ও ৫৥ লক্ষ টাকার দ্রব্য তথায় বাহির হইয়া যাইতেছে । প্রত্যহ সমুদ্র যোগে ছয় লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রবেশ করিতেছে ও মুল্যসহ ৮ লক্ষ টাকা জাহাজে বাহির হইয়া যাইতেছে ।

দূর হইতে কলিকাতার ঐশ্বর্য্য দেখিতে আরও ভয়ঙ্কর । মাল পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যহ তিন দিক হইতে তিন রেল যেন ভারত শৃঙ্খল করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে । বিস্তীর্ণ গঙ্গা ও দুই দিকের দুই খাল আচ্ছন্ন করিয়া অসংখ্য মালায়া কলরব করিতে করিতে কলিকাতা প্রবেশ করিতেছে । কিন্তু যেমন তরঙ্গ-মালা সঙ্কুল গর্জ্জনকারী নদী সকল সমুদ্র স্পর্শ মাত্র কোথায় নিমীলিত হইয়া যায়, সেই রূপ এই সবল দ্রব্য কলিকাতা স্পর্শ মাত্র যে কোথায় প্রবেশ করে কিছুই জানা যায় না ।

কলিকাতায় দেখিবার উপযুক্ত অনেক বিষয় আছে। এখানকার গড়ের মাঠ অতি সুন্দর। যতদূর দৃষ্টিপাত কর নবহুর্কাদল মণ্ডিত অশোভন ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তীর্ণ হইয়াছে। তাহারই মধ্যে মধ্যে ভারত-বিজেতা ব্রিটিশ বীর-গণের প্রতিমূর্তি সকল বিরাজমান। এক স্থলে অকটরলোনি মন্ডমেণ্ট ১১০ হস্ত উচ্ছিত হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে সেন্ট পালের বিখ্যাত গির্জার গগণাবলম্বিনী চূড়া। তাহার ডাইন দিকে আলিপুরের উপবনের শীর্ষ সকল নেত্রগোচর হয়। মাঠের মধ্যস্থ পক্ষিরব বিরাবিত নিকুঞ্জমালাবিমণ্ডিত ও ভাগীরথী-প্রবাহ সংস্পর্শন শীতল সমীরণ-সেবিত পথ মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন কবিকুলের বর্ণিত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। পশ্চিমে কোর্ট উইলিয়ম ও বিলাসীগণের সঞ্চরণ যোগ্য পুষ্পমালা বিভূষিত, নিকুঞ্জলতাবিতান-বিমণ্ডিত, উৎসরাজি-সমন্বিত, ব্রহ্মদেশীয় মণ্ডপ-শোভিত অশ্রাব্য সুমনোহর সংগীতরবে নিনাদিত ও বিজাতীয় বামাকুলাকুলিত ইডেনের রমণীয় উদ্যান। তৎপশ্চাতে গঙ্গার বিশাল বক্ষস্থল নির্বিড় অর্ণব-পোতে আবৃত হইয়া গগনমণ্ডলে যেন বন শোভা বিস্তার করিয়াছে। মাঠের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তস্থ সমতল, অশৃঙ্খল, অসজ্জিত মার্বেল শোভা বিনিদ্রিত ও সৌরকিরণে সমুদ্ভাসিত স্বর্ণাকরে দেদীপ্যমান হর্ষামান্যার সৌন্দর্য্য দূর হইতে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন স্বর্ণপুরী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। আকাশে একাধিক পক্ষিগণ বিচিত্র গতিতে সস্তরণ দিতেছে ও নিম্নে ভিন্ন কায় ভিন্ন বেশী লোকগণ যানারাহণে ও পদব্রজে দেখিতে দেখিতে বাহির হইয়া বাইতেছে। গ্রিন্স অব ওয়েলস্ ও তৎপার্শ্ববর্তী লোকগণ ও ক্ষণকাল এই শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গড়ের মাঠের দক্ষিণে আলিপুরের পশু-শালা ও লেকটেনেন্ট গবর্ণরের আশ্রয়। পার্শ্বে জেল ও ঘোড়দৌড়ের স্থান। সর্ব দক্ষিণে কিছু দূরে পৃথিবীর মধ্যে বিন্যাসী বাদসাহ লক্কাবাজারের পশু পক্ষাদি পূরিত উদ্যান শোভিত আশ্রয়। তাহার অপর পারে গঙ্গাতীরে বহুরে বিস্তীর্ণ গবর্ণমেণ্টের বোটানিকাল গার্ডন। ইহাতে ভূমণ্ডলস্থ প্রায় দশ সহস্র ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যস্থিত জ্যোৎস্না রক্ষ অতি একাধিক। গড়ের মাঠের পূর্বদিকে এডিয়াটিক মিউজিয়ম বা মৃত পশুপক্ষাদির আশ্রয়। ইহাতে ভূস্বকীয় ও প্রাণী স্বকীয় নানা বিষয় অব-

লোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করা যায় । ইহার পুস্তকাগার অতি বিশাল এবং ইহাতে বহুকালের প্রাচীন মুদ্রা ও প্রস্তরাদি এত সংগৃহীত আছে যে, এমিয়াথগে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না । মিউজিয়ম বা যাহা ঘরের পার্শ্বে মিউনিসিপাল বাজার । মাঠের পশ্চিমদিকস্থ দুর্গ দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় । দুর্গটী অষ্টকোণ । কলিকাতার দিকে ত্রিভুজাকার পথ বাহু সমভাবে আছে । এবং নদীতীরস্থ বাহুত্রয় অবস্থানুসারে বিবম হইয়াছে । ইহার তুলা সুগঠিত দুর্গ ভারতে আর নাই । কিন্তু নদীতীরের পথ সুরক্ষিত ভূমিভাগ সেরূপ নাই, আক্রমণ করিলে রক্ষা করিতে দশ সহস্র লোকের প্রয়োজন হয় । এত লোক থাকিলে অনায়াসে বাহিরে যুদ্ধ করা যাইতে পারে । দুর্গের উত্তরে পূর্বোক্ত ইডেনের উদ্যান, তাহার উত্তরে নগরবাসীগণের সভাগৃহ টাউন হল । প্রতিমূর্তি-সজ্জিত টাউন হল অতি মনোহর । টাউন হলের নিকট বহুচূড়াগম্বিত হাইকোর্ট ও বিস্তীর্ণ ফাইনেনসাল ডিপার্টমেন্ট ॥ পূর্বে এইটি গবর্ণমেন্ট হাউস ছিল । ইহার সম্মুখে ওয়েলেসলী নির্মিত বর্তমান গবর্ণমেন্ট হাউস বা রাজবাটী । উদ্যানের মধ্যস্থ গবর্ণমেন্ট হাউস অতি শোভাকর, হর্ম্যার চারিকোণে চারিটি খণ্ড বাহির হইয়াছে । গোলাকার পথ দ্বারা এই চারিখণ্ড মধ্যখণ্ডের সহিত সম্মিলিত আছে । মধ্যখণ্ডের গৃহ দুই ভাগে বিভক্ত । বিস্তীর্ণ সোপানাবলি অবলম্বন করিয়া উঠিলে সম্মুখেই মার্কস মণ্ডিত এক প্রকাণ্ড গৃহ । অভ্যন্তরে দক্ষিণে ও বামে ভৌরিক জাতীয় স্তম্ভমালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে । ইহাতেই রাজসিংহাসন সংস্থাপিত । এই গৃহের পর আর এক গৃহ । সমস্তই আইগনিক স্তম্ভ, এইটি বলকম বা নৃত্যাগার । কোণের খণ্ডে গবর্ণর জেনরলের এডিক্‌দের বাস করেন এবং কোন্সিলাদি লইয়া থাকে । নিম্নে আফীস ও গুদাম । গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তর পূর্বে সুসজ্জিত উইলসন হোটেল । নিকটে হ্যামিলটন, কুককেলডী, অহলর, হারমান প্রভৃতি মণিকার ও বণিকগণের বিপনি যেন কলিকাতা প্রাক্কটিত করিয়াছে । ইহাদের উত্তরে উদ্যান মধ্যোলালদিঘী । ইহার গভীরতা ৪০ হাত এবং উদ্যানের প্রত্যেক পার্শ্ব সহস্র হাত । লালদিঘীর চারি পার্শ্ব দেখিতে অতি সুন্দর । দক্ষিণে বিচিত্র তারাগার বা টেলিগ্রাফ অফিস । পূর্বে মুদ্রা পুস্তক কলেক্টরী বা নোটের আফীস । উত্তরে বহুদূর বিস্তীর্ণ রাইটর বিলডিং

উত্তরপূর্ব কোণে অত্যুচ্চ গিরজা। পশ্চিমে গম্বুজ সমন্বিত প্রকাণ্ড পোষ্ট আকীস পোষ্ট আকীসের পার্শ্বে কষ্টম হাউস। এই স্থানে ১৭৫৭ অব্দে ভরস্কর অঙ্করূপ হত্যা ঘটয়াছিল। পোষ্ট আকীসের দক্ষিণে কিছু দূরে গদ্যার ফুলে বেঙ্গল ব্যাক, তদুত্তরে কিছু দূরে বগু হাউস। বগু হাউসের অর্ধ মাইল উত্তরে টাকশাল। লালদিঘীর উত্তর তীর দিয়া পূর্ব মুখে শিয়ালদহগামী রাস্তা দ্বারা কলিকাতা দক্ষিণ ও উত্তর দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রীর অধিবাস স্বরূপ দক্ষিণ খণ্ড ইংরেজ দ্বারা অধিবাসিত। উত্তর খণ্ডে দেশীয় লোকেরা বাস করে। উত্তর খণ্ডে দেখিবার মধ্যে কলেজ কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট। মেডিকেল কলেজের ফিতর হস্পিটাল কোন অংশেই লণ্ডনের ন্যূন নহে, ইহার অভ্যন্তরে এক পশুর দুই মস্তকাদি নানারূপ অদ্ভুৎ প্রসব এবং নানা রোগের ভরস্কর মূর্তি আছে। কলেজের কিছু দূরে চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের পঞ্চাদি পূরিত বাটী দেখিবার উপযুক্ত। নগরের উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব কোণে কলিকাতাস্থ প্রধান লোকগণের আয়াসের উদ্যান। উত্তরে সাত পুকুরের বাগান প্রভৃতি কয়েকটি উদ্যান আছে। উত্তর-পূর্ব কোণে বেল-গেহের পার্শ্বনাথের বাগান। তাহার পার্শ্বে পাইকপাড়ার রাজাদের উৎকৃষ্ট বৈঠকখানা। ইহাতে আদম ও ইভের যে চিত্র আছে ইহার তুল্য চিত্র ভারতে অতি অল্প আশিয়াছে। কিছু দূরে দমদমার গবর্ণমেন্টের সেনানিবেশ স্থান, তন্নিকটে আর একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে। কলিকাতার যে দিকে দৃষ্টি-পাত কর সেই দিকেই নয়ন আকৃষ্ট হইবে। ৬০।৭০ হাজার টাকা আছে এমন লোক প্রত্যেক গলিতেই দেখা যায়। এখানকার নগর পারিপাট্য অতি সুন্দর, পঞ্চ কোশ হইতে ভাগীরথী প্রবাহ আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। কখন বা ত্রিতল উপরে উত্থিত হইয়া গৃহমধ্যে নির্ঝর বারি বর্ষণ করিতেছে, কখন বা পথ প্রান্তে কল্প তরুর ন্যায় অজস্র বেগে জল দান করিতেছে, কখন বা কৃত্রিম বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া রাজমার্গের ধূলিজাল বিনাশ করিতেছে। দক্ষিণ বাম্প সকল নল যোগে আসিয়া গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে পথে পথে পূর্ণ চন্দ্র প্রভা বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। এক এক দীপ হইতে দ্বাদশ বর্তিকা তুল্য আলোক বিনির্গত হয়। পথের গভীর অন্তরে প্রকাণ্ড পয়ঃপ্রণালী নগরের মলপ্রবাহ লইয়া অদৃশ্য ভাবে দূরস্থ খালের দিকে

গমন করিতেছে। দীর্ঘে চারি প্রধান পথ দ্বারা এই মহানগরী বিচ্ছিন্ন। পূর্ব প্রান্তের পথ অতি প্রশস্ত এবং তাহার এক পার্শ্ব দিয়া রেল চলিতেছে। মধ্যস্থলের পথ অতি শোভাশালী। পূর্ণ ৪০ হস্ত বিস্তৃত এই পথের মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট উদ্যান ও নির্মল সলিলপূর্ণ সরোবর। তদনন্তর অতি প্রাচীন অপরিচ্ছন্ন ও সঙ্কীর্ণ চিংপুর রাস্তা। তদনন্তর গঙ্গাতীরের বহু সোপান শোভিত ও বাণিজ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণিত ও রেল বিচ্ছিন্ন গঙ্গাতীরের পথ। কলিকাতার দেশীয় বিভাগে স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ ও অপকৃষ্ট পথ আছে সত্য কিন্তু প্রধান পথ সকল অতি প্রশস্ত ও সরল। যতদূর দৃষ্টিপাত কর সমতল সৌধমালা সরলভাবে চলিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে রক্ষাদি সুশোভিত আলোকদণ্ড সমন্বিত ও প্রভাবনরাজি বিরাজিত মনুষ্য চলিবার উচ্চ পথ। মধ্যস্থলের নিম্ন ভাগ দিয়া বগী, ফেটন, ট্যাণ্ডাম, বেকব, কোচ, হ্যাকনী, শকট, পালকি, ট্রামগাড়ী দণ্ডে চলিষা খান চলিতেছে। যে স্থানে আবহমান কর, যান সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত। সকল পথই লোকে আকীর্ণ। কেবল রাত্রি দুইটার পর কিছু শুদ্ধ হয়। কলিকাতায় প্রায় সর্ব দেশীয় সর্ব বিষয়ক সর্ব দ্রব্যই পাওয়া যায়। এখানে স্কুল, সভা, থেয়াট্র, পুস্তকালয় নাট্যশালা, ময়দাদির কল ও নান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাবিবরণ মন্দির বিস্তর আছে। দুই শত বর্ষ পূর্বে কলিকাতা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, জঙ্গলপূর্ণ, ব্যাজ ও সর্পের আবাস ছিল। মনুষ্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প। পূর্বদিকস্থ বাদার বিলের জল গড়ের মাঠ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হইত। পঞ্চাশ কোশ দক্ষিণস্থ সাগর ও ততীতবর্তী মুন্সের বনের প্রত্যপে লোকের বাস করা ভার হইয়া ছিল। কেবল দক্ষিণদিকস্থ কালীঘাটের তীর্থ দর্শনার্থ লোক আগমন করিত। ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দ অবধি কলিকাতার ঐক্য আরম্ভ হয়। এখন ইহার তুল্য নগর এসিয়াখণ্ডে আর নাই।

কলিকাতা হইতে হাবড়া পর্যন্ত গঙ্গার আশ্চর্য্য ভাসমান সেতু। দুই দিকে গ্যাসের শোভা ও মনুষ্য চলিবার পথ। জাহাজ প্রবেশ করিবার কালে কিয়দংশ উল্লীকিত হয় এবং পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। যখন গাড়ী সকল গমন করে, তখন কি গভীরই গর্জন হইতে থাকে। পুল পার হইয়া হাবড়া ফেসন। এই থান হইতে জেটি খচিত কলিকাতা দেখিতে অতিচমৎকার। ফেসনের উত্তরে বহু দূর পর্যন্ত ডক-ইয়ার্ড। দূরে মুসড়ীর কল। হাবড়ার

ষ্টেসবের ডাব মিডাস্ত দান্তিক । নদী সকল সাগরে প্রবেশ করিবার কালে বেধন মুখ্যবাদন করিয়া সমস্ত গোরব বিস্তার করে, হাবড়া ষ্টেসন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সেই রূপ গোরব প্রকাশ করিতেছে । কত দিকে কত রেল, কত গাড়ী, কত কল, কত মাল কত দূর ব্যাণ্ড করিয়াছে । এইরূপ স্থানে আমরা ট্রেনে আরোহণ করিলাম ।

হাবড়া পার হইয়া উত্তর পার্শ্বশস্ত্রপূর্ণ ক্ষেত্র । পথে চাঁদমারীর পুল । অমতিদূরে কামান প্রস্তুতের প্রাচীন স্থান । তাহার পর বালির পুল । গুয়ারন সাহেবের কোশলে এই পুল বিনির্মিত । ইহা দুই সহস্র স্তূপের উপর অবস্থিত আছে । খালের উপর বড় রাস্তার দোহুলামান পুল ডেজ সাহেবের মতে প্রস্তুত হইয়াছে । নিকটে পাটজনিত কাগচের বল । বালী পার হইয়া কোন্নগর । মধ্যে মধ্যে ধান্য ক্ষেত্র, পানের বরজ ও পনসের ঝোপ । কোন্নগরের অপর পারে পাঁচ ক্রোশ দূরে তিভাগড় নামক স্থানে ৫০ বর্ষ পূর্বে ত্রিশ হাজার মণের উপযুক্ত জাহাজ প্রস্তুত হইত । পূর্বে কোন্নগর প্রকাণ্ড গ্রাম ছিল । পূর্বে বাঙ্গালার মুসলমানদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইলে বল্লাল বিতক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অনেকে কোন্নগর হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালার প্রবেশ করেন । কোন্নগরের ৫১ ক্রোশ পরে জীরামপুর । ১৮১৫ অব্দে দিনেমারের বারো লক্ষ টাকায় কোম্পানিকে এই স্থান বিক্রয় করে । এখানে দেখিবার মধ্যে গির্জা কলেজ ও কোন্নগরের বাগান এই কয়েকটি প্রধান । জীরামপুরের অপর পারে চানকের মনোহর উদ্যান ও পলতার জলের কল । জীরামপুরের পর* বৈদ্যবাটীর প্রকাণ্ড হাট । তাহার তিন ক্রোশ পরে ফরাশিদিগের চন্দননগর, † সহরের উত্তরে প্রাচীন দুর্গের এখনও ভগ্নাংশের দেখা যায় । নদীতীর হইতে ফরাশিদিগের আবাসস্থান দেখিতে অতি সুন্দর । তদনন্তর হুগলী, ‡ এখন যেকপ কলিকাতা বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান ২৫০ বর্ষ পূর্বে হুগলী এরূপ ছিল । তখন পোর্তুগীজ-

* পাত পাঁকাটী কাঠের আট, তিন নিরে বৈদ্যবাটী ।

† গাঁজা গুলি অন্নভাঙ্গা, তিন নিরে ফরাশি ডাঙ্গা ।

‡ যোগল মিশি মাথাঘসা তিন দেখতে হুগলী আসা ।

দিগের বাজালায় বড় আধিপত্য । বর্তমান এমাম বাতীর নিকট তাহাদের
কেলা ছিল । সাজেহানের আশ্রয় ক্রমে ১৬৩২ অব্দে কাশিম আলি হুগলীর
হুগ' করিয়া পোর্তুগীজ দিগকে বিনাশ করেন । ১৬৮৬ অব্দে ইংরেজরা
ও ১৬৯৫ অব্দে উড়িষ্যার পাঠানেরা এই নগর আক্রমণ করে । এখানে
দর্শনযোগ্য বিষয়ের মধ্যে এমামবাড়ী, ১৫৯৯ অব্দে নির্মিত বান্দেলের পোর্তু-
গীজ গির্জা, ১৮১০ অব্দে পেরে। সাহেব নির্মিত হুগলী কলেজ গৃহ, গোরাবা-
রিক ও বোটারিকেল উদ্যান এই কয়েকটি প্রধান । চুচুড়ার গোরাবারিকের
নিকট গুলন্দাজদিগের কেলা ছিল । ১৮২৫ অব্দে গুলন্দাজেরা সুমাত্রা লইয়া
ইংরেজদিগকে এই নগর প্রদান করে । চুচুড়ায় ১৬৯৫ অব্দে নির্মিত আশ্বানি
গির্জা ও গুলন্দাজদিগের কবরের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় । হুগলী স্টেশন
পার হইয়া সরস্বতীর উপর সাতগাঁর পুল । তিন শত বর্ষ পূর্বে এই নদীর
উপর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলিত । সাতগাঁ প্রাচীন সপ্তগ্রাম । বাহা এক-
কালে বাজালায় রাজধানী ছিল । প্রাচীন রোমানদিগের সময়াবধি পোর্তু-
গীজদিগের সময় পর্য্যন্ত ১৫০০ বর্ষ কাল বহু ব্যবসায়ী লোক পূরিত সপ্তগ্রাম
অতি প্রকাণ্ড বাণিজ্য স্থান ছিল । প্রিনি ইহার কি ভয়ানক আতিশয্যই
বর্ণন করিয়াছেন । পূর্বে গঙ্গার বেগ সাতগাঁ, হুগলী, জীরামপুরাদির পশ্চিম
ভাগ, হ. বড়ার বর্তমান জলাভূমি ও আদ্য গঙ্গার খাল দিয়া বাকইপুর ও রাজ-
গঞ্জ ইইয়া কলাগেছে নামক স্থানে মিলিত হইত । পরে গঙ্গা বর্তমান পথ
অবলম্বন করিতে ১৬৩০ অব্দাবধি সপ্তগ্রাম হতজী ও হুগলী বৃদ্ধিশীল হইল ।
এখন (ট্রুক্রোড) বড় রাস্তার সেতুর নিকট সপ্তগ্রামের হুগ'চিহ্ন পাওয়া যায় ।
আকবরের সময় পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম উড়িষ্যার উত্তর সীমা ছিল । তদনন্তর
মগরা । মগরা ইইতে ত্রিবেণী অর্দ্ধক্ৰোশ । ত্রিবেণী দক্ষিণ প্রয়াগ বলিয়া খ্যাত ।
গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী প্রয়াগে যুক্ত হেী ও এখানে যুক্ত হেী ইইয়াছে বলিয়া
ইহার নাম ত্রিবেণী । ত্রিবেণী ইইতে এক বাঁধ মগরা স্টেশন ইইয়া পশ্চিমে বহু
দূরে চলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় একটি বাজাল ও উড়িষ্যার সীমা ছিল । শত
বর্ষ পূর্বে দামুদর বর্তমান মগরা পুলের নিম্ন দিয়া হুগলীর উত্তর নসারাই না-
মক স্থানে গঙ্গার আদিয়া পতিত হইত । কিন্তু এক্ষণে দামুদর মগরার দশ
ক্রোশ পশ্চিম দিয়া কলাগেছের নিকট গঙ্গায় মিলিত হইতেছে । এবং

তাহার বাসুকাতে নারিকদিগের ভরাবহ জেমস ও মেরি সোল নামক যগিনী জন্মিয়াছে ।

মগধার ৪৪ কোশ দূরে পাণ্ডুরা । এই সময় আমরা বর্ধমান জেলার প্রবেশ করিলাম । সমুদ্র সরিহিত বাঙ্গালার তাব পরিবর্তিত প্রায়, নারিকেল, পনস ও কমলি-কানন ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল । হৃৎকণ ক্রমেই বঠিন আলোহিত ও চিকন । ৫৫০ বর্ষ পূর্বে পাঁচ মাইল প্রান্তীর বেষ্টিত গভীর পরিখারূপিত ও টাকশাল সমন্বিত পাণ্ডুরা নগর হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল । তাঁহাদের দিল্লীর সম্রাটকে পত্রাদি লিখিবার জন্য এক জন যোগল কথচারী ছিল । সে সম্বানের জয় উপলক্ষে গোবধ করার নগর বাসীরা তাহার সন্তান হত্যা করে । নিরাশ্রয় মুসলমান সম্রাটকে এই বিষয় নিবেদন করিলে কেরোজ ভোগল্লক সৈন্য সহ সা সফীকে প্রেরণ করিলেন । কৈসনের পশ্চিম দাঠে ভরকর যুদ্ধের পর হিন্দুরা পরাভূত হইল । এইরূপ ৬১ পুন্ম রাজ্য ভোগের পর ১৩৪০ অব্দে প্রদ্বান নগরের হিন্দু-রাজ্য বিলুপ্ত হইল । এখনও ভয় ভূর্ণের কিরদংশ নগরের পার্শ্বে স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় এবং কিরদংশ উৎখাত করিয়া তহুপরি কৈসন নিখিত হইয়াছে । মুসলমানেরা সমস্ত হিন্দুদিগকে নষ্ট করিয়া তহুপরি এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্মাণ করে, এখন কিরদংশ বসিয়া গিয়াছে । স্তম্ভের পার্শ্বে ২০০ কিট লম্বা ও ৬০ কলসবৃত্ত আশ্চর্য্য প্রতিবর কারী সা সফির তজনালায় । সম্মুখে তাহার কবর । কিছু দূরে ৫০০ বর্ষের খাত ৪০ কিট গভীর মুসলমানদিগের শীরপুকুর । তাহারই চারিপার্শ্বে পাণ্ডুরার পতিত মুসলমানদিগের কবর । পুস্ত্রিণীতে কতেখা নামক কুস্তীরকে আশ্বান করিলে খাদ্য লোভে আগমন করে । কৈসনের ৪০০ হাত অন্তরে হিন্দুদিগের অমৃত কুণ্ড । লোকে বলিয়া থাকে নিহত হিন্দু সৈন্যগণ উহার জল স্পর্শ মাত্র সজীব হইত । মুসলমানেরা উহার জল নষ্ট করে ।*

বর্ধমান । পাণ্ডুরার পনর কোশ দূরে বর্ধমান । এই জেলার মধ্যে এত লোকের বাস যে, এত অল্প স্থানে এত অধিক লোকের বাস পৃথিবীতে আরই

* সমীদ কুকড়া নেড়ে, পেড়ায় আছে পড়ে ।

দেখিতে পাওয়া যায় না । পতিত ভূমি অতি অশ্মা, সর্বত্রই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে নদীনিচয়ের কুলু কুলু ধনী, কৃষকগণ সানন্দ মনে বটতলে বিশ্রাম করে এবং দূরস্থিত তালরাজি দর্শকের দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করিয়া থাকে । বর্দ্ধমানের ফেসন অতি পরিচ্ছন্ন । সম্মুখে গুল্পোদ্যান, তন্মধ্যে কৃত্রিম উৎস উৎসলিত হইতেছে, নিকটে হোটেল ও নিম্ন পথিকের পান্থশালা । অনতিদূরেই মহারাজার প্রকাণ্ড রাণীসায়র পুষ্করী, তাহার কিছু দূরে গভীর সামসায়র, তন্মিকটে হস্তীশালা । রাজবাটী ফেসন হইতে প্রায় এক মাইল, প্রাসাদ ইংরাজী প্রাণায় বিনির্মিত, তন্মধ্যে মহতপ মন্দির সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত আছে । বর্দ্ধমানের মহতপ মন্দির, দেবালয়, অশ্বশালা, দেলারাম, প্যালাস কুঠী ও দেলথোসবাগ দেখিবার উপযুক্ত । দেবালয়ের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ, সর্বমঙ্গলা ও রাধাবল্লভজীর বাটী এবং ছোট দেউড়ী এই কয়েকটি প্রধান । দেবহর্যাঙলি পরিষ্কৃত, সুসজ্জিত ও মনোহর । ঝুলনের সময় দেখিবার বড় শোভা । কিন্তু মহারাজার নাম চিরস্থায়ী হয় এতদুচ্চ মন্দির বর্দ্ধমানে একটিও নাই । অশ্বশালা ও দেলারাম রাজবাটী হইতে দূর নহে । দেলথোসবাগ ফেসন হইতে দেড় মাইল অন্তর । কৃষ্ণসায়র, প্যালাসকুঠী, পাতালঘর, পশুশালা ও গোলক ধান্দাদি লইয়া দেলথোসবাগ বহুদূর বিস্তীর্ণ । স্থান অতি মনোহর । নির্মল সলিল পূর্ণ, সুদীর্ঘ সরোবরের প্রান্তভাগে প্রশস্ত প্রাসাদ কি শোভাই বিস্তার করিয়াছে । যে দিকে দৃষ্টিপাত কর উপবনের শোভা মন ও নয়ন আকর্ষণ করিতে থাকে । কোথাও বা বৃক্ষসজ্জার মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ সঞ্চরণ পথ, কোথাও বা নব্য জন আকাজকীয় লতাবিতান, কোথাও বা কোবিল নিনাদিত নিকুঞ্জ বন, কোথাও বা নব কিশলয় শোভিত তরু রাজির শীতল ছায়া, কোথাও বা প্রফুল্লিত প্রসূনচয়ের মধুর সৌরভ, কোথাও বা নানাকারে কলিত কামিনীতরুর কমনীয় শোভা, কোথাও বা মত্ত মধুপের গুঞ্জন শব্দ, ব্যাঘ্রের হুকার ধ্বনি, ময়ূরের কেকারব, হরিণের সচকিত দৃষ্টি ও মৎস্যের মনোহর ক্রীড়া । বর্দ্ধমানের প্রাচীন চিহ্ন সকল বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে । লোকে মালিপৌতায় সুন্দরের সুভঙ্গাদি দেখাইয়া দৃষ্ট । কিন্তু সে কেবল নাম মাত্র । পৌরাণিক বর্দ্ধমান বা কুম্ভমপুর দামোদরের বেগে বিনষ্ট হই-

রাহে । দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে যে সকল নদী দিয়া প্রাচীন রোমানেরা বাণিজ্যার্থ বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিত, এখন তাহারা শুষ্ক প্রায় । সুপ্রসিদ্ধ বেউলা নদীর নিতান্ত হীনাবস্থা । গ্রীক গ্রন্থকারগণের সে বরণীয়া নগর আর নাই । চারি কোশ দূরে রোমান কথিত করজনায়ে এক পুষ্করিণী ও বটের শুষ্ক কাণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে । মুসলমানেরা বর্দ্ধমানকে বর্তমান স্থানে শোভাশালী করে । জগৎ বিখ্যাত হুর্জেহান এই নগরে কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন । এই স্থানে তাঁহার কন্যা হয় এবং এই নগর হইতে তিনি ছুতা হইয়া ছিলেন । পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিলাসী সম্রাট সাজেহাম বিদ্রোহী হইয়া এই নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন । ১৬২১ অব্দে মোগলেরা এই নগর অবরোধ করে । ১৬৯৫ অব্দে শোভাসিংহ এই নগর লুণ্ঠন করিয়া জগৎরাম রায়ের যথাসর্বস্ব হরণ করে, ও তাঁহার পিতাকে বধ করে । ১৬৯৮ অব্দে ইংরেজেরা বর্দ্ধমানে আসিয়া আজিম ওষানের নিকট কলিকাতা ক্রয়ের প্রথম অনুমতি পান । ১৭৪৩ অব্দে মহারাজীয় সেনাপতি হুগল ভাস্কর পণ্ডিত এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য সহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া এই নগর ভস্মীভূত করেন । উত্তর দিকের মাঠে সুবাদার আলি-বর্দ্ধীর সহ তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয় । ত্রিশ মালের বন্যায় বর্দ্ধমানের অনেক গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল । বর্দ্ধমান সমুদ্র হইতে ৯৩ ফিট উচ্চ । পূর্বে এখানকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট ছিল । রেলগুয়ে হওয়ার কিছু কাল পরে মহামারী প্রবেশ করিয়াছে । এবং এক্ষণে কদলী ও নারিকেলাদি স্বচ্ছন্দে জন্মিতেছে । বর্দ্ধমানের মহারাজা গবর্ণমেন্টকে ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করেন । কিন্তু ইহার পূর্বে পুষ্করেরা অনেক সময়ে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়াছেন । এক সময়ে ইহার বর্দ্ধমান জেলায় কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য বন্ধ করিয়াছিলেন, এবং সম্রাট সাহাআলমকে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । বর্দ্ধমানের বংশ ত্র্যম্বক দানের জন্য বাঙ্গালায় সর্বত্র প্রসিদ্ধ । স্বাধীন রাজাদিগের রাজ্যেও এরূপ দান নাই । কিছু পত্তনিদারেরা রাজার নিকট ক্ষমতা না পাইয়াও সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিতেছে । মহারাজার বর্তমান জমীদারী দীর্ঘ ৪৫ ও প্রস্থ ৫৩ মাইল অপেক্ষাও অধিক । প্রাচীন রাজাদিগের খাত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণী থাকায়

জেলায় প্রায়ই জল কষ্ট নাই। বর্জমানের সীতাভোগ, লালমোহন, মিহি-
দানার মিঠাই, খাজা ও চিনির পাকের অব্য প্রসিদ্ধ।

কান্ন। বর্জমানের এক মাইল পরে মহারাজার ১০৮ মন্দির। তাহার
পর কান্নজংসন। রেল পৃথক ভূত। বাম দিকে বৈষ্ণবনাথ ইয়া কডলাইন
ও ডাইন দিকে রাজমহল ইয়া লুপলাইন চলিয়া গিয়াছে। উভয়ে লক্ষ্মী-
সরাইয়ে পুনরায় মিলিত ইয়াছে। পূর্বে কান্নর ধুম ধাম ছিল, এখন
ভগ্নাবস্থা। নিকটে বনপাসের লোহ আবাদি প্রসিদ্ধ।

মানকর। কান্ন হইতে মানকর ৭ মাইল। ভূমি ক্রমেই কঠিন ও ঘুটিঙ্গে
আবৃত। পথে বড় রাস্তা (ট্রাকরোড) কাকসা নামক স্থানে দ্বিখণ্ডিত ইই-
য়াছে। বাম দিকে ছাতনার ধুমময় মূর্তি দূরে প্রকাশমান। এই পাহাড়
৬৬ হাত অপেক্ষাও অধিক উচ্চ। ক্রমে যত যাও সমতল ক্ষেত্র আর দৃষ্টি
গোচর হয় না। সামুদ্রিক সজল বায়ুর পরিবর্তে পার্বত্য নীরস বায়ু
অম্লভূত হইতে থাকে। ভূমি সাগর তরঙ্গের ন্যায় উচ্চাবচ ইয়াছে।
উচ্চস্থান সকল নীরস কঙ্করময় ও অম্লকর। কেবল নিম্ন প্রদেশে শস্তাদি
লক্ষিত হয়। মানকরের কদমা উত্তম।

পানাগড়। মানকর হইতে পানাগড় ৭ মাইল। পথে কালিপুরের
কঠিন খাত। সম্মুখে ইষ্টক নির্মিত আশ্চর্য্য সেতু। কেবল একটি মাত্র
খিলান অথচ ৫৩ হস্ত বিস্তৃত। এই সেতু চারি মাসে নির্মিত হয়। পশ্চিমে
তমলা নদীর প্রকাণ্ড বাঁধ। তদনন্তর তমলার ১৭ খিলান বিশিষ্ট সেতু।
প্রত্যেক খিলান ১৩৯ হাত প্রশস্ত। নিকটে ডাইন দিকে মন্দির আদি বনচর
পাকিপূর্ণ কয়র সোলের স্মৃদৃশ্য জঙ্গল। বাম দিকে শুভ্র বালুকার মধ্যদিয়া
দামোদর মুহু মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। কয়র সোলের কয়লা খনি
বাঘসামা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে।

অন্দল। পানাগর হইতে ১৭ মাইল। ডাইন দিকে সিঙ্গারগ হইতে
কয়লা আনিবার পথ। সিঙ্গারগের নিকট দামোদরের বিস্তীর্ণ বাঁধ। পূর্বে
এই বাঁধ না থাকাতে রেলওয়ের বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছিল। এখানকার সেতু
১৫ খিলান বিশিষ্ট প্রত্যেক খিলান ১৮৯ হাত। অনতিদূরে ননীয়া ও
দামোদরের সঙ্গম স্থল। ইহার নিকট মুক্তিকা নামে বহু কালের এক প্রকাণ্ড

অরণ্যানীর অবশেষ পাওয়া যায়। মিসরে কেবল নগরের নিকট এই রূপ এক বনের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

রাণীগঞ্জ। অন্দল হইতে নীরস আপীত উচ্চাবচ ভূমি ক্রমশই উচ্চ হইয়া গিয়াছে। ছাতনা, বেহারিনাথ ও পাচেটের পাহাড় সকল স্পষ্টরূপে প্রকাশমান। ছয়ক্রোশ দূরেই বেহারিনাথ। পাল্ক্ষী করিয়া যাওয়া চলে। উচ্চতা ৮০০ হাত। রাণীগঞ্জের পাহাড় সকল হিমবান হইতেও প্রাচীন। এক কালে ইহার সমুদ্রের অভ্যন্তরে ছিল সত্য কিন্তু সে যে কত কাল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়লার খনি উৎখাত করিতে প্রায় ৩০ প্রকার উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ৬৭ বৎসর গত হইল দামোদরের বেগে তথ্য এক স্থানের মৃত্তিকা দেখিয়া জোন্স সাহেব কয়লার খনি আবিষ্কার করেন। ৯০ ফিটের নিম্নে কয়লা ছিল। রাণীগঞ্জে মণ প্রতি এক আনা খরচায় বার্ষিক ১৬০ লক্ষ মণ কয়লা উঠিতেছে। আফিস খরচা সহ প্রতি মণে তিন আনা পড়িয়া থাকে। এই খনিতে বাড়ী জাতীয় প্রায় চারি হাজার শ্রী-পুরুষ কার্য করিতেছে। রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে লৌহও পাওয়া যায়। পূর্বে জঙ্গল ছিল কিন্তু পরিস্কৃত হওয়াতে ভূমি রসহীন ও অস্বচ্ছ হইয়াছে। এখানে বনপাল্লের আমদানী লৌহদ্রব্য ও মৃত্তিকার চাকচিক্যশালী টাইল প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। দূরে তসর শালপাতা ও মৌল প্রভৃতি বনজাত দ্রব্য পাওয়া গিয়া থাকে।

রাণীগঞ্জ পার হইয়া কয়লাপূর্ণ সেহারসোল ও নিমচাং ক্ষেত্র। তাহার এক মাইল দূর হইতে মুনীয়া নদীর দোহুলামান সেতু দৃষ্ট হয়। মুনীয়া নদী ও আসানসোল ডাক বাজারের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পদার্থ দৃষ্টি গোচর হইবে। এক কালে এই স্থানে ভূগর্ভ ফাটিয়া পাতাল হইতে প্রবল অগ্নি উদ্ভিত হয়। উহার দুরন্ত তেজে ভূগর্ভস্থ পদার্থ সকল দ্রবীভূত হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে দশ ক্রোশ লম্বা ও ৮০ হাত প্রশস্ত এক প্রস্তরের অতললম্পর্শ প্রাচীর জমিয়া গিয়াছে। কঠিন কৃষ্ণবর্ণ গোল গোল যে সকল প্রস্তর খণ্ড শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে তাহার ঐ প্রাচীরের উপরিভাগ। পৃথিবী উহাদিগকে দ্রবীভূতাবস্থায় উদ্ধার করিবে। রাণীগঞ্জের নানা স্থানে এইরূপ ভাণ্ডের প্রস্তরের প্রাচীর জমিয়াছে। ইংরেজেরা মধ্যে মধ্যে কলি-

কাতার রাস্তায় দিবার জন্য এই স্থানের প্রস্তর আনেন। কিন্তু উহা বড় কঠিন। রাণীগঞ্জের ভূমি উৎখাত করিলে বা নদী দ্বারা উৎখাত ভূমি দৃষ্টি করিলে বালুকাময় প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইবে। জলের অভাবের জলের কর্দমাদি একত্রিত হইয়া প্রাণীদিগের অস্থিসহ এরূপ প্রস্তর উৎপন্ন হয়। ইহাকেই ভূতত্ত্ববিজ্ঞান প্রটিক্টিফাইড রক বলে। পূর্বেক্ত আশ্রয়ে প্রাচীরের উত্তাপে অনেক বালুকাময় প্রস্তর উত্তপ্ত হইয়া ভিন্নাকার হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন স্পর্শই এক সময় গলিয়া গিয়াছিল। পরে শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে। কোন কোনটার গায়ে আমিষের ত্রায় কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ দাগ সকল চক চক করিতেছে, ইহাকেই ভূতত্ত্ববিজ্ঞান মিটামরফোলজড রক বলে। ছোট নাগপুর ও হাজারি বাগ পাহাড়ে ইহা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

নীতারামপুর। কলিকাতা হইতে ১৩৯ মাইল। এই স্থান হইতে বরাকরের দিকে এক শাখা রেল চলিয়া গিয়াছে। পুকলীয়া ও হাজারীবাগের যাত্রীরা এই শাখারেলে গমনাগমন করে। এই রেল পরেশনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। যেহেতু ইহার অনতিদূরেই ঝারাইয়ের ২৭০ মাইল বিস্তৃত কয়লাক্ষেত্র আছে। দামোদরের পার্শ্বে পার্শ্বে রামগড় ও পালামো পর্যন্ত স্থান সমস্তই কয়লায় পরিপূর্ণ। এই স্থানের প্রস্তর চুনারের প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন। এই জন্ত গৃহ নির্মাণার্থে কলিকাতায় আনীত হয়। বরাকরের যে ব্রহ্ম সেতু দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নির্মাণ করিতে গবর্ণমেন্টের ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল।

বরাকরে রেল ত্যাগ করিলে পদব্রজে পরেশনাথ পাহাড় ২৫ ক্রোশ দূরে থাকে। পরেশনাথের পর পিটকোর ও বেলকপির প্রভাব। তাহার পর ১৩০০ ফিট উচ্চ ও প্রতিমাইলে ৭০০ ফিট নিম্ন বিবিধ দৃশ্য সংযুত পার্শ্বীয় ধ্বাপথ। তদনন্তর কিমোর পাহাড় ও শোণ তীরে রোটাস-হুর্গ। এই স্থানেই বরাকরের উৎপত্তির নিকট চানির খণ্ডাল প্রভাব। পালামো সরঞ্জাম ছোটনাগপুর ও প্যাচেটের পাহাড়ে ব্যাজ ভল্লুকাদি ভীষণ জন্তু পূরিত আদি কালের অরণ্যানি, অস্তুদিগের বিচ্ছিন্ন আবাস, পৃথিবীর বারম্বার পরিবর্তনের নানা চিহ্ন, মধ্যে মধ্যে নিব্বর ও স্থলীতল

উৎস, দামোদর ও অজয়াদির কীর্ণ উৎপত্তি স্থান, বিবিধ জাতীয় পক্ষী ও বহু তরুজির শোভা দেখিয়া মন অতীব আক্লাদিত হয়। কিন্তু রেল ত্যাগ করিয়া পদব্রজে ও অপরাপর যানে এত দূর ভ্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে।

মাইজাম। কলিকাতা হইতে ১৪৯ মাইল। নিকটে সামদীর বাজার, শস্ত তৈল ও পশ্বাদি দেশজ দ্রব্য কলিকাতায় রপ্তানি হইতেছে। মাইজাম পার হইয়া অরণ্যনি পরিবৃত বুদমার সুদৃশ্য শাহাড়। তাহার পর জামতারা। এখানে এক জন ক্ষুদ্র রাজা ও ডেপুটী কমিশ্বনার আছেন। তদনন্তর খরমাতর। খরমাতর হইতে দুই ক্রোশ দূরে ব্যবসার স্থান কোরানগ্রাম। কোরানগ্রামে এক কয়লার খনি আছে। তাহার পর সম বিষম ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে জয়ন্তীয়ার সেতু দৃষ্ট হয়। সেতুর কিছু দূরে মধুপুর। বাম দিকে করহরবালীর শাখা রেল চলিয়া গিয়াছে। এখানকার কয়লা সর্বোৎকৃষ্ট। ১১ বর্গ মাইল কয়লা ক্ষেত্র মধ্যে ৩৮ কোটি মণ কয়লা আছে। বার্ষিক আড়াই লক্ষ মণ উঠিলেও তিন শত বৎসর চলিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষে যত কয়লা উৎপন্ন হয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহার অর্ধেক গ্রাস করেন। করহর বালীর কয়লা ক্ষেত্র মধ্যে ১৫টি আগ্নেয় প্রাচীর আছে, এবং রাজমহল পর্যন্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে পরেশনাথ দশ ক্রোশ। নিকটেই পাল্কী পাওয়া যায়। ৬ ক্রোশ দূরে পালগঞ্জ গ্রাম। পথিমধ্যে বরাবর নদী। কিন্তু ঐষকালে জল শুষ্ক থাকে। পালগঞ্জের ৪ ক্রোশ দূরে পরেশনাথ। পর্বতের পাদদেশে মেধবন ও উপরে জৈন প্রভু পার্শ্বনাথের মন্দির। উঠিবার উৎকৃষ্ট সিঁড়ি আছে। এখানে বর্ষে বর্ষে অর্ধ লক্ষ জৈন যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে।

দেবঘর বা বৈদ্যনাথ। খ্যাত দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে বৈদ্যনাথ এক লিঙ্গ। স্থানটি গ্রামের ন্যায়। শিবালয় ও মন্দিররাজির শোভা অতি, রমণীয়। বর্তমান মন্দির ১৪৭৭ শকে বিনির্মিত। নিশাকাল্পে কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বৈদ্যনাথের পূজা হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা বৈদ্যনাথের মূর্তি কিঞ্চিৎ কৃশ। মস্তকে একটি দাগ আছে। বৈদ্যনাথ ব্যতীত এখানে বীর-

নাথ সঞ্জানাথ গণেশ কার্তিক পার্বতী প্রভৃতির দ্বাবিংশতি মন্দির আছে । ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেন্ট ৩২ খানি নিক্কর গ্রাম দিয়াছেন । শিবরাত্রির সময় বৈদ্যনাথে বিস্তর যাত্রী উপস্থিত হয় । এই স্থান হইতে বাজালা মিশ্রিত হিন্দী আরম্ভ হইল ।

বৈদ্যনাথ পার হইয়া শিমুলতলা । তাহার পর নরজুগঞ্জের খাত । এত খাত যেন উভয় পার্শ্বে প্রস্তুত প্রাচীরের মধ্যদিয়া গাড়ী চলিতেছে । কেবল মধ্যে মধ্যে উপরকার জঙ্গলের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হয় । এত খাতেও স্থানে স্থানে এত উচ্চ আছে যে, সময়ে সময়ে মালগাড়ীর জন্য নওয়াদি হইতে আর একখান কল প্রেরিত হয় । নওয়াদীর পর গিধোর রাজের জমীদারী । ইনিই বিনামূল্যে রেলওয়ে কোম্পানিকে দশ ক্রোশ পথ প্রদান করেন । পতসম্মাতে উহারই বাটী গাড়ী হইতে দৃষ্টিগোচর হয় । এখানে কীল নদীর পার্শ্বগুলি উর্বরা ও আফিমের চাষে পূর্ণ । গিধোরের পর জামুই । বাবসার স্থান জামুই নগর স্টেশন হইতে দূরে কীল-তটে অবস্থিত । নাম মলিপুর । তদনন্তর মিরনপুর । ইহার নিকট কীলের পশ্চিম তটে মৃগয়ার উপযুক্ত জৈনগরের পাহাড় । তদনন্তর লক্ষ্মীসরাই । যেখানে লুপ ও কর্ড লাইন মিলিত হইয়াছে ।

লুপলাইন ।—এক্ষণে আমরা লুপলাইন দিয়া লক্ষ্মীসরাই আগমন করিব । বর্দ্ধমানের দশ ক্রোশ দূরে গুস্করা । গুস্করা ও ভেদিয়া পার হইয়া অজয়ের ২২০০ ফিট লম্বা সেতু ৫০ ফীট করিয়া ৩৬ খিলানে বিস্তৃত । স্তম্ভের মূল ৯ হইতে ১৫ ফীট পর্য্যন্ত বালুকায় প্রোথিত আছে । অজয় বর্ষাকালে স্থানে-স্থানে গঙ্গা ভুলা বিস্তৃত হয় ।

তদনন্তর বোলপুর । কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল । ইহার এক ক্রোশ দূরে স্কুল । স্কুলে পূর্বে কোম্পানি বাহাদুরের এক প্রকাণ্ড রেশমের কুঠী ছিল । বোলপুর হইতে কলিকাতায় বিস্তর তুল রপ্তানি হয় । বোলপুরের ৪১০ ক্রোশ দূরে ইলিম বাজার । ইলিমবাজারের চোপাহাড়ির বন ৪ ক্রোশ বিস্তীর্ণ । এখানে অতি উৎকৃষ্ট গালার স্রব্য প্রস্তুত হয় এবং এই স্থান লাংকার জন্য প্রসিদ্ধ । ইহারই নিকট সেকতাপুরের ওল বিখ্যাত । এবং ইহারই অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল ।

আমদপুর । কলিকাতা হইতে ১১২ মাইল । এখান হইতে সাওতাল পরগনার পাহাড়ের শীর্ষ দেখা যায় । সিউড়ী ৫১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । কিন্তু ষাভারাতের সুবিধা নাই । আমদপুর প্রকৃতি বাঙ্গালার উচ্চ বিভাগের মণ্ডল অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু বেহারে প্রবেশ করিলে বিশ্বাদ ও দুর্গন্ধ বোধ হয় ।

সাইতা । কলিকাতা হইতে ১১৯ মাইল । মুরী তীরে অবস্থিত । মুরীর সেতু অজয় হইতে ৩০০ কীট দূর । সাইতার ছয় ক্রোশ দূরে সিউড়ী । গাড়ী ভাড়া প্রায় ২ টাকা । বর্ষাকালে স্থান অতি শীতল থাকে । জেলার ভূমি বালুকা ও প্রস্তরে পরিপূর্ণ, ইহার স্থানে স্থানে অভ্র, কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায় । কোন কোন স্থানের লৌহ হইতেনের তুল্য উৎকৃষ্ট । সিউড়ীর নিকটে সারথনি ও কোরা নামক স্থানে চা খড়ির খনি আছে । পশ্চিম-দক্ষিণে হুবরাজপুরের পাহাড় অতি মনোহর । পর্বতের মস্তকটি ধূতুরা পুষ্পের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে । ৮ ক্রোশ দূরে গুণুটীয়ার রেশমের প্রকাণ্ড কুঠী । সিউড়ীতে শাল, পিয়াল, মৌল, সেগুন জাতীয় কাষ্ঠ, খদির ও লোহার দ্রব্যাদি উত্তম পওয়া যায় । জঙ্গলবাসীরা বাঁশের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনে । এখানকার মোরকী ও পিয়াল মিঠাই অতি উৎকৃষ্ট । সিউড়ীর অনতিদূরে বক্রেশ্বরের উচ্চ প্রভাবণ । তথায় অষ্টাবক্রের প্রতিষ্ঠিত বক্রেশ্বর নামক শিব, পাপহরণ নদী ও কুণ্ডাদি আছে । বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী নাগোর নগর অঙ্গ দূরে অবস্থিত ।

মল্লারপুর । কলিকাতা হইতে ১৩০ মাইল । ইহারই অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে মহম্মদপুরে লোহার কারখানা । মল্লারপুরের পর আমরা মুরসিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করিলাম । তদনন্তর রামপুরহাট । এখান হইতে অনেক শস্তাদি কলিকাতায় রপ্তানি হয় । তাহার পর নলহাট ।

নলহাটে মুরসিদাবাদ দেখিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল ত্যাগ করিয়া ডাইন দিকের রেলে আরোহণ । যেন প্রবল গঙ্গা ত্যাগ করিয়া বেলেঘাটা খালে ঢুকিলাম । গাড়ী যায় না, নড়িতে চায় না । কত কষ্টে ধানের খেত, কুলের কোঁপ, তাল গাছ, খেজুর গাছ ক্রমে অতিক্রম করিয়া ২১০ ঘণ্টার পর গঙ্গা তীরে অ্যাজিমগঞ্জ । ডাইনদিকে রায় ধনপৎ বাহাদুরের বিশাল জৈন মন্দির পঞ্চখেণ্ডে গগন শোভিত করিয়াছে । মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড

ধ্যান নিমগ্ন শত্ৰুনাথের প্রশান্ত মূর্তি বিরাজমান । নানা দিকে নানা তীর্থ-
 করের মূর্তি । ধনপৎ বাহাদুরের স্কুল, চিকিৎসালয়, জৈনপাঠশালা ও
 অন্যান্য ধনীদিগের মন্দির, আলয় ও ব্যবসা দ্বারা আজিমগঞ্জ যথার্থই গঞ্জ
 সদৃশ । গঙ্গার অপর পারে স্বজপতাকা শোভিত বহু জৈনমন্দির । দুই
 আনায় গঙ্গা পার হইয়া বালুচর । বালুচরে পাঠশালা, দানশালা, অশ্ব-
 শালা, উষ্ট্রশালা, শস্ত্রশালা, মন্দির ও হর্ম্যাদি সহ সকলের আশ্রয়ীভূত
 প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় রায় লহমীপৎ বাহাদুর এক পল্লী আৱৃত করিয়া
 আছেন । এই সকল হর্ম্যের মধ্যে পথপ্রান্তে ক্লকট্টাউয়ার । তাহার
 সম্মুখে উজ্জানের উপর করিমুহিয়ান ও আইয়োনিয়ক স্তম্ভযুক্ত রায় লহমী-
 পতের মনোহর প্রাসাদ । বাটীর স্থানে স্থানে এক এক ঘর স্বর্ণ বর্ণে এরূপ
 সজ্জিত যে নিজামেরও এই জাতীয় ঘরের এরূপ শোভা হয় নাই । সর্বো-
 পরিষৎ গৃহের ভিত্তির প্রত্যেক ইঞ্চি অতি সুন্দর জয়পুর চিত্রে চিত্রিত ।
 উহার নানা স্থানে নানা নগরের প্রতিকৃতি ও কামিনীগণের কামচাতুর্যের
 পরিচয় । বালুচরের অদূরে মহিমাপুরে জগৎ সেটের বাসবাটী । নিকটে
 ছত্রবাগ । ইহাতে প্রায় ১০লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে । প্রবেশদ্বারের পতন
 অতি চমৎকার । সুসজ্জিত আলয়, সুপরিচ্ছন্ন সরোবর, বিভূষিত মন্দির
 স্থানে স্থানে মার্বেল মূর্তি, রাশি রাশি ফুল, আত্মের নিকুঞ্জ, পশুশালা
 ও পক্ষীশালা প্রভাবে বিস্তীর্ণ এই উজ্জান নিতাস্তই প্রীতিপ্রদ । উজ্জান
 মধ্যে এরূপ মার্বেল ছবির ষটা ভারতে কোথাও দেখা যায় না । তদনন্তর
 জাকরাগঞ্জে মীরনের ভগ্ন বাটী ও বর্তমান নবাবদের কবরস্থান । ভগ্ন
 বাটীর মধ্যে সিরাজবাদের স্থান এখনও বর্তমান আছে । তাহার পর
 নেজামত কলেজ, এমামবারা ও নেজামতের গৃহ । গঙ্গা তীরে দুর্গরহিত
 নেজামতের গৃহ ইংরেজি প্রধায় নির্মিত । অভ্যন্তর ভাগ নবাবের পিতা
 পুত্র শীকযুদ্ধ ও লণ্ডন সম্বন্ধীয় নানা চিত্রে ভূষিত । পার্শ্বে গোলঘরের
 ঝাড় ১০৮ ডাল । ত্রিভূলে পূর্বে নবাবদের চিত্র । এক দিকে অথবাবহায়
 দুর্ভাগ্য সিরাজের চিত্রপট । মুখ বাঙ্গালীর মত, কিকিৎ লম্বা ভাব, গোঁপ
 দীর্ঘ ও নরনরায় আবর্তিত, যেন নেশায় ঘোর হইয়া আছে । এই গৃহের পর
 নেজামতের অন্তঃপুর । কিছু দূরে নবাবের অশ্বশালা । তাহার পর কাশীম-

বাজারে মহারানী স্বর্ণময়ীর বাটী প্রাচীরে লুকায়িত । তদনন্তর খাগড়া । তাহার পর বহরমপুর কাছারি ও গোরাবাজার । বাবুচর হইতে বহরমপুর ৬ ক্রোশ । এক কালে যে মুরশিদাবাদ কেবল দোকানের আলোকে আলোকিত হইত এখন সে সকল স্থান গঙ্গায় ধ্বংস হইয়াছে । পূর্বকালের বহুল লোকপূরিত স্থান সকল এখন জঙ্গলাকীর্ণ । এখানকার কাঁশার, হাতীর দাঁতের ও রেশমের জিনিস উৎকৃষ্ট । পকান ও খাগড়ার মুড়কী মন্দ নহে । মুরশিদকুলী গোঁড়ের তয়াবশেষে মুরশিদাবাদ শোভিত করেন । মালের কাছারি কলিকাতায় উঠিয়া যাওয়ার পর মুরশিদাবাদ ইতস্তী হইতে আরম্ভ হয় । মুরশিদাবাদ দেখিতে ইচ্ছা না হইলে নলহাটি হইতে বামরেলে মুরারি গমন করিবে ।

মুরারি । কলিকাতা হইতে ১৫৬ মাইল । নিকটে জঙ্গীপুরে নীলের চাস, ভাগীরথীতে নৌকায় মাছুল আদায় ও অনেক শ্রবাদি বিক্রীত হয় । সাঁওতাল পরগণার ১৬০০ ফীট উচ্চ মাহীঘরী পাহাড় ইহার ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ।

রাজগাঁ । ১৬৩ মাইল । সমতল ভূমি হইতে প্রায় ২০০ ফীট উচ্চ হইয়াছে । বামদিকে দামিনিকোহের বন আরম্ভ । লুপলাইনে এইখানে আমরা সাঁওতাল পরগণায় প্রবেশ করিলাম ।

পাকুড় । ১৭০ মাইল । এক জন রাজার আবাস স্থান । ১৮৫৫ অব্দে ৮ সহস্র সাঁওতাল এই নগর লুপ্ত ও ভস্মসাৎ করিয়া ছিল । বহু নগরবাসী তাহাদিগের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ১৮৫৬ অব্দে ইংরেজেরা ৩০ ফীট উচ্চ একটি কেল্লা নির্মাণ করেন । ৭১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত জঙ্গীপুর ও অধিকতর দূরবর্তী রাজমহলের পাহাড় এখান হইতে নেত্র-গোচর হয় । পাকুড়ের ৫ ক্রোশ দূরে গোমানী নদীর স্রব্দ শ্রুত ।

বাহোয়া । নিকটে সাঁওতালদিগের আবাস ভূমি । অনেক সাঁও-তালি শ্রব্য আমদানী হয় । কিছুদূরে সীতাপাহাড়ের খাত । প্রস্তর অত্যন্ত কঠিন ও কঙ্করময় । কাটিবার সময় বিস্ফটিকায় বিস্তর সাঁওতাল কুলি মরত হইয়াছিল । পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী । বর্ষাকালে এই সকল নদী দুই ঘণ্টার মধ্যে ১২ ফীট বাড়িয়া উঠে ।

তিনপাহাড় । কলিকাতা হইতে ১৯৬ মাইল । এই স্থানে রেল তিনটি পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । ইহার মধ্য-অধিত্যকার উত্তর পূর্ব সীমা । এই পাহাড় দক্ষিণ পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া বঙ্গের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে । ইহাদের গাত্রে আশ্রয় উপজবের চিহ্ন পাওয়া যায় । বর্ষাকালে জঙ্গলপূর্ণ এই সকল স্থান নিত্যন্ত অশ্বাস্ত্যকর হইয়া উঠে । তিনপাহাড়ের ডাইনদিকে রাজমহলের শাখা রেল ।

রাজমহল । ১৬৩০ অব্দে এই স্থান বাঙ্গালার সুবাদার সা হুজার রাজধানী ছিল । এক্ষণে ভগ্নাবশেষের মধ্যে ফৌজেনের এক ক্রোশ উত্তরে কয়েকটি প্রকাণ্ড মসজিদ ও এক রাজবাটীর অংশ আছে । অন্তঃপুরাদি অধিকাংশ ভাগ রেলওয়ের কর্মচারীরা পথ নির্মাণে নিয়োজিত করিয়াছে । রাজমহলের নিকট মতিঝিরের জলপ্রপাত । পূর্বে গঙ্গা নগরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে স্রোত বহুদূরে পড়িয়াছে । পুনরায় আসিবার সম্ভাবনা । রাজমহলের মণিকচকের ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া ৯ ক্রোশ দূরে ইংরেজাবাদ । যাইতে গোয়ান ভাড়া ১৯০ । ইংরেজাবাদের বিখ্যাত আন্তের নিকুঞ্জ শোভা অতি মনোহর । অপর পারে মহানন্দা তটে মালদহ । গোড় বিনফট্রায় হইলে অধিবাসীগণ মালদহে আসিয়া বাস করে । ইংরেজাবাদের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে গোড় নগর । গোয়ান ১৯০ । ভাগীরথীর পূর্বতীরে এই নগর এক কালে ৯ ক্রোশ দীর্ঘ ও তিন ক্রোশ বিস্তীর্ণ ছিল । রোমানদিগের বাণিজ্য কালাবধি আকবরের সময় পর্য্যন্ত ইহার কত প্রসার্যাই বর্ণিত হইয়াছে । এখন কৃষ্ণ মার্কেলে সুশোভিত একটি প্রকাণ্ড মসজিদ এবং ৬৭ হাত উচ্চ রাজবাটীর দুই আচ্ছাদিত ভিত্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে । কত দিকে কত ভগ্ন আলয়, রাজাদিগের মালখানা ও উচ্চ উচ্চ মন্দির । কিন্তু চারিদিকে জঙ্গল । ব্যাতের হুকার, রশিকের দংশন ও সপের দৌরাছো কাহার সাধ্য অগ্রসর হয় । কত ইটুক ও প্রস্তর লোকে লইয়া গিয়াছে । এখন আর কেহ লইতে পায় না । দুই শত বর্ষ হইল গঙ্গা গোড় ত্যাগ করিয়াছেন । এখানে দশ লক্ষ লোকের বাস ছিল । এখন ব্যাত্রাবাস ও প্রায় শূন্য পুরী । মালদহের নিকটে মুসলমানপুত্রিত পাওয়া । ইহাও এক কালে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল । এখন ভগ্নাবশেষে

পরিপূর্ণ। পাণ্ডুরার থকাও মসজিদের আর সে শোভা নাই। গোড়ের নিকট রামকালীতে চৈতন্যের মেলা হয়। রাজমহলের অপার পারে ৩৫০ ক্রোশ দূরে দার্শনিক নগরের মেলা হইয়া থাকে।

মহারাজপুর। কলিকাতা হইতে ২১০ মাইল। ফ্রেসন ত্যাগ করিয়া বর্ষাকালে বামদিকে কিছু দূরে গমন করিলে একটি সামান্য জলপ্রপাত লক্ষিত হয়।

সাহেবগঞ্জ ২১৯ মাইল। পূর্বে এই স্থান হইতে লোকে দারজিলিং যাইত এখন হইতে স্কিমারে কারাগোলা ও কারাগোলা হইতে ডাকগাড়িতে দারজিলিং যাইতে ৩০ ঘণ্টা লাগিত। পথে কারাগোলা, পূর্ণিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ ও শিলাগোৱী তরায়ৈ এক এক ডাক বাঙ্গালা আছে। এই পথ ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। পূর্ণিয়া পার হইয়াই বরফমণ্ডিত হিমালয়ের শীর্ষ সকল নেত্রগোচর হয়। উহার মধ্যে যেটি বৃহৎ সেইটিই বিখ্যাত কান্ধন-গঙ্গা।

সাহেবগঞ্জের এক ক্রোশ দূরে গঙ্গাপ্রসাদ পাহাড়। আড়াই ক্রোশ পরে বাঙ্গালা ও বেহারের চাবি স্বরূপ বিখ্যাত তেলিয়াঘর পথ। সা মুজা নির্মিত কেল্লা পূর্বে নদীতীরে ছিল। এক্ষণে এক ক্রোশ দূরে পড়িয়াছে। দ্বারদ্বয় পরস্পর অর্ধক্রোশ ব্যবধানে ছিল। এখন আমরা লুপলাইনে ভগলপুর জেলার সন্নিকট হইলাম।

পীরপৈতি ২৩৪ মাইল। পাহাড়ের তলে অবস্থিত। পর্বতের উপর পীরপৈতি মুসলমানের কবর। শিলাসঙ্গম বা পাথরঘাট পর্বতমধ্যে অনেক গুহা আছে। পূর্বে তথায় সন্ন্যাসীদের আবাস ছিল। এখন শূন্য পড়িয়া আছে।

কাহোলগ্রাম ২৪৫ মাইল। ফ্রেসনের পার্শ্বে কতকগুলি পাহাড় শ্রেণী। গঙ্গা হইতে প্রায় ৪০ মাইল উচ্চ। উপরে বড় বড় গাছ ও গুল্ম থাকাতে অপূর্ণ শোভা হইয়াছে। ইহার রাজমহল পাহাড়েরই অংশ মাত্র। পর্ব-তোপরি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে দেখিবার অনেক পদার্থ আছে। ৫০ বর্ষ পূর্বে যে শিবারস্রটি ছিল তাহার পুরোহিত ইচ্ছাপূর্বক গঙ্গার ঝাঁপ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা পতিত হয়। দক্ষিণদিকের পাহাড়ে এক মুসলমান ফকীরের

গৃহ ছিল। ২৫ বর্ষ হইল তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে এখন তথায় পায়রা চরি-
তেছে। কাহোলগ্রামে কাহোল ঋষির আশ্রম ছিল, এখানে ভগীরথের রথ
নির্ভিন্ন পর্বত দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন। নিকটে বটেস্বর মহাদেব।
কাহোলগ্রামের সম্মিথানে গঙ্গায় কলসতীর্থ, সোমতীর্থ ও অপর পারে
কৌশিকী সঙ্গম তীর্থ। এই গ্রামের নিকটেই জঙ্ঘুভূদ ও অদিতি তীর্থ। দূরে
মন্দর পর্বত, মধুসূদনমঠ ও মহাকালীরমূর্তি।

ভাগলপুর ২৬৫ মাইল। কাহোলগ্রামের পর যোগার সেতু পার হইয়া
ভাগলপুর। এখানে বর্ষাকালে গঙ্গা ৭ মাইল বিস্তৃত হয়। মুসলমানদিগের
সময় এই নগর বর্তমান ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে বর্তমান কেল্লার
নিকট কর্ণগড় ছিল। দুই সহস্রবর্ষ পূর্বে এক জন কর্ণ এখানে প্রাসাদ
নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে জৈন হইয়া মগধে রাজ্য করেন।
ভাগলপুরের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পা নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। কর্ণ
গ্রামের নিকট জৈন সময়ে নির্মিত ৭০ ফীট উচ্চ দুইটি গোলাকার স্তম্ভ
আছে। শীতকালে বহু জৈন-যাত্রী দর্শনার্থ আগমন করে। চম্পক তীর্থে
গঙ্গা স্নান করিলে কাশী তুল্য ফল লাভ হয়। ভাগলপুরের গুহা অতি
আশ্চর্য্য, পূর্বে নদীতীরপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এখন মুখ কঙ্ক হইয়াছে।
ভাগলপুর ও তন্নিকটকর্তী স্থানে দেখিবার উপযুক্ত প্রাচীন অনেক আশ্চর্য্য
কীর্ত্তি আছে। সহরের নিকট ক্রীবল ও সাহেবের মন্ডপেট। ১৭৮০ অব্দে
ইনি পার্শ্বতীয় অসভাদিগকে সৈন্ত করিয়া ইহাদের উপর জমীদারদের
অত্যাচার নিবারণ করেন। ভাগলপুরে নীল কুসুমফুল ও শস্তাদি যথেষ্ট
জন্মে। কাচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের জবা ও প্রস্তুত হয়। এখানকার খেস
বাদ্দালায় প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে বাদ্দালা ভাষা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া
হিন্দী আরম্ভ হইল।

মুলতানগঞ্জ ২৮১ মাইল। ১৮৬১ অব্দে খুঁড়িবার সময় এখানে তাম্র
নির্মিত ১০ ফীট উচ্চ এক বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নানা স্থানে বৌদ্ধ-
বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। পর্বতস্থ পার্শ্বনাথের মন্দির দর্শন করিতে বর্ষে
বর্ষে অনেক জৈন-যাত্রী আদিয়া থাকে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি-বিশিষ্ট
জানদিয়া পাহাড় দূরে দৃষ্টিগোচর হয়। পাশ্চাত্যেরা বৈষ্ণবনাথের জন্ম এই

স্থানে গজাজল পূরণ করিয়া থাকে । হুলতানগঞ্জে মুসলমানদিগের একটি মসজীদ আছে । নিকটে কোম্পানির আফিমের গুদাম । এখন আমরা লুপলাইনে মুন্সের জেলার সন্নিকটে হইলাম ।

বরিয়ারপুর ২৯২ মাইল । বরিয়ারপুরের পাহাড় মুন্সের হইতে আরম্ভ হইয়া বিষ্ণোর অংশ খরকপুর পাহাড়ের সহিত যোজিত হইয়াছে । ক্রমে ক্রমে তিন শ্রেণীর পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইবে । উত্তরদিকে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এক শ্রেণী । তাহার দক্ষিণে অসম্বন্ধ আর কতকগুলি গণ্ড শৈল । তদনন্তর সর্ব দক্ষিণে একটা বিস্তীর্ণ শ্রেণী ক্রমশঃ পশ্চিমে গিয়া বিষ্ণোর সহিত সংমিলিত হইয়াছে । এই সকল পাহাড় পরিত্যাগ করিবার জন্য রেল ক্রমে বক্র হইয়া অবশেষে উত্তরদিকের পাহাড় ভেদ করত বাহির হইয়াছে । এই গহ্বর ৬০০ হাত লম্বা ১৫১০ হাত উচ্চ ও ১৭১০ হাত বিস্তৃত । পাছে পাহাড় চুয়াইয়া জল পড়ে এই জন্য পূর্বাংশের কিয়ৎ ভাগ ইচ্ছক দ্বারা গ্রথিত আছে । গহ্বরের অভ্যন্তর ভাগ দেখিলে বোধ হয় যে এক কালে জলের নিম্নে এই পর্বত জন্মিয়াছিল । উপরিভাগ ভয়ঙ্কর তাপে বিগলিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে । বরিয়ারপুরের নিকট খরকপুর । খরকপুরের পাহাড় জামুই হইতে মুন্সের পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ । উপরিভাগে নিবিড় আবলুস বন । কোথাও কোথাও একটা প্রকাণ্ড শাল গাছ, কোথাও একটা অজু'ন বৃক্ষ, কোথাও বা সুপুষ্পিত পলাশরাজির অগ্নিবর্ণ শোভা ও কোথাও দাকচিনির সুগন্ধ আশ্রয় । কত বৃক্ষ লতাতে জড়িত হইয়া নিকুঞ্জের ন্যায় হইয়াছে এবং কোন কোনটা বা সর্পাকৃতি লতার ভয়ঙ্কর আলিঙ্গনে শুষ্ক হইতেছে । পর্বত মধ্যে নদ নদীর প্রস্রবণ দেখিতে বড় মনোহর । প্রান্তরের উপর টেকারিগুলি কেমন ক্রীড়া করিতেছে । দুই পার্শ্বে পুষ্পের কি মনোহর শোভা । মরক পাহাড়ের উপরিভাগে নিবিড় জঙ্গল । মুন্সের হইতে ইহার শীর্ষদেশ দেখিতে পাওয়া যায় । প্রায় ১১০০ ফীট উচ্চ । অভ্যন্তরে সন্নীচুপের বড় ভয় । এক সময়ে ১০ ফীট লম্বা একটা সর্প ছাগ গিলিতেছিল । তাহাকে বধ করিয়া মুন্সেরের যুত প্রাণিশালার পাঠান হইয়াছে । গোমাপ গিরিগিটি ও বিধাত্ত সর্প অনেক আছে । এক জাতীয় দাকড়লা জাল পাতিয়া পক্ষী ধরিয়া খায় ।

গছি সাহেব একটা মাকড়সাকে পক্ষী খাইতে অয়ঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মুন্সেরের য়ত প্রাণীশালায় মরক পর্বেতের এই ভয়ঙ্কর মাকড়সা কয়েকটি রক্ষিত হইয়াছে।

জামালপুর ২৯৯ মাইল। পূর্বে জামালপুর সামান্য স্থান ছিল। মুন্সের পর্বেতের ক্রোড়ে এই স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া রেলওয়ে কোম্পানি এখানে আপনাদের কারখানা ও আপীস স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা একাণ্ড সহর হইয়াছে। মধ্যে এক উৎকৃষ্ট সম চতুষ্কোণ সরোবর। পূর্বে এইটী ঝিল ছিল। রেলওয়ে কোম্পানির যত্নে এখানে পুস্তকালয়, পাঠাগার, নাট্যশালা, ক্রীড়াভূমি, পানভূমি ও উপাসনা মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়াছে।

মুন্সের ৩০৪ মাইল। জামালপুর পার হইয়া ৩০ মাইল ক্রমাগতই পাহাড়। তদনন্তর মুন্সের। মুন্সের জেলার উত্তর ভাগ শীতকালে দেখিতে অতি সুন্দর, সমস্তই রবিধন্দে পরিপূর্ণ। বরফের ভয়ে সাইবিরিয়া, তিব্বত ও নেপাল হইতে বিবিধ জাতীয় জলচর পক্ষী আসিয়া স্থানে স্থানে তিন শত বিধা বিস্তীর্ণ জলাশয় আচ্ছন্ন করে। কোন প্রকার শব্দ করিলে যখন লাকে লাকে থাকে থাকে সেই সকল দল শব্দ করিয়া উড়িতে থাকে তখন বোধ হয় যেন সাগরের বেলারব বিলীন হইতেছে। কিন্তু বর্ষাকালে উত্তর ভাগ সমস্তই গঙ্গা জলে প্রাবিত হইয়া যায়। গৃধ্রেরা অর্দ্ধনিমগ্ন বৃক্ষশ্রেণী আশ্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিত থাকে। জলের উপরিভাগস্থ উচ্চ ভূমি সকল প্রায় সমস্তই আত্র বৃক্ষে আচ্ছন্ন, ইজার, শিমুল ও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নীল ও কুসুম এই ভাগে বর্ধিত হইয়া থাকে। মুন্সেরে ভাগীরথীর দক্ষিণ ভাগ জাদলিক জন্তুপূর্ণ জঙ্গলাবৃত পূর্বত, শ্রামল ধান্যপূর্ণ অশোভিত উপত্যকা ও সতেজ শোভাশালী পোস্ত বৃক্ষে সুন্দর রূপ বিভক্ত। মুন্সেরের য়ত ও বৃহৎ অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু লক্ষ্মীর তালয় অরপ্ন এই দেশে অবস্থান করিয়াও দীন অধিবাসীগণ আমকুসীচূর্ণ ও আরণ্য ত্রব্য ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করে। গোধূম, সর্ষপ, নীল, আফিম আদি সমস্তই কলিকাতা প্রাস করিতেছে। মুন্সের নগর অতি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। ইহার পূর্বে নাম মোদাগিরি। নিকটে মুদাল ঋষির আশ্রম ছিল। মুন্সেরের পথ সকল অতি পরিষ্কৃত ও বৃক্ষনিবৃত্ত সমাচ্ছাদিত। পুষ্করিনী

সকল সুবিস্তৃত ও প্রসন্ন সলিলপূর্ণ। বর্তমান দুর্গ চতুর্দশ শতাব্দীতে হোসেন সা নির্মাণ করেন। ভূমির দিকে পরিখা বিলকুল আয়ত। দুর্গাক্রমা এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে চারি সহস্র ও প্রস্থে সার্ব্ব তিন সহস্র ফীট। মধ্যে মৃত্তিকার স্তূপ। তথায় পূর্বে এক দুর্গ ছিল এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে। মুন্দের মসজিদ বিচিত্র ইককে বিনির্মিত ও অত্যন্ত শোভাশালী। এখানে নানা জাতীয় প্রস্তর, চেরার প্রভৃতি কাষ্ঠের সাধারণ জবা, আবলুস, হস্তীদন্ত ও বংশ ও লোহরচিত জব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিকটে দেখিবার নানা বিষয় আছে। চারি মাইল দক্ষিণ পূর্বে সর্বতপ্রান্তে বিখ্যাত সীতাকুণ্ড বা শান্তাকুণ্ড। কুণ্ডের চারি পার্শ্ব প্রস্তরে অধিত, অনবরত উষ্ণবারি উদ্গাত হইতেছে। কিয়দূরে ঋষিকুণ্ড নামে আর একটি প্রস্তবন। এবং ১৫ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড অপেক্ষাও অধিক উত্তপ্ত অপর এক প্রস্তবন। মুন্দেরে গঙ্গায় মুদাল তীর্থ। এই স্থানে ঋষামুন্দের আশ্রম ছিল।

লক্ষ্মীসরাই। অনন্তর আমরা কর্ড ও লুপ লাইনের সম্মিলন স্থান লক্ষ্মীসরাইয়ে পুনরায় এপথ দিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রবেশের মুখেই কীল নদী, কলীসেতুর উত্তরপার্শ্ব জাকরীকাটা লোহ প্রাচীরে আচ্ছাদিত। নিম্নে শত হস্ত অন্তর ৯ খিলান। গাড়ী প্রবেশ মাত্র ঝন্ ঝন্ শব্দ শ্রবিত হইতে থাকে। দুই ক্রোশ দূরে হলোহর নদীর কীলতুলা সেতু। এই মুখ দিয়া ফল্লুর জল নিসৃত হইতেছে। হলোহর ও কীল, নিকটেই মিলিত হইয়া গঙ্গাগামী হওয়ায় বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলে প্লাবিত হয়। কখন কখন জল ৮ হাত গভীর হইয়া উঠে। এক্ষণ পার্শ্বে প্রকাণ্ড বাঁধ ও ক্রমশঃ ৫০২ খিলানের উপর দিয়া রেল চলিয়া গিয়াছে। কর্ড লাইনের যাত্রীগণ এই স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইবেন। এখন লুচিকে পুরী, জলকে পানী, পিয়ারাকে আমকণ, পানকে খিলী, যটিকে লোটা, দড়ীকে রসী, খীম্বকে খোয়া, কমলালেবুকে নারাজী, জব খীরকে রাবড়ি, মেথরকে ভাজি, পথকে সড়ক, ধূলাকে গর্দা, ব্যবহার করিবে। পানী-ওয়ালে, মিঠাইওয়ালে বলিয়া প্রয়োজন হইলে আহ্বান করিবে। প্রায় আর্ধ্যাবর্তের সমস্ত স্থানে ও অধিক কি কোহিন্থান পর্যন্ত হিন্দী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ হইবে। মগধে উর্দু, কাশীতে হিন্দি, দক্ষিণে রাজড়ী, রম্ভা-

বনে ব্রজভাষা, পঞ্জাবে গুরুমুখী, মূলতানে মূলতানী, মারোয়াড়ে মারোয়াড়ি, কাশ্মীরে কাশ্মীরী, পোশোয়ারে পুস্ত ওইতর লোক মধ্যে চৈতী চলিত থাকিলেও লকলই সংস্কৃত জাত বলিয়া একরূপ বুঝা চলে। মগধে টাকা বলিলে ডবল পয়সা, কল্যাণীতে পয়সা বলিলে ডবল বুকে। এজন্য টাকাকে রূপেয়া, ডবল পয়সাকে আধ আনা ও পয়সাকে পোয়া আনা বলিয়া ব্যবহার করা উচিত। আধ পাইকে আথেলা, সিকি পাইকে ছদান বা ছকড়া কহে। পশ্চিমের নানা স্থানে কোথাও লোহিয়া নামক পয়সা টাকায় ২৮ গণ্ডা, কোথাও গোরকপুরী বা বুটোলিয়া ১৮ বা ২০ গণ্ডা পাওয়া যায়। এজন্য সর্বদা বাঙ্গালায় প্রচলিত পয়সায় দাম করিবে। এখানকার পয়সাকে পশ্চিমে লাটসাহী, ডব্বল বা গড়াইদার কহে। ইহা সর্বত্র টাকায় ১৬ গণ্ডা। পশ্চিমে প্রবেশ করিয়া সদা সাবধানে থাকিবে। দোকানী ব্যতীত অপরের হস্তের পান বা কোন খাওয়া কদাচুৎ গ্রহণ করিবে না। দুরাস্ত্রারা বিষ দিয়া দেয় এবং পথিক অচেতন্য হইলে বাগ লইয়া প্রস্থান করে। খাওয়া তিক্ত বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ বমন করিবে। ত্রযাদি ঋষিদ কালে যেন তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি নিকটে না থাকে। দালালেরা অতর্কিত ভাবে সঙ্গে যায় এবং সঙ্গে থাকিলেই দোকানী তাহাদের দালালী মূল্যের সহিত যুক্ত করে। হামবি কোনে মে খাড়া হয় অথবা ইয়ে বাবু চারোখুঁট জাননেওয়ারা ইত্যাদি চারি বোধক কোন শব্দ করিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রতি টাকায় চারি আনা দালালীর কথা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সাঙ্কেতিক কথা আছে। যথা—সাং ১ সোয়ান ২ একোয়াই ৩ ফোঁক ৪ বুধ ৫ ডাঁহাক ৬ পঁইত ৭ মং ৮ কোণ ৯ সলায় ১০ ইত্যাদি। টাকাকে ঘণিয়া, বাজনা বা চিট্টা, আনাকে রতি ও দশগুণকে দহাই কহে। মং চিট্টা ৮ টাকা, টালি বা মং রতি ১০, মং দহাই ৮০ ইত্যাদি। পথিক দেখিলেই চোর সঙ্গে সঙ্গে যায়। এক টাটকা ঠিকানা হার বলিলে বোধ হইবে যে চোরেরা পথিকের নিকট হাজার টাকা থাকার সন্দেহ করিতেছে। এইরূপ তত্ত্বেরা ১০০ কে লাগোয়ায়া ইত্যাদি বলিয়া ইঙ্গিতে কথা কয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে পশ্চিমের বিধাত্ত বিজু বড় ভয়ঙ্কর। দংশন করিলে কাটিয়া তথাকার রক্ত বাহির করিবে। যদি তাহা না হয় তবে অগ্নিস্বেদ

খরসান তামাকের ধূমা, টেবুলের কাঁই খসা, কাঁটানটের শিখড়ের রস, মসুরের মূত্রযুক্ত হৃদিকা, লেবুর রস বা রশিকের রস দিলে কিঞ্চিৎ ত্রাণ হয়। হিন্দুস্থানীদের লোটা ও পাকশালার চোঁকা পরম পদার্থ, স্পর্শ করা উচিত নহে। মেথরের চোঁকার ত্রাণ গেলেও তাহার মারিতে আইসে।

লক্ষীসরাই পার হইয়া বেহারের নিবিড় তালবন দেখিতে দেখিতে বর্ধিয়ার মুন্সের জেলায় প্রবেশ করিবে। এই সময় হইতে রেল পুনরায় গঙ্গাতীরে আসন্ন করিল। বামে শোণা বা মাগধী নদীর ক্ষেত্র সকল শস্যে পরিপূর্ণ। এই মাগধী তীরে রাজগৃহে রাম বিশ্বামিত্রের সহ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিছু দূর পরেই মোকাম। মোকামের আহালাদির সমস্ত জ্বাই পাওয়া যায়। মোকাম পার হইয়া ৮ ক্রোশ পরে বাড়। বাড়ের পার্শ্ব সকল চামেলী বনে আকীর্ণ। সায়ংকালে কি সোঁগরুই বিস্তার করে। চামেলীর ফুল তৈল, এইস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। বাড় গঙ্গা পার হইয়া দরভাজাগামী ত্রিছতের রেল। দরভাজা হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে সীতার জম্বুজি জনকপুর।

বাড় পার হইয়া ২৫ মাইল পরে কতোয়া। এই স্থানে পুণ্যসলিলা পুনপুনা নদী গঙ্গায় পতিত হইতেছে। এখানে ভাদ্র মাসে মেলা হইয়া থাকে, তাহার পর বেহারের শোভা দেখিতে দেখিতে ডাইন দিকে গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষঃস্থল। মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড চড়া। দূরে উত্তরদিকে ভীষণ গণ্ডকী পতিত হইতেছে। অস্পর্শ পরেই খাপরল গৃহে পূর্ণ, বেহারের রাজধানী পাটনা। বসতি অত্যন্ত ঘন এবং স্থান ব্যবসারে পরিপূর্ণ। মসজিদ অনেক আছে কিন্তু অধিকাংশ মসজিদে লোক পণ্যত্রয়া রাখিয়া থাকে। বর্তমান আলীমের ওদাম যবে ১৭৬৩ অব্দে মীর কাশিম ২০০ ইংরেজ হত্যা করিয়াছিল। ইহারই নিকটে করাসি, ওলন্দাজ ও দিনাঘার-দিগের কুটী ছিল। পাটনার বহু মুসলমানের বাস। নবাবের শিখিল শাসনকালে বড়যন্ত্র করাই ইহাদের কার্য ছিল। শেষাবস্থায় রামনারায়ণ সকলকে ধর্ম করিয়া পাটনার বহু উন্নতি করেন। ইনি কাশ্মীরের মৃত্তিকার পাটনার পারিপাট্য সাধন করিয়া খরবুজ ও ত্রাণের বীজ রোপণ

করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে এই স্থানে দশ কোশ বিস্তীর্ণ গভীর পরিখা-
যুত, কাষ্ঠপ্রাচীর পরিবেষ্টিত ও দ্বাদশ দ্বার সমন্বিত মহা প্রতাপশালী
পাটলীপুত্র নগর ছিল। প্রায় সার্ব্ব ব্রহ্মসহস্র বর্ষ অতীত হইল অজাতশত্রু
কুহুমপুরের নিকট এই নগর সংস্থাপন করেন। বুদ্ধ বৈশালী গমন কালে
আশীর্বাদ করিলেন যেন পাটলীপল্লী সমৃদ্ধিশালী নগর হউক। প্রায় সাত
শত বর্ষকাল এই নগর ভারতের রাজধানী ছিল। নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, মগাধি-
নিস, চাণক্য, পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই স্থানে বাস করি-
য়াছিলেন। তৎকালে শোণ পাটনার নিকট গঙ্গায় পতিত হইত। এখন
পাটনায় প্রাচীন চিহ্ন কিছুই নাই, লোকে কেবল পটনেশ্বরীকে প্রাচীন
বলিয়া ব্যাখ্যা করে। হরিমন্দির শীকমন্দির প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির
দেখিবার অল্পযুক্ত নহে। পাটনা হইতে বাহির হইয়া সহরের ধারে
ধারে বাঁকীপুর পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে। আদালত কলেজ গির্জা আদি সমস্তই
পাটনার পরিবর্তে বাঁকীপুরে সংস্থাপিত। এখানে উচ্চ পিরামিড সদৃশ
একটি হুঁয়া আছে। তাহার নাম গোলঘর। পূর্বে এটি শস্তালয় ছিল।
উপরে উঠিবার সিঁড়ি বাহিরের দিকে পাকে পাকে উঠিয়াছে। ইহার
আভ্যন্তরিক প্রতিধ্বনি অতি চমৎকার। পাটনার খেরো, পিয়ারা, কুল-
কপি, ডালিম ও শস্তাদি প্রসিদ্ধ।

বাঁকীপুরের অপর পারে হাজীপুর, ষ্টিমার ভাড়া ১০। গওক তটে
হাজীপুরে কার্তিকীপূর্ণিমার দিবস হরিহরহজের ১৫ রোজ মেলা হইয়া
থাকে, বিস্তর হাতী ঘোড়া বিক্রয় হয়। হাজীপুর হইতে ত্রিহুতের রাজধানী
মুজফরপুর ৪২ মাইল। বাইতে যানের সুবিধা আছে। মুজফরপুরের
পর সিগোলি দিয়া নেপালের পথ। হাজীপুর হইতে প্রাচীন বৈশালী
নগর ২০ মাইল। বর্ত্তমান নাম বেহারা, গওক তট হইতে এক কোশ।
সত্যযুগে এইস্থানে ইন্দ্র দিতির গর্ভ ছেদন করাতে মকতের জন্ম হয়। তখন
এখানে কুশপ্লবন নামে বন ছিল। ইন্দ্রাকুপুত্র বিশাল ঐ বনপার্শ্বে বৈশালী
নগর নির্মাণ করেন। বৈশালীর রাজগণ বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন।
বুদ্ধদেব সময়ে সময়ে বৈশালী নগরে অবস্থান করিতেন। ১২০০ বর্ষ পূর্বে
চীনমাত্রী কাহিয়ান এই নগর ভ্রম দেখেন, এখন সমস্তই ভগ্নাবশেষে পূর্ণ।

একটা প্রাচীন হুর্গের ভরফর অবশেষ আছে। তাহার চারি কোণে চারিটা স্তম্ভ এবং পরিখা জলে পূর্ণ। মধ্যে একটি নূতন মন্দির রহিয়াছে। হুর্গের দক্ষিণ পশ্চিমে শুপের উপর মুসলমানদের কবর। দক্ষিণে সেই স্থান যেখানে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, আমার নিকরান সম্মুখীন হইয়াছে। এখানে চৈত্রে মেলা হইয়া থাকে। হুর্গের পশ্চিমে প্রশস্ত সরোবরমধ্যে শিব মন্দির এবং পার্শ্বে অনেক ভগ্নমূর্তি হুর্গের ২ মাইল উত্তর পশ্চিমে বাথরা। এখানে বুদ্ধের চৌদ্দপোয়া প্রতিমূর্তি অশোকের ৪০ হস্ত লম্বা সিংহস্তম্ভ, স্তম্ভ দক্ষিণে বুদ্ধের জন্য বানরখাত শুক সরোবর তীরে প্রকাণ্ড বানরমূর্তি ও অনেক ভগ্ন স্তূপ আছে। এইস্থানে ১৪৩৫ বর্ষ পূর্বে বৌদ্ধদেব তৃতীয় মহাধিবেশন হইয়াছিল।

বাকীপুর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে গয়া ক্ষেত্র। ক্ষত্ৰতীর হইতে গয়া অতি সুন্দর দেখায়। প্রবেশ কালে উত্তরপার্শ্বে নানা দৃশ্য, তদন্তর ব্রহ্মযোনি পাছাড়। চারিদিকে পিণ্ড ও পাণ্ডার কলরব হইতেছে। ব্রহ্মযোনির পাদদেশে বিষ্ণুপদ মন্দির। প্রায় ৬৬ হস্ত উচ্চ হইবে। ১৮০০ শকের কিছু পূর্বে মহারাজীর রাণী অহল্যাবাই পঞ্চবিংশতি লক্ষ টাকা এই মন্দির নিৰ্ম্মাণার্থ প্রদান করেন। কিন্তু কেবল বোল লক্ষ ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা কর্মচারীরা অংশ করিয়া লয়। মন্দিরের প্রবেশ মুখে গিলাওয়ার সাহেবের ঘটা। যাত্রীর করগ্রাহী গিলাওয়ার হিন্দুদিগের উপর সম্মুখ হইয়া এই ঘটা ১৭৯৮ অব্দে মন্দির দ্বারে আবদ্ধ করেন। মন্দিরের মণ্ডপ গৃহটি অতি পরিপাটি। চতুর্দিক স্তম্ভ বেষ্টিত। এক এক দিকে আট আট স্তম্ভ। এবং এক এক স্তম্ভ চারিটিতে সংলিঙ্গ। দুই থাকে এই স্তম্ভ ছাদমূল স্পর্শ করিয়াছে। গৃহটি স্তম্ভসমূহের বহির্ভাগে ৩৯ হস্ত ও অভ্যন্তর ভাগে প্রায় একাদশ হস্ত সমচতুর্কোণ। মণ্ডপের সম্মুখে অষ্টপদবিশিষ্ট উচ্চ গৃহ মধ্যে বিষ্ণুপদ সংস্থাপিত। ইহার অভ্যন্তর ভাগ প্রায় ২৫ হস্ত তদ্ব্যধ্যে দুই হস্ত স্থান বিষ্ণুপদে আবৃত। সম্মুখে স্তম্ভচতুর্কটর সমন্বিত ঘটাঘরন মধ্যে নেপালমন্ত্রী রঞ্জিত পাণ্ডে প্রদত্ত ব্রহ্ম ঘটা। পার্শ্বের অনাবৃত পার্শ্বগৃহে ৪৫ শত লোক গোলমাল করিয়া পিণ্ড পাকাইতেছে, কেহ বা ঘটা বাদন করিতেছে, কেহ স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ বা পিণ্ডদান করিতেছে। তার-

তের নানাজাতির ভয়ঙ্কর জনতার মধ্যে পাণ্ডাদের মন্ত্ৰের স্বর ও চারিদিকে জয় গদাধর শব্দ। দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিচরণ করিলে ভিত্তি গাত্রে কত রাজার নাম দৃষ্ট হয়। কোথাও লোন-রাজাস্বজে যুজপালে গয়াকৃতে, কোথাও গোবিন্দপালদেব গভরাজো চতুর্দশ-সহস্রসরে গয়ায়াং-ইত্যাদি কত নাম লিখিত রহিয়াছে। হাকাল! এখন কোথায়, সেই রাজগণ, কোথায় বা তাঁহাদের দান, কোথায় বা তাঁহাদের কীর্তি, কে লিখিয়াছে, কে বুঝিতেছে, কে বা দেখিতেছে। নিকটে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে প্রস্তর নির্মিত গদাধর মন্দির। উত্তর পশ্চিমে পঞ্চকোশ পরিমাপক স্তম্ভ। প্রবেশ দ্বার পার্শ্বে উভয় হস্তীপৃষ্ঠে ইস্র প্রতিমূর্তি। তাহার উত্তর পশ্চিমে গয়াসুরী দেবির মন্দির।

বিষ্ণুপদ মন্দির-প্রাঙ্গণ নিকটে প্রকাণ্ড পুষ্করিনী। ১২৫ হস্ত দীর্ঘ ও ১০৪ হস্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে একটি উত্তম নিম্ন বৃক্ষ ও তীরে স্বর্গামন্দির। পূর্বমন্দির বিনষ্ট হইয়াছে। বর্তমান মণ্ডপ গৃহ ২৬ হাত দীর্ঘ ও ৯ হাত প্রস্থ। প্রস্তর স্তম্ভগুলি বট হস্তাধিক হইবে। গর্ভ গৃহ প্রায় ৬ হাত সমচতুর্কোণ তন্মধ্যে সপ্তষোটকোপরি দ্বিভুজ স্বর্গামূর্তি। বিষ্ণুপদ মন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ব্রহ্মযোনি পর্কতপৃষ্ঠে অক্ষয় বট। নিকটে ভূতেশ্বর মহাদেব। তদন্তরে পরপিতামহেশ্বর। তৎপশ্চিমে কল্লীগুপ্ত। পরপিতামহেশ্বরের মণ্ডপগৃহ ১৮ হস্ত সমচতুর্কোণ, গর্ভগৃহ সপ্ত হস্ত সমচতুর্কোণ, ভিত্তিবেধ ৫৫০ হাত এবং স্তম্ভের উচ্চতা ৯১০ হাত। ব্রহ্ম-যোনি পর্কত গয়ার দক্ষিণ এবং প্রায় ৩০০ হস্ত উচ্চ, নগরের দিকে কিঞ্চিৎ ঢাল। অষ্টাদশ বর্ষ হইল মহারাজার দেবরাও তাও উঠিবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উপরে শক্তিমন্দির ও পঞ্চমুখ দেবতা। বেদিটী ১৬৯০ শকে নির্মিত। আরংজেব এখানকার বিগ্রহ বিনষ্ট করিয়াছে। বাম পার্শ্বে একটি দ্বিভুজ মূর্তি ও নানা স্থানে হরপার্বতীর খণ্ডাংশ।

গয়ার দক্ষিণে বৌদ্ধগয়া বা বুদ্ধগয়া। এখানে বুদ্ধদেব বহুকাল বাণন করিয়াছিলেন এজ্ঞ চীন বর্ণা ও ভোট হইতে বহুলোক আসিয়া এখনও তীর্থ করে। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রাচীন মন্দির সকল এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত

আছে। গয়ার সাহেবগঞ্জ নামক স্থানে সাহেব ও বণিকেরা বাস করে।
গয়ার পেড়া তাহাক পান ও প্রস্তরের দ্রব্য প্রসিদ্ধ।

গয়া হিন্দুদিগের মহাভীর্ষ এবং পিতৃলোকের পরমগতি। এখানে প্রেত-
কণ্ঠে গয় নামে এক অহর তপস্তা করিতেছিল। ব্রহ্মযজ্ঞ করিব বলিয়া
তাহাকে কোশলে পাতিত করেন। গয়াহরের মস্তকে স্থাপিত বিষ্ণুপদ-
প্রস্তর মরীচিকার দেহজাত এবং পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ। ব্রহ্মা গয়াহরকে
তাহার অভিলষিত বর প্রদান করিয়া তদুপরি যজ্ঞ করেন। তদনন্তর
গয় রাজা বহু যজ্ঞ করাতে গয়া নিতান্ত পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

গয়ায় প্রথমদিনে লোকে কঙ্কতে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, গয়ার উত্তরে প্রেত-
শিলায় শ্রাদ্ধ, তদ্বিকটে প্রভাসব্রহ্ম রামভীর্ষে স্নান ও শ্রাদ্ধ এবং পর্বত-
দক্ষিণে যমবলি প্রদান করে। দ্বিতীয় দিনে গয়ার প্রায় ২ কোশ বায়ু-
কোণে প্রেতপর্বতে শ্রাদ্ধ করে। তৃতীয়দিনে উত্তরমানসে কনথলে,
দক্ষিণমানসে কঙ্কভীর্ষে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ ও পর্বতরূপী গদাধর পূজা এই
পঞ্চভীর্ষ করিয়া থাকে। চতুর্থ দিনে ধর্ম্মারণ্যস্থ মতঙ্গবাণীতে কৃপযূপ
মধ্যে ও তদগ্নিকোণে স্নান শ্রাদ্ধাদি করে। পঞ্চম দিনে ব্রহ্মসরে স্নান
ব্রহ্মযূপে শ্রাদ্ধ, তৎ প্রদক্ষিণ এবং তথায় যমবলি প্রদান করে। ষষ্ঠ দিনে
কদ্র বিষ্ণু ব্রহ্ম দক্ষিণায়ি ইত্যাদি ১৭ পদ দর্শন স্পর্শন ও তত্র শ্রাদ্ধাদি
করিয়া গয়াশিরে শ্রাদ্ধ পূজাদি করে। পরে গজকর্কিকায় তর্পণ ও কেদা-
রেশ্বর কণকেশ্বর নরসিংহ ও বামনাদির পূজা করে। ৭ সপ্তমদিনে গদালোলে
শ্রাদ্ধ ও অক্ষরষটে শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যাদি দান করে। পরে যথাসাধ্য
নিরত দিন কৃত্য কর্তব্য। পাণ্ডারা সম্ভবমত দর্শনী ও খাপরলগয়াদি
করাইয়া থাকে। যুগ পৃষ্ঠাঙ্গির চতুর্দিকে ২১০ কোশ করিয়া পঞ্চকোশী
গয়া। উত্তরে ব্রহ্মকূপ, দক্ষিণে দক্ষিণমানস, পূর্বে কঙ্ক ও পশ্চিমে গুপ্তে-
শ্বর, ঐতিমধ্যস্থ স্নান গয়াহরের শির।

গয়ার ১২ কোশ উত্তর পূর্বে রাজগৃহ, গিরিব্রজ, মগধপুর বা কুশাণ্ড-
পুরের ভগ্নাংশেষ। এই স্থানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। এবং ত্রেতাযুগ
হইতে প্রায় মহানন্দের কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে মগধেরা রাজ্য করিয়া-
ছিলেন। ইহার প্রত্যপে এককালে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়। এখন কেবল

সেই পঞ্চ পাহাড়, সেই শোণা নদী ও কতকগুলি ভগ্নাবশেষ অতীত মাহ-
 য়োর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা পশ্চিমদিক দিয়া প্রবেশ করি-
 লাম। উত্তর পশ্চিমে বৈভার গিরি। তথ্যধ্যে লতাজাল বেষ্টিত অগঠিত
 একটি প্রকাণ্ড গুহা। লম্বে ২২।০ প্রস্থে ১১।০ ও উচ্চতায় ৮ হাত। সম্মুখে
 আরও আরও স্থান ছিল। ইহাই বৌদ্ধগণের বিখ্যাত সাতপনি গুহা। বুদ্ধ
 মৃত্যুর তিন মাস পরে ধর্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধগণের এইস্থানে সর্ব প্রথম মহা-
 ধিবেশন হয়। নিকটে আর একটি ভগ্ন গুহা। তৎপরে আর এক ভীষণ
 গুহা। বোধ হয় দুরাশ্রয় জরাসন্ধ এই স্থানে রাজগণকে বদ্ধ করিয়াছিল
 এবং বৌদ্ধ মধ্যাহ্নকালে এই স্থানে তপস্তা করিতেন। ইহারই অনতিদূরে
 জরাসন্ধের বৈঠকী। এখন একটা ভগ্ন স্তূপ মাত্র। নিকটে একটা প্রকাণ্ড
 শিবালয়ের ভগ্নাবশেষ। অনন্তর বৌদ্ধদের পাঁচ মন্দির পার হইয়া উত্তর
 পূর্বে বিপুল গিরি। বৈভার ও বিপুলের মধ্যভাগ সমতল। পাহাড় হইতে
 একটি নদী নামিয়া ঐ দিকে গমন করিতেছে। নদীর বৈহার পার্শ্বে সাতটি
 ও বিপুল পার্শ্বে আটটি উষ্ণ প্রভাবণ হিন্দুদের তীর্থ। নিকটে অনেক দেবা-
 লয় এবং রাজগৃহের হস্তিনাপুর দ্বার। এইস্থানেই জরাসন্ধসীর মন্দির।
 অদূরে জৈনমন্দির ও একটা ভগ্ন চৈত্যাও দেখিতে পাওয়া যায়। বিপুল
 গিরির পূর্বে রত্নগিরি। রত্নগিরির পর উদয়গিরি। উদয় ও শোণ গিরি
 চক্রাকারে দক্ষিণদিক বেষ্টিত করিয়াছে। এইরূপ পঞ্চ পর্বত বেষ্টিত হই-
 লেও জরাসন্ধ পুনরায় প্রাচীর দ্বারা নগর তিন কক্ষায় বিভাগ করিয়াছিল।
 এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। পশ্চিমদ্বার পঞ্চ পাণ্ডুরঙ্গভূমি
 বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজগৃহের পূর্ব পার্শ্বের নাম গিরিব্রজ। ১২ মাইল দূরে
 বিহার নগর। বিহারের এককোশ দক্ষিণে তুল্লীগ্রামে বিলোয়া নামক
 স্থানে বলিষ্ঠর মহাদেব আছেন। এককোশ পশ্চিমে ক্লান্ত্যরা গ্রামে মাঘরা
 লক্ষ্মী বা শীতলা দেবী আছে। ৩ কোশ পশ্চিমে বলিগ্রাম বা বড়গাঁও।
 পল্লাভে স্বর্য়ামন্দির ও অনেক বৌদ্ধমন্দির আছে। বিহারের ৫ কোশ উত্তর
 পশ্চিমে বারাগ্রামে স্বত্বিক ও মণিনাগের আলয় ছিল। এখনও নাগের
 পূজা হইয়া থাকে। কৃষ্ণ গোরখ পর্বতে আরোহণ করিয়া অজ্ঞানকে এই
 সকল তীর্থ দেখাইয়াছিলেন। বিহারের নিকটেই কোশগ্রামে বিশ্বামিত্র

যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যেখানে রাম মারীচকে দূরীভূত করেন, এখন তাহার নাম লৌহ দণ্ড। রাজগৃহ হইতে ৩০ ক্রোশ উত্তরে বালাদিত্যের রাজধানী নানন্দ নগর। এই স্থানে প্রকাণ্ড শক্রবাণী অনেক গুলুক্রীণী ও বৌদ্ধদিগের নাগতীর্থ আছে। রাজগৃহের নিকটবর্তী বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থের ভগ্নাবশেষে পূর্ণ। বিহারকে রাজগৃহ মহাশ্যে হিন্দুদিগের বিহার বন ও বৌদ্ধ পুস্তকে বুদ্ধের বিহার স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। রাজগৃহ, বলিগ্রাম, পাবাপুরী ও গোনায়া জী বিখ্যাত জৈনতীর্থ।

এইরূপে ইচ্ছা হইলে বিহারের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া পাটনার প্রত্যগমন করিবে। পাটনা পার হইয়া দানাপুর। দানাপুর পূর্বে পাটনারই সেনানিবেশ স্থান ছিল। তদনন্তর ভিটা ফেসন। ভিটা হইতে ৪ মাইল দূরে জগদ্বিখ্যাত শোণ সেতু। প্রকাণ্ড শোণের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সেতু চলিয়াছে। অষ্টাবিংশতি ভাগে এই সেতু বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের বিস্তার পূর্ণ শত হস্ত। ইহার এক এক স্তম্ভ ঐশ্বকালেও জলের নিম্নে একবিংশতি হস্ত প্রোথিত থাকে। শোণ বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া গঙ্গার পতিত হইতেছে। ঐশ্বকালে মৃতপ্রায় হইয়া বালুকাময় ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। কিছু বর্ষকালে ইহার অসীম জলরাশি বহির্গত করিবার জন্ত রেলওয়ের পথে অনেক স্থান খাত হইয়াছে। পূর্বে এই নদ ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ পাটনার নিকট প্রবাহিত ছিল।

শোণ পার হইয়া আর্য ও বিহরী পর্য্যন্ত বামদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এই স্থানে তারকার বন ছিল। এই স্থানে ইন্দ্র বৃক্ষ বধ করিয়া স্নান করিয়া ছিলেন। তাহার গাত্রমল ও ককষ অর্থাৎ ক্ষুধা পরিত্যক্ত হওয়াতে তিনি এই স্থানে মলদ ও ককষ নামে দুই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। অগস্ত্যের এই স্থানে আশ্রম ছিল। কিন্তু তারকা সমস্তই বিনষ্ট করে। অবশেষে বিশ্বামিত্র সহ রাম তারকাকে বধ করেন। এখন এই স্থান হলকর্ষিত ক্ষেত্র, দূর এক একটা আশ্রম বৃক্ষ দেখা যায়। শোণ পারাবহি, সাহাবাদ জিলা আরম্ভ।

আর্য। সাহাবাদের রাজধানী। কলিকাতা হইতে ৩৬৯ মাইল। এই জেলা শোণ খালে বিচ্ছিন্ন। শোণ খাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া

পাটনা ছুনার কাশী বকসার প্রভৃতির কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক হিত সাধন করিতেছে। ইহাতে প্রায় ২১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সাহাবাদের স্থানে স্থানে ছীরা ও ফটকির পাওয়া যায়। আরার ৩৬ মাইল দক্ষিণে বিখ্যাত রোহিতাখ বা রোটাস দুর্গ। আরার তিন ক্রোশ পশ্চিমে বৌদ্ধদিগের মহাসর। এখন খণ্ডোয়া নামে পুষ্করিনী ও কয়েকটি মন্দির মুক্তি ও ভগ্নাবশেষ আছে। আরার হইতে অনেকে সরযুগঙ্গাসঙ্গম দর্শন করিয়া থাকে। পূর্বের সরযুসঙ্গমে কামের আশ্রম ছিল। ইহার নাম বেণীবাছ তীর্থ। মহাভারত যতে এখানে কদ্র উপাসনায় ও স্থানে পঞ্চাশমেধ ফললাভ। এখন লোকে বলি ভগ্নাশ্রম বলিয়া থাকে। ইহার নিকটস্থ বটয়াক অতি প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালে ছায়ার পরিসর প্রায় ৮০০ হাত হয়।

অনন্তর বিহিয়া। দক্ষিণে জগদীশপুরের জঙ্গল। এই জঙ্গলে ১৮৫৭ অব্দে কুমার সিংহের সৈন্যের আশ্রয় লইয়াছিল। জঙ্গল কাটিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পরাভূত করেন। তদনন্তর রঘুনাথপুর। ইহারই এক ক্রোশ দূরে ব্রহ্মপুরে শিবরাত্রির মেলা হয়। তৎপরে ডুমরাও। এখানে একজন রাজা আছেন। নিকটে ভোজপুর। এখানকার লোক এত ভুচ্ছ যে এরূপ ভুচ্ছ লোক ভারতে পাওয়া ভার।

অনন্তর বকসার। কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল। ইংরেজ সেনাপতি মনরো ১৭৬৪ অব্দে এই স্থানে মীর কাশিম ও অযোধ্যার সৈন্য জয় করিয়াছিলেন। নগর মধ্যে মুসলমানদিগের কয়েকটি উত্তম মসজিদ আছে। দুর্গ নদীতীরে অবস্থিত। গঙ্গার অপর পারে গবর্ণমেণ্টের অস্থশালা। বকসারের বা ব্যাভ্রসরের চারিদিকে অনেক বৌদ্ধমূর্তি। তিন মাইল দূরে বৌদ্ধদের একটি উৎকৃষ্ট মন্দির আছে। এবং নগরের ৪ মাইল দক্ষিণে সানিরামের প্রশস্ত পুষ্করিনী মধ্যে সের সাহার বিখ্যাত কবর। বকসারে রামেশ্বর, পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রাশ্রম আদি নানা স্থানের নাম আছে। গৌরিশঙ্করের মন্দিরের সম্মুখবর্তী পুষ্করিনীকে অনেকে অম্বসর বলিয়া থাকে।

অনন্তর দিলদার নগর। কলিকাতা হইতে ৪৬৩ মাইল। অখণ্ডা গ্রাম নষ্ট করিয়া আরংজেব দিলদার নগর স্থাপন করেন। নগরের পশ্চিমস্থ পুষ্করিনীর নাম রাণীসাগর।

দিলদার নগর পার হইয়া কয়েক মাইল পরেই কলিকাতার লেফটেনেন্ট গবর্নরের রাজ্য সীমা কর্মনাশা নদী । ত্রিশকুর লাল হইতে বিনির্গত বলিয়া হিন্দুমাত্রেরই কর্মনাশার জলস্পর্শ করেন না । সেতুটি একাদশ খণ্ডে বিভক্ত । প্রত্যেক খণ্ড ২৬ ইঞ্চি অন্তর ।

জমানীয়া । কলিকাতা হইতে ৪৪০ মাইল । গঙ্গা অতি নিকট । ৩০ বৎসর ক্রমাগত ১২ ফীট করিয়া ডাঙ্গিয়া আসিতেছে । নিকটে গাজীপুর । গাজীপুরের চারিদিকে গোলাপের বন । ১০ টাকা বোতলের গোলাপ জল, ৫০ টাকা ভরি আতর এখনও প্রস্তুত হইতেছে । কিছুকাল পূর্বে দুই লক্ষ ফুল হইতে এক তোলা আতর প্রস্তুত হইত । তাহারই ভরি শত টাকা ছিল । জমানীয়ার অপর নাম জামদগ্না নগর । ভগ্নাবশেষে রেলওয়ের রাস্তার বিস্তার সাহায্য হইয়াছে । ষ্টেশনের ৩ মাইল দূরে লাট নামক স্থানে ৬২ ফীট উচ্চ অশোকরাজের স্তম্ভ ।

জমানীয়া পার হইয়া কিছু দূর পরে মোগলসরাই । এখান হইতে এক রেল কাশী গিয়াছে । কাশী ষ্টেশন জাহ্নবী তটে সংস্থিত । ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান মাত্র অপর পারে কি মনোহর দৃশ্য । প্রান্ত হইতে প্রান্তপর্যন্ত ক্রোশাধিক দূর বিস্তীর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট ঘাট প্রণীতি কি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছে । কিন্তু নদীর প্রভাবে কোন কোনটা বা বসিয়া যাইতেছে, কোন কোনটা বা ভয়ঙ্কর দৈত্যের ন্যায় পতনোন্মুখ হইয়া আছে এবং কাহারও বা বিকটাকার প্রস্তর খণ্ড পতিত হইয়া ভাগীরথীর বীচমালা বিভিন্ন করত কল্লোলধ্বনি বৃদ্ধি করিতেছে । ভারতের বহুদেশাগত বিচিত্র বসনধারী বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও যতিবৃদ্ধ বিমর্দিত বিস্তীর্ণ ঘাট পরম্পরা তরুণ ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতলবিশিষ্ট ঘাট-বন্ধি হস্তাধিক বিস্তীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদমালা, তদবকাশে বহুশীর্ষ সমাযুক্ত জাঙ্ঘল্যামান স্বর্ণকলস ভূষিত মন্দিররাজির মনোহর গঠন স্থানে স্থানে স্বর্ণ পতাকা ও দ্বৈত বায়ুবেগে আন্দোলিত বিচিত্র ধ্বজবস্ত্র ও অজুচ্চ স্তম্ভচতুষ্টয় সমন্বিত বৌদ্ধধর্মের বিশাল মন্দিরাদি প্রাকৃতকচিত্ত অকণকিরণে রঞ্জিত হইলে যে কি শোভা বিস্তার করে তাহা কি বর্ণনা করিব । সভ্যই যেন ভবানীপতির পুরী সন্দর্শন করিতেছি । সভ্যই যেন অন্নপূর্ণা বিরাজ

করিতেছেন। আমেরিক ভ্রমণকারী মিন্টরন বলেন আমি এরূপ পুলিন শোভা পৃথিবীতে দেখি নাই।

উত্তরে ডাইনদিকে নৌকার সেতু। কিন্তু সেতু হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির বহুদূর। চারি পয়সায় নৌকায় পারই হুবিধা। মাল্লারা ও গঙ্গাপুন্ড্রেরা নবাগত বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই দৌরাহা করিবে। উত্তরখণ্ডগামীগণ বেণীমাধব নিম্নে পঞ্চগঙ্গাঘাট, বিশ্বেশ্বরগামীগণ তদক্ষিণে মণিকর্ণিকা ঘাট ও বাঙ্গালীটোলাগামীগণ তদক্ষিণে দশাশ্বমেধে উত্তীর্ণ হয়। মণিকর্ণিকা চুনার প্রস্তর নির্মিত ও প্রশস্ত। কিন্তু এক্ষণে গঙ্গায় ভগ্ন হইতেছে। ভগ্ন প্রস্তরের উপর অনেক কাষ্ঠফলক স্থাপিত রহিয়াছে। তদুপরি বসিয়া লোকে পূজা সমাপন করে। সোপানাবলির কোন স্থানে পুষ্প, কোথাও চন্দন ও কোথাও অপরাপর দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে। ঘাটের উপরিভাগে রেল বেষ্টিত। ও চতুর্দিকে সোপানাবলি অথিত বিবর্ণ জলপূর্ণ চতুষ্কোণাকার মণিকর্ণিকা কুণ্ড। প্রতি পঞ্চদশ দিবসে গবর্ণমেণ্ট পূর্বদিকের মূর্তি দিয়া জল পরিবর্তন করেন। বর্ষাকালে কুণ্ড গঙ্গার জলে ও কদম্বে পূর্ণ হইলে কার্তিকে উৎসাহ করিতে হয়। মণিকর্ণিকা নিকটে গঙ্গাপুন্ড্রগণের উপবেশন স্থান। কেহ বা কোন নিরীহকে নিম্নে কুণ্ড মধ্যে মণিকর্ণিকে মহাভাগে বলিয়া স্নানমন্ত্ৰ বলাইতেছে, কেহ বা ভিক্ষার জন্ত পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কেহ বা আর এক জনকে এরূপ জালে জড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং কেহ বা নবাগত ব্যক্তি দেখিলেই ব্যস্ত করিতেছে। অগ্রে চুক্তি করিয়া পরে তীর্থ স্থানে সকল কার্য করা বিধেয়।

স্নানের মন্ত্ৰ পাঠকগণ গঙ্গাপুন্ড্র ও দেবদর্শকগণ যাত্রাওয়ালা নামে খ্যাত। গঙ্গাপুন্ড্রের পরিশ্রম জন্ত ৮ ও যাত্রাওয়ালার একদিনের পরিশ্রম জন্ত ১০ যথেষ্ট। পঞ্চকোশী যাত্রায় তাহার খোরাকী বাদ ১৫০। এক জনের যাত্রী হইলে আর বিরক্ত করে না। কিন্তু সকলকে নবাগত ব্যক্তি জানাইবার জন্য হস্তে মৃত্তিকা ভাণ্ডে জল ও পুষ্প দিয়া থাকে। সে ব্যক্তি যে মন্দিরে গমন করুক সবলেই প্রভারণার চেষ্টা করে। অতএব দর্শকগণের নিতান্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রতি মন্দিরে এক পয়সা দক্ষিণ দেওয়া দর্শকের ইচ্ছা।

কাশীর পূর্বদিকে গঙ্গা উত্তরমুখে কোণাংশ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে । মণিকর্ষিকার পশ্চিম দক্ষিণাংশে বিশ্বেশ্বরের পথ । কাশীর সকল পথই প্রস্তর নিৰ্ম্মিত তুনিভাস্ত অপ্রশস্ত । উত্তরপার্শ্বে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও সৰ্ব্বভাগ লোক ও ঘূষে আচ্ছন্ন । বেদিকে দৃষ্টিপাত কর শিবালয় ও শিব-মূৰ্ত্তি । মন্দিরে শিব, বাহিরে শিব, পথে শিব, সকলেরই মুখে শিব শিব শব্দ । কেহ বলে কাশীনাথ, কেহ বলে বিশ্বপতিনাথ । সকলেই পুষ্পাদি লইয়া মন্দিরে দৌড়িতেছে । কেহ বা পথের শিবের উপর ককণাবিশিষ্ট হইয়া গঙ্গাজল ও বিলুদল বর্ষণ করিতেছে । এই সকল দেখিতে দেখিতে যাইবার কালে ভূষাদিত ভগুতপন্থীর ভীষণ ভিক্ষা শব্দে সময়ে সময়ে ভীত হইতে হয় । কিছু দূর গিয়া ডাইনদিকে গমন করিলে বিশ্বেশ্বরের পশ্চাৎ দ্বার ও বামদিকে গমন করিলে বিশ্বেশ্বরের প্রধান দ্বার পাওয়া যায় । বিশ্বেশ্বরের বাটীটী চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ও খোদকারীতে পূর্ণ । উত্তরমুখে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ ও বামদিকে গৃহস্থের দরজার মত দেব দেবী পূর্ণ দরজা । মধ্যস্থলে একটি মণ্ডপ ও তন্মধ্যে একটি শিব ও কয়েকটী বৃহৎ ঘণ্টা । মণ্ডপের চারিপার্শ্বের কুঠরী ও দালান দেব দেবীতে আচ্ছন্ন । পূর্বদিকের পার্শ্বে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণমণ্ডিত ক্ষুদ্র মন্দির । যতদূরে মনুষ্য স্পর্শ করিতে পারে তাহার উপর হইতে স্বর্ণমণ্ডিত । বিশ্বেশ্বরগৃহের চারি দ্বার । পূর্বদ্বার প্রায়ই বন্ধ থাকে, উত্তর দ্বারে মহাস্ত উপবিষ্ট, পশ্চিমদ্বার প্রধান এবং দক্ষিণ দ্বার দিয়াও লোক প্রবেশ করিতেছে । গৃহটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ১২ জনের বসিবার উপযুক্ত ও সমস্ত মার্বেল মণ্ডিত । মধ্যস্থলের কুণ্ড মধ্যে বাগলিঙ্গ মূৰ্ত্তি বিশ্বেশ্বর বিরাজিত । লোকে হৃৎ জল তণ্ডুল পুষ্প চন্দন ও মালা অনবরত মন্তকে প্রদান করিতেছে । এত গোল যে বিশ্বেশ্বরের পরিবর্তে অপর লোকের মন্তকে পড়িতেছে । প্রাতঃকালে জনতায়ে প্রবেশ করা বড় কঠিন । কিন্তু দৃষ্টিটি অতি মুগ্ধকর । যখন সেই গৃহমধ্যে উন্নতকায় পঞ্জাবী, ধর্ম্মাকৃতি আবিড়ী, মধ্যমাকৃতি বঙ্গবাসী আদি ভিন্নাকার ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ভাষি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যুবক যুবতীগণ, পরস্পরের গাত্রে সংমর্দিত হইলেও পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া, এক পরিবারের লোকের জায় স্থানাভাব বশতঃ পরস্পরের হস্তে হস্ত দিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাকে, তখন কে না বলিয়া

থাকিতে পারে, ভারত এখনও তোমার একতা বিনষ্ট হয় নাই। এখনও বিংশতি কোটি লোক জাতা ভগিনীভাবে মিলিত রহিয়াছে। এখনও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হইলে ভিন্নাভিন্ন ভিন্নভাষী বিংশতি কোটি লোক মুহূর্ত্ত মাত্রে মিলিত হইয়া যায়। হা ঋষিগণ! তোমরা একত্র হইবার এত কৌশল করিয়া গেলেও গৃহ বিচ্ছেদে ভারত পদানত হইয়াছে। এবং তোমাদিগকে নির্কোষ বলিয়া নিন্দা করিতেছে। মহাদেবের যে মন্তকে বীরপ্রবর ভীষ্ম পুষ্প দান করিয়াছিলেন, যাহার উপর অর্জুন আসিয়া বিলুদল বর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া জরাসন্ধ শত-কন্দ্রীয় পাঠ করিয়াছিলেন, এখন দাসদিগকে সেই মন্তকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দেখিয়া কাহার চক্ষু হইতে নেত্রজল বিগলিত না হয়। বেলা দশটার পর হইতে এই সকল জনতা ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। রাত্রিকালে ৮।০ ও ১১ টার সময় হইবার বিচ্ছেদের আরাত্রিক দর্শন অতি প্রীতিপ্রদ। উপাসকেরা অভিষেক করিয়া বিচ্ছেদের চন্দন ও মালা দানে ভূষিত করিতে থাকে। তিন জন দক্ষিণে ও তিন জন পশ্চিমে এক জন পূর্বে বসিয়া সাতটি পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে। ঐ সময়ে কয়েক জন এক কোণ হইতে স্মধুর স্বরে * “ছস্তো ছস্তো ছঅস্তো,” বলিয়া নিস্তব্ধ হয়। তৎক্ষণাৎ অপর কোণ হইতে আর কয়েক জন “হিতা হিতা ছঅস্তো,” বলিয়া উঠে। যখন বারম্বার এইরূপ শব্দে শিবকে প্রবোধিত করিতে থাকে তখন পাষাণেরও মন স্রবীভূত হয়। তালে তালে ডমক ঘণ্টা ও গাল বাজ হইতে থাকে। এবং পুরোহিতগণ স্তব পাঠ করিতে করিতে আরাত্রিক সমাপন করেন। বিচ্ছেদের বাটী হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম মুখে কয়েক হস্ত পরেই ভিক্ষুকায়ত্ন অন্নপূর্ণার আলয়। প্রবেশ দ্বারেই বাঁড় রোমস্থ করিতেছে। বাটীটী বিচ্ছেদের অপেক্ষা প্রশস্ত এবং খোদকারিতে পূর্ণ। মহামণ্ডপ ও গর্ভ গৃহ প্রদক্ষিণ করিবার চারিদিকে প্রশস্ত স্থান, যণ্ডে পরিবেষ্টিত। অন্নপূর্ণা দেবী ভিত্তিগাত্রে সংস্থিত। দুই প্রহরের পর অভিষেক হইলে সর্বজাতিকে স্পর্শ করিতে দেয় না। বাটী মধ্যে

অনেকে কুমারী পূজা করিতেছেন । কাশীর অনেক কুমারী বেশী কড়া ও শূদ্র জাতীয়া । আনোতা মহাশয়েরা তাহাদিগকে দুই চারিটা পয়সা দিয়া তাহাদের প্রাপ্যগুলি আত্মসাৎ করেন । প্রতারকপূর্ণ কাশীর এইরূপ প্রথা । অন্নপূর্ণার বাটী হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম মুখে যাইতে কয়েক হাত মধ্যেই ডাইন দিকে মোড়ের মাথায় পথের গায়ে সিম্হরলিগু চুণ্ডী-রাজ গণেশ বসিয়া আছেন । ভাঙ্গা শুঁড়টীর কতক রোপ্য নির্মিত এবং কখন কখন কাপড়ে পেটীটা ঢাকা । চুণ্ডী হইতে উত্তর মুখে গিয়া কিছু দূর পরেই মসজীদ পার্শ্বে জানবাপীর দরজা । জানবাপী বর্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তর ও সাবেক মন্দিরের অর্থাৎ মসজিদের দক্ষিণ । জানবাপীর আয়তনের মধ্যভাগে ৬৪ স্তম্ভবিশিষ্ট একটা নাতিদীর্ঘ মণ্ডপ আছে । মণ্ডপের পার্শ্বস্থ অনারত স্থানে নানা দেব দেবী ও দুই একটা রুক আছে । মণ্ডপের পূর্বভাগে লোহজালে আরত জানবাপী নামক প্রস্তর প্রতিমিত সুদৃশ্যরূপ । নীচে যাইবার লোহময় সিঁড়ী আছে । এবং স্থানের জন্ত তলায় অর্দ্ধভাগ বাঁধান আছে । কিন্তু রূপ মধ্যে স্থান করা দূরে থাকুক পূজার জন্ত প্রত্যহ পতিত বিলুপ্তে জল এত দুর্গন্ধ যে কাহার সাধ্য নাসিকার নিকট লইয়া আসে । জানবাপীর পূর্বদিকে সম্মুখে ৭ ফীট উচ্চ নন্দিকেশ্বর নামক প্রস্তরনির্মিত ব্রহ্ম যাঁড় । আয়তনের উত্তরে মসজিদের প্রাঙ্গণ প্রায় একতলা সম উচ্চ হইয়াছে । এজন্ত অপর পার্শ্ব দিয়া মসজিদে যাইতে হয় । এই মসজিদ পূর্বে বিশ্বেশ্বরমন্দির ছিল । প্রায় তিনশত বর্ষ হইল মহারাজা মানসিংহ ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । প্রায় দুইশত বর্ষ অতীত হইল দিল্লীর হুস্রাওয়া সম্রাট আরংজেব মন্দিরে জমা মসজীদ করিয়াছে । তদবধি প্রাচীন বিশ্বেশ্বর বিলুপ্ত ও বর্তমান বিশ্বেশ্বর বাণ রাজার প্রাচীন শিবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । বিশ্বেশ্বর মন্দিরের কিছু দূর উত্তরে দণ্ডপাণি, চক, ভৈরব-নাথ, কালকূপ ও বিন্ধ্যমাধবাদির স্থান । কালকূপের বাহিরের ভিত্তিতে এমন একটা ছিদ্র আছে যে, প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য কিরণ উহার মধ্য দিয়া রূপে প্রবেশ করে । বৌমাধবের মন্দির ও হুস্রাওয়া আরংজেব ভগ্ন করিয়া মসজীদ করিয়াছে । এখন বৌমাধব তাহারই পার্শ্বস্থ গৃহে

আছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন মন্দির বা মসজীদের প্রাঙ্গণের চারি কোণে ৯৮ হস্ত উচ্চ এক বিশাল স্তম্ভ আছে। তাহার নিচের বেড় ৫১০ হাত ও ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়াতে উচ্চের বেড় ৫ হাত। উপরে উঠিবার ১৩০ সিঁড়ি। কিন্তু স্তম্ভ গুলি প্রায় এক হাত হেলিয়া থাকতে সাবধানে উঠিতে হয়। ইহার পর অনেক মন্দির ছাড়াইয়া ভাঙ্গা কেল্লা বা পতিত স্থান। ৭০০৮০০ বর্ষ পূর্বে এই স্থানে অনেক বসতি ছিল। তত্বতরে কাশীর উত্তর সীমা গঙ্গা বকণা সঙ্গম। দুই মাইল দূরে কলেজ। কলেজটি গাথিক জাতীয় হুয়া। নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ ও মিউজিয়ম বিশিষ্ট। বেফন মধ্য অশোকের আজ্ঞা খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ। পূর্বে এই স্তম্ভ নদী তীরে আরংজেব মসজিদের সম্মুখে ছিল। কাশীর দুই ক্রোশোত্তরে বৌদ্ধদিগের সারনাথ মন্দির। এখানে পূর্বে অনেক বসতি ছিল। গৌড়ে-খর পালেরা ১০৮৩ অব্দে মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। এখন ভাঙ্গা ইট ও প্রস্তরে প্রায় ৩০৩২ বিঘা ভূমি জড়িয়া আছে। অবশেষের মধ্যে ৪৬ হাত উচ্চ ৪৬ হাত বিস্তৃত ও ৮ হাত বেগবিশিষ্ট প্রস্তর ও ইটকে প্রথিত এক স্তম্ভ আছে। উপরে নানা প্রকার অবয়ব ও ফলাদির প্রতিকৃতি খোদিত আছে। বৌদ্ধের বিখ্যাত চারি স্তম্ভের মধ্যে এটি একটি। বিষ্ণুধরের মন্দিরের দক্ষিণে অতি-অপ্প দূরেই নেপালীয়দের সূদৃশ মন্দির। তৎপরে সূপ্রসিদ্ধ মানমন্দির। ১৬৮০ অব্দে জয়পুররাজ জয়সিংহ ইহা নির্মাণ করেন। বাটীটি সমচতুষ্কোণ, প্রস্তর নির্মিত প্রশংসিত এবং উপরের সমতল ছাদের উপর নানাবিধ যন্ত্রাদি বিশিষ্ট। এই নক্ষত্রাদির বিষয় নিরূপণ করাই প্রস্তর নির্মিত এই সফল প্রকাণ্ড যন্ত্রের উদ্দেশ্য। সূর্যের প্রাত্যহিক গতি নিরূপণার্থ ৭ হাত ৮ অঙ্গুল উচ্চ ও ছয় হাত বিস্তৃত ভিত্তি কাশীর যামোত্তর রেখার উপর সংস্থাপিত আছে। এই-গণের দূরতাদি নিরূপণার্থ ২৪ হাত লম্বা ও ৩ হাত প্রশস্ত স্থান আর একটি যন্ত্র দ্বারা ব্যাপ্ত আছে। কিন্তু সকলই এখন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মানমন্দিরের দক্ষিণে দশাশ্বমেধ ঘাট ও বাঙ্গালি টোল। এখানে বাড়ীওয়ালাদের নিকট থাকিবার বাসা পাওয়া যায়। কিন্তু বাড়ীওয়ালারা গঙ্গা-পুঞ্জের নিকট কমিসনরী খান ও নিরীহ ভ্রমণকারীকে কুমারী পূজা ও নানা-

কার্যে রত করান। ইহাদের বাণীতে সকলই পাওয়া যায়। এই দিকেই কেরোরখর, তিলভাণ্ডেখর, বিজয়নগরের রাজার বাণী, ভেলুপুর, হুর্গাবাণী ও কাশীর দক্ষিণ সীমা অসিসঙ্গম। হুর্গাবাণীতে বানরের বড় উপদ্রব। নিকটে চারিধার গাঁথান পুষ্করিনী। হুর্গাবাণীর মন্দিরটি উৎকৃষ্ট। প্রাঙ্গন মধ্যে দ্বাদশ স্তম্ভবিশিষ্ট কোণে কলস সমন্বিত ও ১৮০০ অব্দে মির্জাপুরেব মাজিষ্ট্রেটদত্ত ষষ্ঠাবৃত্ত উত্তম খোদিত মণ্ডপ। অসি নদী একটি শুষ্ক নর্দমা তুল্য। কিছু দূরে খালের পরিচয় পাওয়া যায়। তদনন্তর সিকরোলে ইংরেজেরা বাস করেন। উৎকৃষ্ট উদ্যান উপনদী, নিকুঞ্জবন, পদাতি ও অখারোহী সৈন্তের গৃহ, গির্জা, কাছারি, ডাকঘর ও অপরাপর হর্ষে সিকরোল সুন্দররূপে সুশোভিত। রাজঘাট হইতে এখানকার গাড়ী ভাড়া ২। কাশী সহরে বসতি অতি ঘন। ছাদ হইতে ছাদান্তরে যাওয়া যায়। রাস্তা অতি অপ্রশস্ত ও জনপূরিত। সহর মন্দির ও ভারত বাসী রাজগণের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় শোভিত। প্রায় সহস্র মন্দির ও ৩০০ মসজিদ আছে। কাশীতে ৬৪ যোগিনী, ৫৬ গণেশ, ৯ চণ্ডী, ১২ রবি, ১৬ গৌরী, সপ্তমুখি, সপ্তপুরি, অষ্ট তৈরব, চতুর্দশ মহালিঙ্গ ও অসংখ্য শিব বিদ্যমান। বিপানি সকল অব্যোপূর্ণ। বানারসী মাদী কালাবতুর কাজ, হুচের কাজ, খুটোপাথরের কাজ, সামান্য পাথরের জিনিস, সাধারণ গির্টি জিনিস, কাঠের কোঁটা দি ক্ষুদ্র জিনিস ও পিতলের সামান্য অব্যোপূর্ণ কাশী প্রসিদ্ধ। বুদ্ধলঞ্চগুহ হীরার বাজারই কাশী। পাতিলেবু, পিয়ারা, আচার, আম, কুল, বেল, মোরঙ্গা ও আমলা উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়। কাশীর চিনি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কোনমতে সত্য ও কোনমতে ত্রুতায় শিব কাশী স্থাপন করেন। দিবদাসের সময়ে কাশী শূন্য ছিল। পরে পুনরায় শিববাস হয়। কলিতে বৌদ্ধের সময় হইতে বৌদ্ধের সময় পর্যন্ত ও পরে পালেদের সময়ে কিছুকাল বৌদ্ধদের বাস হইয়াছিল। পাঠান সময়ে দৌরাস্তা। আকবর কালে উন্নতি। আরংজেবের কালে বিনষ্ট প্রায় ও মহারাষ্ট্রকালে উন্নতিশীল হয়। তৎপরে বর্তমানকাল। কাশীতে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বকগাঙ্গাম ঘাট, এক মাইল পরে রাজঘাট, তেলিপাড়া, প্রহ্লাদ, ত্রিলোচন, লাল, গো, শীতলা, ব্রহ্মা, হুর্গা, পঞ্চগঙ্গা, রাম, যোষলা, শকট,

সেদ্ধিগা, মণিকর্ণিকা, জলসাঁই, ললিতা, মীর, মানমন্দির, দশাশ্বমেধ চতুঃ-
ষক্তি, পাঁড়ে, ললুামিশ্রি, কেদার, হনুমান, শিবাল। ও অসি-এই কয়েকটা
প্রধান ঘাট পাওয়া যায়।

কাশীর গঙ্গা ১২০০ হস্ত বিস্তৃত ও ৩৩ হস্ত গভীর। বর্ষায় ৪০ ফীট
উচ্চ ও অর্দ্ধমাইল বিস্তৃত হয়। কাশী তিন মাইল লম্বা ও অর্দ্ধমাইল
বিস্তৃত। মধ্যমেখরকে কেন্দ্র করিয়া দেহলি গণেশকে বাসার্ক লইয়া রক্ত
অঙ্কিত করিলে পাষমতে কাশীর সীমা হয়। কাশীর বিপরীত পারে রাম-
নগরের রাজবাটা। তম্বিকটে চিত্রসিংহের পুষ্করী ও অর্দ্ধনির্মিত দেবতাদি
সহ মন্দির। কেল্লা মধ্যে বেদব্যাসের মূর্তি, তথায় মাঘ মাসে মেলা হয়।
কাশীতে দোলের ৭ দিন মধ্যে বুড়োয় মঙ্গলের মেলার বড় ধুম। কাশীর
অন্তর্গৃহ যাত্রা ও পঞ্চকোশী যাত্রা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

অন্তর্গৃহ যাত্রা—১ মোদবিনায়ক জ্ঞানবাণী পূর্বে কাশীকরোয়াতগলি,
২ প্রমোদবিনায়ক আরংজেবের মসজিদ পূর্বে, ৩ সুমুখবিনায়ক ঐ স্থানে,
৪ দুর্গুখ ঐ, ৫ গণনাথ জ্ঞানবাণীর বাজার দক্ষিণে, ৬ বিশ্বেশ্বর, ৭ মণি-
কর্ণিকা, ৮ সিদ্ধিবিনায়ক ঐ স্থানে, ৯ মণিকর্ণিকেশ্বর কাকারাম গলি, ১০ কঙ্ক-
লাশ্বতর ঐ স্থানে, ১১ বাহুকীধর শঙ্কটাঘাট, ১২ পর্বতেশ্বর, ১৩ গঙ্গাকেশব
ললিতাঘাট, ১৪ জরাসন্ধেশ্বর মীরঘাট, ১৫ সোমেশ্বর মানমন্দির ঘাট, ১৬
বরাহেশ্বর দশাশ্বমেধঘাট নিকট, ১৭ ব্রহ্মেশ্বর খালিসপুরা নিকট, ১৮ অগস্তী-
শ্বর ঐ স্থানে, ১৯ কঞ্চপেশ্বর জঙ্গম মহল্লা, ২০ হরিকেশব ঐ স্থানে, ২১ ঠেবত-
নাথ কুদৈয়ের চৌকী নিকট, ২২ ক্রবেশ্বর ঐ স্থানে, ২৩ গোকর্ণেশ্বর ঐ স্থানে,
২৪ হাটকেশ্বর হড়হাচৌক, ২৫ অস্থিকেশব তড়াগ ঐ, ২৬ কিকেশ্বর ঐ, ২৭
চণ্ডেশ্বর শঙ্কটাঘাট নিকট, ২৮ বীরেশ্বর ঐ, ২৯ চিত্রগুপ্ত মহরহটার ফাটক
চৌকের উত্তর, ৩০ চিত্রঘাট চন্দিনাউরগলি, ৩১ পশুপতীশ্বর চৌক নিকট, ৩২
ভারভূতেশ্বর রাজদ্বার নূতন চৌক নিকট, ৩৩ পিতামহেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী মহল্লা,
৩৪ কলসেশ্বর ঐ, ৩৫ বিজ্ঞেশ্বর ঐ, ৩৬ নাগেশ্বর ঘোষলাঘাট, ৩৭ অন্নীশ্বর
ঐ, ৩৮ হরিশ্চন্দ্র শঙ্কটাঘাট, ৩৯ চিত্তামণি ঐ, ৪০ সেনাবিনায়ক ঐ, ৪১
বশিষ্ঠ বামদেব ঐ, ৪২ সীমাবিনায়ক ঐ, ৪৩ বকর্ণেশ্বর ললিতাঘাট, ৪৪
জিন্দেশ্বর ঐ, ৪৫ বিশালাক্ষী মীরঘাট, ৪৬ ধর্মেশ্বর ঐ, ৪৭ ধর্মরূপ ঐ,

৪৮ বিশ্ববাহক ঐ, ৪৯ আশাবিনায়ক ঐ নিকট, ৫০ রজাদিতা ঐ, ৫১ চতুর্ভুজেশ্বর ঐ নিকট, ৫২ ব্রাহ্মীশ্বর ঐ, ৫৩ মনঃপ্রকামেশ্বর দুগির অদূরে, ৫৪ ঈশানেশ্বর ঐ, ৫৫ চণ্ডিচেশ্বর ঐ, ৫৬ ভবানীশ্বর ঐ, ৫৭ অন্নপূর্ণা, ৫৮ দুগিরাজ, ৫৯ নকুলেশ্বর দুগির অদূরে, ৬০ রাজরাজেশ্বর দণ্ডপাণির অদূরে, ৬১ পরামেশ ঐ, ৬২ লাকুলেশ্বর কর্চোরিগলি, ৬৩ পরমেশ্বরের দুগির অদূরে, ৬৪ প্রতিগ্রহেশ্বর ঐ, ৬৫ নিফলেশ্বর ঐ, ৬৬ মার্কণ্ডেশ্বর ঐ, ৬৭ অঙ্গদেশ্বর জ্ঞানবাপীর উত্তর ফটক, ৬৮ গজেশ্বর জ্ঞানবাপীর অশ্বখতলে, ৬৯ জ্ঞানবাপী, ৭০ নন্দীকেশ্বর ঐ স্থানে, ৭১ তারকেশ্বর ঐ, ৭২ মহাকালেশ্বর ঐ, ৭৩ দণ্ডপাণি বিষ্ণেশ্বরের অদূরে, ৭৪ মহেশ্বর জ্ঞানবাপীর অদূরে, ৭৫ মোক্ষেশ্বর ঐ, ৭৬ বীরভদ্রেশ্বর ঐ, ৭৭ অবিমুক্তেশ্বর ঐ, ৭৮ পঞ্চগণেশ জ্ঞানবাপীর দরজার বামে, ৭৯ বিষ্ণেশ্বর । ইতি কাশীখণ্ডে ৮০ অধ্যায়ে লিখিত অন্তর্গত যাত্রা ।

পঞ্চকোশীযাত্রা ।—মণিকর্লিকা । সিদ্ধবিনায়ক ঐ । মণিকর্লিকেশ্বর । গঙ্গকেশব ললিতাঘাট । ললিতা ঐ । জরাসন্ধেশ্বর মীরঘাট । সোমেশ্বর দশাশ্বমেধ । দালভেশ্বর মানমন্দির । শূলভৈরব দশাশ্বমেধ । আদিবরাহ ঐ । দশাশ্বমেধ । বন্দিদেব রাণামহলাঘাট । সর্বেশ্বর যোগিনীঘাট । কেনারেশ্বর সোনাপুর রাস্তা । হনুমদীশ্বর হনুমানঘাট । সঙ্গমেশ্বর অসিসঙ্গমঘাট । লোলার্ক বালোকানার্ক ঐ । অর্কবিনায়ক ঐ । দুর্গাকুণ্ড দুর্গাবাটী । দুর্গাবিনায়ক ঐ । দুর্গাদেবী ঐ । বিশ্বক্সেনেশ্বর কর্দমেশ্বর রাস্তা । কর্দমেশ্বর কাঙ্কওয়াগ্রাম । (অত্র ৩০ কোশ পরে প্রথম দিন প্রায় শেষ) । কর্দম তীর্থ তত্র । কর্দমকূপ তত্র । সোমনাথ কালেজ মহলা । বিকপাক তত্র । নীলকণ্ঠ অমরাগ্রাম । নাগেশ্বর তত্র । চামুণ্ডা অণ্ডেগ্রাম । মোক্ষেশ্বর তত্র । বরুণেশ্বর তত্র । বীরভদ্রেশ্বর টেলনাগ্রাম । বিকটাক তত্র । উষত্তৈরব ঘোরাগ্রাম । নীলগণ ঘোরাগ্রাম । কালকূট বিনায়ক নিকটে জঙ্গলে । বিমলা দুর্গা তদগ্রে । মহাদেব তদগ্রে । নন্দীগণ তদগ্রে । ভুজারীট তদগ্রে । গগপ্রিয় তদগ্রে । বিকপাক গোঁরাগ্রাম । বরুণেশ্বর তদগ্রে । বিমলেশ্বর তদগ্রে । মোক্ষেশ্বর তদগ্রে । জ্ঞানদা তদগ্রে । অমৃতেশ্বর তদগ্রে । গন্ধর্বনাগর তদগ্রে ভীমচণ্ডীগ্রাম (অত্র

৭ ক্রোশ পরে দ্বিতীয় দিন শেষ) ভীমচণ্ডী অত্র । চণ্ডবিনায়ক অত্র । রবি-
বক্তব্য অত্র । নরকাকর্ণার তারশিব অত্র । একপাদ গণ কচনারগ্রাম ।
মহাভীম শিবসাগর পুষ্করী । ভৈরব হরসোমগ্রাম । ভৈরবগণ অত্র ।
ভূতনাথ তদগ্রে । সোমনাথ তদগ্রে । সিদ্ধুসাগর তদগ্রে । কামনাথ
কোসাগ্রাম । কপদীশ্বর অত্র । কামেশ্বর অত্র । গণেশ্বর অত্র । বীরভদ্র
চৌধণ্ডীগ্রাম । চতুর্থ অত্র । গণনাথ অত্র । দেহলি বিনায়ক অত্র ।
ষোড়শ বিনায়ক অত্র । উদণ্ডবিনায়ক ভুইনীগ্রাম । উৎকলেশ্বর অত্র ।
কদ্রাবী অত্র । তপোভূমি অত্র । বরণা রামেশ্বরগ্রাম । (বার ক্রোশ
পরে তৃতীয় দিন শেষ) । রামেশ্বর অত্র । সোমনাথ অত্র । ভরতেশ্বর
অত্র । লক্ষ্মণেশ্বর অত্র । শত্রুগ্নেশ্বর অত্র । ছাবাভূমি অত্র । নহশেশ্বর
অত্র । অসংখ্যাত লিঙ্গ বকণাপার । অসংখ্যাত তীর্থ অত্র । শঙ্কেশ্বর
করোথাগ্রাম । পাশপানি সুলবেড়িয়া । পৃথীশ্বর খজুরীগ্রাম । স্বর্গভূমি
অত্র । যুগসরোবর দিওদয়ালপুর । রুষভদ্রজ কপিলধারাগ্রাম । (নয়ক্রোশ
পরে চতুর্থ দিন শেষ) । রুষভদ্রজ অত্র । জ্বালানুসিংহ কটুয়াগ্রাম । বকণা-
সঙ্গম তীর্থ অত্র । সঙ্গমেশ্বর অত্র । আদিকেশব অত্র । ধর্মনিবায়ক
অত্র । প্রহ্লাদেশ্বর প্রহ্লাদঘাট । ত্রিলোচন ত্রিলোচনঘাট । বিষ্ণুমাধব
পঞ্চগঙ্গাঘাট । পঞ্চগঙ্গা অত্র । শতগভস্তীশ্বর অত্র । মঙ্গলা গৌরী ।
বলিষ্ঠ বামদেব শকটীঘাট । পর্কতেশ্বর অত্র । মহেশ্বর জ্ঞানবাণী । সিদ্ধি
বিনায়ক মণিকর্ণিকাঘাট । অত্র ষট্‌পঞ্চাশত্বিনায়ক । মণিকর্ণিকা । বিষ্ণে-
শ্বর । মুক্তিমণ্ডপ । বিষ্ণুবিষ্ণেশ্বর দ্বার ভিতরে বামে । দণ্ডপানি চণ্ডী
নিকট । চণ্ডিরাজ । ভৈরব চবুতার পার্শ্ব । আদিত্য তুলসী দেবী নিকট
পঞ্চগণেশ জ্ঞানবাণীর দ্বার । ইতি কাশীরহস্তে একত্রিংশৎ অধ্যায়ে পঞ্চ-
ক্রোশী যাত্রা ।

কাশী হইতে অযোধ্যা লক্ষ্মী ও নৈমিষাদি দেখিতে ইচ্ছা হইলে অযো-
ধ্যাগামী রেলের আরোহণ করিবে । ২৫ মাইল পরেই রামায়ণের স্মৃতিকা-
নদী । ষাহার তীর হইতে রাম বিদায় লইয়া শৃঙ্গবের পুরে গমন করেন ।
৭ মাইল অন্তরে গোমতীতটে জৌনপুর । এককালে এই স্থান স্বাধীন
পাঠান রাজাদের রাজধানী ছিল । কেলা প্রস্তরময় ও মসজিদ অতি

প্রকাণ্ড। ঘোড়ী ও লিথিজি পাঠান প্রথায় মিশ্রিত নানাদিকে নানা-
 হাফা রহিয়াছে। পুল অতি চমৎকার। প্রায় ৩০০ শত বর্ষ হইল নির্মিত
 হইয়াছে। মধ্যে ১৭৭৬ অব্দের বতায় এমন জলমগ্ন হয় যে ইহার উপর
 দিয়া কার্কার সাহেব সৈন্তসহ পোত লইয়া চলিয়া যান তথাপি এক্ষণ
 পর্য্যন্ত একটা কবরও শিথিল হয় নাই। এখানে আতর, উৎকৃষ্ট ফুলের
 তৈল ও গোলাপ পাউডার আদি প্রস্তুত হয়। জৌনপুরের কিছুদূর
 পরে মালিপুর। মালিপুরের পশ্চিমে গোমতীতটে প্রাচীন কুশপুর বা
 স্থলজানপুর। কথিত আছে যে ইহার ১৮ মাইল পূর্বে ধোপাপুরে রাম
 রাবণ বধান্তে স্নান করিয়া পাপচ্যুত হন। এখনও জ্যৈষ্ঠের শুক্লা-
 দশমীতে মেলা হয়। নিকটে ঘরার কেল্লা ও মুসলমান চূর্ণিত বিস্তর
 হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ১৫ মাইল উত্তরে গোমতীতটে শ্বেতবরাহ-
 পুর। রামনবমীতে ও কার্তিকে মেলা হইয়া থাকে।

মালিপুরের পর অযোধ্যা স্টেশন। আর সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও
 নাই। কেবল সেই প্রাচীন সরযু যুহু যুহু বহিতেছে। সরযু দেখিয়া মন
 আকুল হইয়া উঠিল। আজ কোন্ গোঁরবের কবরক্ষেত্রে আদিয়া দাঁড়ী-
 ইলাম, কোন্ অতীত বিভবের ভবনে উপস্থিত হইলাম। এই না সেই বাজী-
 কির অযোধ্যা ছিল। “যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতৌত্তর
 কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুক্ষ্মমনস্থিরঃ, নমসিদ্ধং জগদিত্যবধারণ।”,
 উত্তর পূর্ব ও পশ্চিমে সরযু প্রবাহিত। উত্তর পূর্বকোণে স্বর্গদ্বারঘাট
 হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তর পশ্চিমকোণে গোপ্রতার ঘাট পর্য্যন্ত প্রাচীন
 অযোধ্যানগরের সীমা। উত্তর দক্ষিণের বিস্তার সরযু অবধি তমসাপর্য্যন্ত
 ছিল, স্টেশন হইতে বাহির হইয়া উত্তর মুখে যাইতে অশ্ল দূরে আইনদিকে
 ভাঙ্গা ইট ও কবরপ্রাথিত ৪৪ হাত উচ্চ মণি পর্বত। ইটগুলি দীর্ঘ ও প্রান্তে
 ১৫ অঙ্কুল, বেধ ৪ অঙ্কুল। নীচে মাটির গাঁধন ও উপর পাকা। চীন যাত্রী-
 দের কথায় বোধ হয় মণিপর্বতের উপরিভাগ অশোক গাঁধিয়া যান। ইহার
 ৫০০ ফিট দক্ষিণে ১৮ হাত উচ্চ ভাঙ্গা ইটের কুলের পর্বত। উপরে জঙ্গল ও
 দুইটা টেঁকুল গাছ। নিকটে গণেশকুণ্ড বা ইমাম তাল। পার্শ্বেই অযোধ্যা
 জয় করিতে হত মিস ও আবুরের কবর। দক্ষিণ পূর্বে ইফকপূর্ণ সু গ্রীষ

পৰ্বত । ইহার উত্তরদিকের খণ্ড ৩০০ ও দক্ষিণদিকের খণ্ড ২০০ ফিট সম-
চতুষ্কোণ । ইংরেজেরা বলেন, এই তিনটি পৰ্বত বা ইন্ডক রাশি ২৪০০
বর্ষেরও অধিক প্রাচীন ! এই তিনটি দেখিয়া ডাইন বা বামে যে পার্শ্বে
যাও উত্তর মুখে গেলেই হনুমানগড় বা রামকট্ । রামকটের পূর্বে মান-
সিংহ মন্দির ও উত্তরে সরযু তটে রামের স্নানঘাট স্বর্গদ্বার । রামকট বা
বর্তমান অযোধ্যায় পূর্ব প্রান্তের রাস্তা ধরিয়া সোজা পশ্চিমমুখে কৈজা-
বাদের দিকে গমন করিলে চক পাওয়া যায় । চকের উত্তরদিকে পশ্চিম
গামী রাস্তা ও পশ্চিমদিকের উত্তর পশ্চিমগামী রাস্তা কলিকাতা কেল্লা
মধ্য দিয়া গোপ্রতার উদ্যানের সমীপবর্তী হইয়াছে । উদ্যান নিম্নে সুবিখ্যাত
গোপ্রতার ঘাট । এই স্থানে রাম প্রজাসহ সরযুতে প্রাণ বিসর্জন করেন ।
মম্বর সময়াবধি মহানন্দের সময়পর্য্যন্ত অযোধ্যায় সূর্য্যবংশীয়েরা রাজ্য
করেন । বুদ্ধ এখানে কিছুকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন । মগধ রাজারা
অনেককে বৌদ্ধ করিয়া অযোধ্যায় অনেক বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন । তাঁহা-
দের নৌরাহ্ম্যে অনেক হিন্দুমন্দির বিনষ্ট ও জঙ্গলাবৃত হয় । পরে বিক্রমা-
দিত্য লক্ষ্মণঘাট হইতে পুরাণ দেখিয়া মাপ আরম্ভ করেন । নাগেশ্বরনাথ
প্রাপ্ত হইয়া তিনি অপরাপর স্থান উদ্ধার করিয়াছিলেন । তাঁহার উদ্যোগে
অযোধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৩৬০ মন্দির নির্মিত হয় । চীনযাত্রী হোয়ানথসং
আসিয়া বিস্তর ত্রাঙ্গণে পূর্ণ ৫০ প্রাচীন হিন্দুমন্দির ও ২০ বৌদ্ধমঠ দেখেন ।
কয়েকজন জৈনতীর্থঙ্কর এখানে জয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এজন্ত তাঁহা-
দেরও মন্দির নির্মিত হয় । পরে মুসলমান সময়ে স্থলতান বাঘর আসিয়া
১৫২৮ অব্দের এপ্রেল মাসে জয়স্থানের মন্দির ভগ্ন করিয়া তথায় মসজিদ
নির্মাণ করিলেন । মসজিদ মধ্যস্থ ৫৬ ছাত লম্বা উৎকৃষ্ট প্রস্তরস্তম্ভ গুলি
প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের অবশেষ মাত্র । অযোধ্যায় সুবাদারেরা প্রথমে কৈজা-
বাদেই থাকিতেন । জয়স্থানাদি বহুকাল মুসলমানদের হস্তে ছিল । ১৮৫৫
অব্দে বলপূর্ব্বক হিন্দুরা হনুমানগড় দখল করে । এবং তিনবার আক্রমণের
পর জয়স্থানের মসজিদ দখল করিয়া লয় । তদবধি হিন্দু ও মুসলমান উভ-
য়ই জয়স্থানে প্রবেশ করিয়াছে । ইংরেজেরা বিবাদ ভঞ্জনার্থে রেল দিয়া
দিয়াছেন । মুসলমানেরা মসজিদে নমাজ ও হিন্দুরা বাহিরে একটি গাঁথা

জয়গায় পূজা করে। স্বর্গদ্বার ও ত্রেতাকা ঠাকুরের মন্দির ভগ্ন করিয়া আরংজেব মসজীদ নির্মাণ করে। ত্রেতাকা ঠাকুরের মন্দির স্থান (যেখানে বজ্র হয়) পঞ্জাবস্থ কাবুর রাজা দখল করেন। এবং খৃঃ ১৭৮৪ অব্দে যশোবন্ত রাও হোলকারের স্ত্রী বিখ্যাত অহল্যা বাই ষাট নির্মাণ ও মন্দির সংস্কার করিয়াছেন। এখনও হোলকারেরা বার্ষিক ২৩১ টাকা দিয়া থাকেন। অযোধ্যার তীর্থের মধ্যে বিষ্ণুহরাদি সপ্তহর, বর্ষহরের সম্মুখে জানকীঘাট, তৎস্থানে রামঘাট বা স্বর্গদ্বারঘাট, তাহার পশ্চাতে রামসভা, তাহার দক্ষিণে দন্তধাবন কুণ্ডাদি রহিয়াছে। জম্মস্থানের পার্শ্বে জানকীর রক্তনস্থান, নিকটে ভরতজম্ম স্থান, বৈকুণ্ঠীর বাটী অপরদিকে হুমিত্রার বাটী ও দক্ষিণ পূর্বে মীতাকুপ। হনুমন্ত কুণ্ডের নিকট সুবর্ণদ্বার, তদক্ষিণে জাতবেদী অগ্নিকুণ্ড, তৎপশ্চিমে ধিয়াকুণ্ড, তাহার পরে গণেশ দশরথ কোশল্যাদি নানাকুণ্ড। নদীতীরে বিষ্ণুহরি নিকটে চক্রতীর্থ বশিষ্ঠ কুণ্ড ও ঋণমোচন ঘাট। গুপ্তহরি ও চক্রহরির নিকট সরযুতটে গোপ্রোতার ঘাট ইত্যাদি।

জৈন তীর্থের মধ্যে আদি তীর্থঙ্কর আদিনাথের জম্মস্থান, মন্দির ভগ্ন করিয়া ১২০০ অব্দে সাক্ষরন যোরা মসজীদ করে। স্বর্গদ্বারের নিকট মৌরী তলাতে এই মন্দির স্থান জুরান টিল্লা নামে খ্যাত। ১৭৮১ অব্দে ইটারা পুষ্করিণীর নিকট দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথের জম্মস্থানের মন্দির করা হয়। সরাই নিকট চতুর্থ তীর্থঙ্কর সোমেশ্বনাথের মন্দির। ভিতরে পরেশনাথের দুই ও নেমনাথের তিন মূর্তি আছে। সরযু বা ঘর্ষরাতে গোলাঘাট নালার নিকট চতুর্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথের পাদযুগল আছে। অল্পদিন হইল আলমগরী মহল্লায় আর এক অজিতনাথের মন্দির হইয়াছে। অযোধ্যায় নির্বাণী, নির্ঝারী, দিগম্বরী, খাকী, মহানির্বাণী, শাস্ত্রকী ও নিরালম্বরী এই পঞ্চ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের মঠ আছে। কোন ২ মঠে ৩০০।৪০০ করিয়া লোক থাকে, বাকী ভারতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। মঠের ব্যয় জম্ম লাখরাজ জমী ও অস্ত্রাস্ত্র বন্দোবস্ত আছে। অযোধ্যার অনতিদূরে নন্দিগ্রাম। সরযুর অপর পারে দশরথ পুজ্যোক্তি বাগ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার পার্শ্ববর্তী স্থান সুগন্ধ কেওড়াবনে আকীর্ণ। এখানকার নামাবলী, জপমালা ও তিসক-হৃতিকা প্রদিক।

অযোধ্যার প্রায় ৫৮ মাইল উত্তরে গোঁওয়ার নিকট রাণীতে যুবনাথের আবাস্তি পুরী। বর্তমান নাম সাহেতমাহেত। বুদ্ধ এখানে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধ নষ্ট করিয়া পুনরায় হিন্দু নগর করেন। এক্ষণে চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ মধ্যে মধ্যে স্তূপ ও পুষ্করিণীর খাত। একদিকে ৩০ মাইল অর্ধচন্দ্রাকার স্তূপটী দুর্গভিত্তির অংশ, ২৫ ফীট উচ্চ স্তূপটী সূদতের ও ৩৫ ফীটটী অঙ্গুলি মাল্যের ও পুষ্করিণী তিনটী বৌদ্ধনিদান-কারীদিগের বিনাস স্থান হওয়া অসম্ভব নহে। আবাস্তি নিকটে ভারতবর্ষীয় বিখ্যাত আট বিহারের মধ্যে এক বিহার ছিল। এখনও বর্ষার লোক তীর্থ করিতে আসে।

লক্ষ্ণৌ। অযোধ্যা ফৌসন পার হইয়া বিখ্যাত স্থান লক্ষ্ণৌ। নদীতীর হইতে লক্ষ্ণৌ দেখিতে অতি সুন্দর। গোমতীর বিমল সলিলোপরি লক্ষ্ণৌ নগর বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ঋতবর্ণ সৌধমালায় নদীতীর বিকশিত। তহুপরি জাঙ্ঘলামান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গম্বুজ শোভা। থাকে থাকে আকাশভেদী মিনার শ্রেণী, স্থানে স্থানে নিকুঞ্জবনের নিবিড়পত্রের অন্তরাল। দেখিলে বোধ হয় যেন কি অপরূপ রূপ দেখিতেছি। সায়ংকালের সৌন্দর্য্য বড় মনোহর। দিল্লীর পর এই নগর প্রধান হইয়াছিল, ইহারও এখন আর সে ঐশ্বর্য্য নাই, শোভা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। গোমতীর প্রান্তর সেতু ১৭৮০ অব্দে উদ্ভোলা নির্মাণ করেন। গাজীউদ্দীন লোহ সেতুর উদ্যোগ করিয়া যান। তাহার মৃত্যুর ৩০ বর্ষ পরে এই সেতু নির্মিত হয়। নগর প্রবেশ করিয়া দেলখোস বাটীর দিকে যাত্রা করিলাম। সদতআলি কৃত্রিম অরণ্য প্রস্তুত করিয়া এই স্থান পরিপূর্ণ করেন। ইহাতে তিনি কামিনী সহ বনবিহার বা মৃগয়া করিতেন। বিজ্রোহ সময়ে কাম্পবেল্ এই স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর মার্টিনিয়ার বা কনফোর্টিয়া গৃহ। ৭৫ বর্ষ পূর্বে মার্টিনিয়ার নামক একজন ফরাশি সেনাপতি আমক উদ্ভোলার জন্ত এই প্রাসাদ আরম্ভ করেন। ইহার মধ্যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট গৃহ আছে। মার্টিনিয়ার এক অদ্ভুত রকমের লোক ছিলেন। সকল দেশীয় সকল প্রকার গৃহের অঙ্কন করিয়া তিনি ইহার এক এক অংশ নির্মাণ করেন। কোথাও বা প্রকাণ্ড সিংহের প্রতিমূর্তি, কোথাও বা চীনদেশীয় সম্রাটের আকার,

কোথাও বা মস্তক নাড়িয়া বেড়ায় এমন সকল স্রীলোকের অবয়ব ও কোথাও বা নানাদেশীয় নানা দেব দেবীর প্রতিকৃতি । সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ও তৎপাশ্বে একটা স্তম্ভ । প্রাসাদ সমাপ্ত হইবার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয় । কিন্তু পাছে নবাব দখল করেন এজন্য তথায় আপনার কবর মণ্ডপ ও এক স্থল স্থাপন করিয়া যান । ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহীরা মার্টিনের দেহ দ্বারে নিক্ষেপ করিয়া অনেকাংশ বিনষ্ট করিয়াছে ।

তদনন্তর সেকেন্দরবাগ । নবাব ওয়াজাদ আলি সেকেন্দর মহল নামক তাহার এক পত্নীর জন্ম এই উদ্যান প্রাপ্ত করেন । স্থানটী প্রত্যেক দিকে ২৪০ হাত । চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রবেশের একটী প্রকাণ্ড দরজা । বিদ্রোহ কালে দুই সহস্র সিপাহী এখান হইতে ইংরেজদের উপর ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিল । ইংরেজেরা বহুকষ্টে উদ্যান অধিকৃত করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করেন । তদনন্তর নজীব অসরক বা সনজক । ইহা অযোধ্যার প্রথম স্ববাদার গাজীউদ্দীন হাইদরের কবর । এই কবর আরবদেশস্থ নজক পর্বতস্থিত মহম্মদ জামাতার কবরের অনুল-করণ বলিয়া ইহার নাম নজক হইয়াছে । গাজীউদ্দীন ইহার সংস্কার জন্ম বল্লোবস্ত করিয়া গিয়াছেন । এখানে অযোধ্যার নবাব ও তাহাদের বেগম-গণের প্রতিমূর্তি চিত্রিত আছে । লঙ্কো অধিকার কালে কমাগুরুনচীক এই স্থানে বার বার বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অবশেষে পিল সাহেবের কামান দ্বারা দুই ঘণ্টা কাল গোলাবৃষ্টির পর বিভিন্ন হইলে ইংরেজেরা নগর প্রবেশ করিলেন । বামে কমিশনার উইং ফিল্ড সাহেবের উদ্যান । বৃক্ষ-গুলি উৎকৃষ্টরূপে জীবীবদ্ধ, মধ্যে নানাজাতীয় হরিণ চরিতেছে । অনতি-দূরে গির্জা । বেগম কুঠী আক্রমণ কালে এই স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মেজর হডসন প্রাণত্যাগ করেন ।

অনন্তর অশোভিত হজরথগঞ্জের পথ পার হইয়া কায়সরবাগ । কায়সর অযোধ্যার স্ববাদারদিগের গর্বসূচক উপাধিযাজ । ইহাদিগের মোহরেও ঐ নাম আছে । পদচ্যুত রাজা ওয়াজাদ আলি ১৮৪৮ অব্দে আরম্ভ করিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই উদ্যান সমাপন করেন । ইহাতে আসবাব সহ ৮০ লক্ষটাকা ব্যয় হইয়াছে । উত্তর পূর্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে তাহা-

বালি কুঠীর সম্মুখে এক অনারত স্থান । ইহারই ডাইনদিকের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বন্দীগণ কারাগারে নীত হইত । দ্বারের সম্মুখে জিলেখানা নামক স্থানে নবাব বাহির হইবার পূর্বে শাস্ত্রীগণ সজ্জিত হইত । তাহার ডাইনদিকে চীনবাসনে সজ্জিত চীনাবাগ ছিল, তাহার পর অর্দ্ধমহুযাকার মৎস্ত-মূর্ত্তি শোভিত গেট পার হইয়া হজরতবাগ । ডাইনদিকে চণ্ডীবাণী বার-দ্বারী । এই স্থান রোপাঘারা সজ্জিত থাকিত । এই স্থানেই খাসমহল ও বাদসাহেদ মনজল । ওয়াজাদআলি সদতআলি নির্মিত পূর্বোক্ত বাদসাহী মন্দির আপন রাজবাটীর অন্তর্ভুক্ত করেন । হরিত অর্দ্ধমৎস্তাকার মহুযা শোভিত গেটে আলিলখী খাঁ মন্ত্রী বাস করিতেন । বামদিকে রাজনাপিত আজীমউল খাঁ নির্মিত চৌলকলহায়র নামক গৃহপুঞ্জ । বাদসাহ বেগমদের আবাসের জন্ত চারিলক্ষ টাকায় এই স্থান খরিদ করেন । ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহী বেগম এই স্থানে বাস করিতেন এবং এইস্থানে ব্রিটিশ বন্দীগণ আবদ্ধ ছিল । কিছুদূর গমন করিলে মার্বেল-মণ্ডিত রক্ততল । মেলার দিন ওয়াজাদআলি সা ফকীরের পীতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এই স্থানে বসিতেন । কিছু দূর পরে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত লাখী দরওয়াজা । লাখী দরওয়াজা পার হইয়া কায়সরবাগের বিস্তীর্ণ সমচতুষ্কোণ মণ্ডল । এই স্থানে আগষ্ট মাসে মেলা হইত, এবং এই মসজিদের পার্শ্বস্থ হুফা সমূহে বহুতর বেগম বাস করিত । লাখী দরওয়াজার অনতিদূর বামদিকে চাকচিক্যশালী অর্দ্ধচন্দ্রাকার কায়হর পছন্দ । নাসীরউদ্দীন হায়দরের মন্ত্রী রহুমউদ্দৌলা ইহা নির্মাণ করেন । ওয়াজাদআলি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া প্রিয়তমা মহল মাস্কুল সুলতানাকে দেন । ইহারই নিম্নে ধোরেরার রাজার প্রেরিত ব্রিটিশ বন্দীগণ বধের জন্ত রক্ষিত ছিল । ডাইনদিকে আর একটা জিলেখানা । এই জিলেখানা পূর্বদিকের জিলেখানার জবাব মাত্র । এই দরজা দিয়া আমরা কায়সরবাগের বাহির হইলাম । নিকটে সের দরজা বা নীল-দরজা । এখানে সেনাপতি নীল কায়সরবাগের দরজা হইতে কিন্তু গোলাব আখাতে প্রাণত্যাগ করেন । কায়সরবাগের বিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ মণ্ডল ও চিনিবাজারের মধ্যে সদৎআলি বা জিনৎ আরমাণ ও তাঁহার

বেগম মুরশিদজাদীর কবর। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গাজীউদ্দীন হাইদর এই কবর নির্মাণ করেন। কায়মাবাদের সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে তারাগালী কুঠী বা ম্যানন্দির। ইংরেজেরা এখানে এখন ব্যাক করিয়াছেন। ইহারই সম্মুখে ধোয়েরা ও মির্খোলি রাজ্য প্রেরিত ব্রিটিশ বন্দীগণকে হত্যা করা হয়। এখন ইংরেজেরা স্মরণচিহ্ন নির্মাণ করিয়াছেন। নদীতীরে নসিরউদ্দীন হাইদরের বাসস্থান করহদবস্ত্র ও তাহার পত্নীগণের বাসস্থান ছত্রমনজিল। গির্টি করা ছত্র শোভিত ছিল বলিয়া ছত্রমনজিল নাম হইয়াছে। ইংরেজেরা এক্ষণে পুস্তকাগার করিয়াছেন। করহদবস্ত্র অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ গৃহ সদতআলির সময়াবধি ওয়াজাদ আলির সময়পর্যন্ত রাজবাটী ছিল। ইহার নদীতীরস্থ অংশ জেনেরেল মার্টিন সাহেব প্রস্তুত করিয়া অবোধাপতিকে বিক্রয় করেন। অবশিষ্টাংশ সদত আলি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যস্থ দরবারগৃহের নাম কহকুল-মুলতান বা লালবারঘারী। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টে পোষ্টআফিস করিয়াছেন। ইংরেজ রেসিডেন্ট এই স্থানে বাদসাহদিগকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নজর প্রদান করিতেন। এই জন্ত বাদসাহা বেগম ও মুন্সাজান বেগম এখানকার সিংহাসনে বসিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং বিজ্রোহী সিপাহীরাও মুন্সাজান বেগমের সাপেক্ষে রেসিডেন্ট কর্ণেল লো সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিল। করহদবস্ত্রের নদীতীরস্থ অংশে স্বর্ণবর্ণে জাঙ্গলা-মান গম্বুজ শোভিত তিনটী অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উৎকৃষ্ট হুয়া আছে। অপর পার্শ্বে চতুর্দিকে সৌধমালা শোভিত প্রশস্ত প্রাচীন পরম্পরা, মৎস্তাদি পূরিত সরোবর নিচয়, প্রাচীন গ্রীক বীরগণের মার্বেলমূর্তি ও উজ্জানের মনোহর শোভা। দরবার হুয়া পঞ্চতলবিশিষ্ট। সর্ব নিম্নে দরবারগৃহ। তাহার নিকটস্থ ভাগ অশ্বশালা, কৃতাশালা, পত্নীশালা, ও অপরাপর গৃহ লইয়া বহুদূর পর্যন্ত আরুত। করহদবস্ত্রের ছাদের উপর, ইহাতে সুদৃশ্য লক্ষ্মীনাগের, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার পর ইংরেজদিগের রেসিডেন্স। সদত আলির সময়ে ত্রিতল বিশিষ্ট এই কুঠী নির্মিত হয়। এখানে বিজ্রোহকালে ৫ মাস কাল কয়েকজন ইংরেজ আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত গৃহই গুলি গোলায় দাগ,

বিপৎকালে কয়েকজন ইংরেজের উপর যে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়ে এখন তাহা সেই রূপই আছে। হর্ম্যের উত্তর পূর্বগৃহে হেনরি লরেন্স যুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। নিকটে সেই গৃহ যেখানে ব্রিটিশ মহিলা বালক ও সীড়িতগণ প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পার্শ্বস্থ গির্জা চূর্ণিত প্রায়। নিকটের মসজিদ ও দেশীয়দের গৃহ সকল ইংরেজেরা ভূমিসাৎ করিয়াছেন। এখন সকলই তদবস্থায় পতিত। কেবল কবরভূমির পারিপার্শ্ব্য হইয়াছে। এই সকল কবর মধ্যে লরেন্স নীল ও ব্যাকআদি বীরগণ নিহিত আছেন। রেনসিডেলির অনতিদূরে মুখ্য ভবন বা কেল্লা। ২০০ বর্ষ পূর্বে ইহা এক প্রধান কেল্লা ছিল। বিজ্রোহকালে ইংরেজেরা সংস্কারের ইচ্ছা করেন। কিন্তু সৈন্য অল্প থাকাতে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর আমরা এমামবারা গমন করিলাম। প্রথমে একটা প্রকাণ্ড দরজা। পরে একটা প্রশস্ত স্থান। তাহার পরেই বিখ্যাত রোমী দরওয়াজা, এত উচ্চ, এত বিস্তৃত, এরূপ সম্বৃদ্ধিত, ও এত শোভাশালী যে পৃথিবীতে এরূপ দরজা আর নাই। রোমী দরওয়াজা পার হইয়া অপেক্ষাকৃত আর একটা প্রশস্ত স্থান। চারিদিকেই মসীদ বামে এমামবারার শোভা। লক্ষ্যেই এমামবারা দুই; প্রাঙ্গণে বিস্তৃত। একটা হইতে একটা বিস্তীর্ণ সিঁড়ি দিয়া অপরটীতে উঠিতে হয়। উভয়েরই প্রবেশদ্বার বিশাল ও বিস্তৃত। গৃহটী ১১৪৫০ হাত লম্বা ও ৩৫ হাত বিস্তৃত। প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৫০ হাত বিস্তৃত এক এক কুঠারী। ইহাতেই আসক উর্দোলা নিহিত আছেন। হর্ম্যাণী অতি শোভাশালী ও ভিত্তিমূল অতি গভীর। আসক উর্দোলা ইহাকে ভারতের সকল হর্ম্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিতে বহু টাকা ব্যয় করেন। কৈকটউল্লার আদর্শ মনোমীত করিয়া তাহাকে নির্মাণ করিতে আদেশ করা হয়। কিন্তু যেরূপ অর্থ ব্যয় হইয়াছে সেরূপ হয় নাই। অভ্যস্তরে যাহা কিছু শোভা ছিল লক্ষ্যে গ্রহণ কালে ব্রিটিশ সৈন্তেরা বিনষ্ট করিয়াছে। এখন গবর্ণমেন্ট অন্বেষণ করিয়াছেন। প্রাঙ্গণ পার্শ্বের মসীদ তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। লক্ষ্যে এমামবারার নিকটে দ্বিতীয় তাজের দ্বার শোভিত ও বিনির্মিত হোসেনাবাদ এমামবারা। বিসপ্ হিবর ইহার অবয়ব দৃষ্টে মোহিত হইয়াছিলেন। অশো-

ধার তৃতীয় নবার মহম্মদআলি ইহা নির্মাণ করেন। এখন ইহার মলিনাবস্থা। পার্শ্বের উজ্জান শোভাকর বটে। কিন্তু তাহার অপকৃষ্ট অঙ্কুরণ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র গৃহে আচ্ছন্ন। মহরমের রাত্রিতে আলোকিত হইলে হোসেনাবাদের মসজিদ ও হর্যাশ্রয়ী অতি শোভাশালী হইত। অগ্রে দূরে পথের পার্শ্বে মহম্মদআলির সরোবরতীরে তাঁহার অর্ধনির্মিত মসজিদ। জমামসজিদ হইতে উৎকৃষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কার্যারম্ভ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। নগর দর্শনার্থ তিনি সপ্ততল বিশিষ্ট সাতখণ্ড নামক স্তম্ভ নির্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু চারিতলের পর আর হয় নাই। তদনন্তর মুসাবাগ। একটী উজ্জান ও তদ্ব্যধ্যে হর্যা। সমগ্র আলি এখানে বন্যপশুর লড়াই দেখিতেন। মুসা পদবীধারী ফরাশি নির্মাণ করেন বলিয়া মুসাবাগ নাম, ইন্দুরের কবর জন্য নহে। ইহার পর সুদৃশ্য ক্যানিং কলেজ। তৎপরে আসফউদ্দৌলা নির্মিত চক। চকের দরজা দুইটা আকবরের সমকালিক বলিয়া লোকে আকবরী বলে। পূর্বা-পেক্ষা এখন লক্ষৌ নগরের ভগ্নাবস্থা। দেখিতে লক্ষৌ নগরের সকল লোকই নবাবের মত। মুসলমান পুরিত লক্ষৌ নগরে মুসলমানের প্রয়ো-জনীয় সমস্ত বিলাস ত্রব্য পাওয়া যায়। এখানকার মাটির জিমিস, ছিট, কালাবুতুর কাজ, সুইকার কাজ, রোপা ত্রব্য ও পিতলের বিদরী কার্য উৎকৃষ্ট। লক্ষৌ নগরের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল দূরে গোমতীর বামতটে বিখ্যাত নৈমিষারণ্য। বর্তমান নাম নিমখার। আর সে ঋষি নাই, সে বন নাই। আর হুতের স্রব কর্ণগোচর হয় না, আর বজ্রীয় ধূম গগনমণ্ডল শোভিত করে না। যে গোমতীতীর রণমস্ত বীরদিগের সদর্প ধনি প্রতিধ্বনিত করিত, আজ তাহাই দাসদিগের ক্রন্দনধনি প্রতিধ্বনিত করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া যেন থণ্ড থণ্ড হইয়া পতিত হইতেছে। যে জলে জয়োন্মত্ত বীরগণ কথিরাক্ত হস্ত ধৌত করিয়াছিলেন, সেই জল পাদ সেবাকারী দাসদিগের ধূলি ধুসরিত হস্তে কলুষিত হইবার ভয়ে যেন অদৃশ্য হইতেছে। যেখানে একজনের কোশলে শত শত দানবদল নিমেষ মধ্যে নিহত হইয়াছিল, সেই ভূমিতে শত শত আর্ঘ্য বসিয়া সাতশত বর্ষ দুঃখ ভোগ করিল দেখিয়া কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? যেখানে শৌনক বসি সহস্র ঋষিকে শতবর্ষ ভোজন করাই-

রাছেন, আজ সেখানে অয়ের জন্ত আঁধোরা লাগানিত। পূর্ব গৌরবের কিছুই নাই, কেবল সেই চক্রতীর্থ বর্তমান আছে। এই স্থানে বিষ্ণুর চক্রনৈমি শীর্ণ হইরাছিল। চক্রতীর্থ একটি ষট্‌কোণ সরোবর। চারিদিকে মন্দির। সরোবরের বিস্তার ৮০ হাত। কুণ্ড হইতে জল উঠিয়া দক্ষিণদিকের চৌদ্দ হাত প্রশস্ত গোদাবরী নাল দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। উত্তরে ১১০ ফীট লম্বা ৪০০ ফীট বিস্তৃত ও ৫০০ ফীট উচ্চ এক কেল্লা।

লক্ষ্মী নগরে দুই রেল সন্মিলিত। বামের রেল কাণপুরে গিয়া কলিকাতা হইতে দিল্লীগামী রেল স্পর্শ করিয়াছে। ইচ্ছা হইলে ডাইন দিকের রেলে নৈমিষের ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে পাঞ্চাল বা রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিবে। লক্ষ্মী হইতে হরহরি পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে অবতরণ কর নিকটে কলিগঙ্গা সঙ্গম। কিন্তু কাণপুর হইতে ফরেকাবাদগামী রেলের এই স্থান আরও নিকট হয়। এই সঙ্গমেই প্রাচীন পাঞ্চাল মহোদয় গাধিপুত্র কান্ধকুজ বা কনৌজ নগর অবস্থিত। এখন গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহে কালী প্রবাহিত হইতেছে। বর্তমান কনৌজ সামান্য পল্লী মাত্র। গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে রংমহল ও জয়চন্দ্রের ভগ্নপুরী। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ভিত্তি ১৬০ হস্ত দীর্ঘ ৩ হস্ত বিস্তৃত ও ২৬ হস্ত উচ্চ। উপরে ৪০ হাত অন্তরে চারিটা স্তম্ভ। তাহার ৬০ হাত পরে আর এক ভিত্তি। ৬ হস্ত পরে আর একটা এবং ১৪ হাত পরে চতুর্থ ভিত্তি আছে। দুর্গের ঠিক মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড হিন্দু মন্দির ছিল। জৌনপুরের ইব্রাহিম সাহা ১৪০৬ অব্দে তাহাকে নষ্ট করিয়া জমা মসজিদ করিয়াছেন। উহার অভ্যন্তর ৭২ হাত লম্বা ১৮ হাত প্রশস্ত ও চারি খাক স্তম্ভে সজ্জিত। ভিত্তিগাজে অনেক দেব দেবীর মূর্তি ছিল, এখন চূণকামে আবৃত হইয়াছে। দুর্গের দক্ষিণ পূর্বে ১৪৭৬ অব্দে নির্মিত মখদুম জহানীরাও একটি হিন্দু মন্দির ছিল। এখনও ষট্‌গার শৃঙ্খল ঝুনিতেছে। কনৌজের দুর্গ ত্রিকোণাকার ছিল। স্থানে স্থানে উহার ভিত্তি ৪৬ হস্ত উচ্চ রহিয়াছে। দুর্গের অনতিদূরে সিংহ ভবানী গ্রামে ৪ হাত উচ্চ এক বুদ্ধমূর্তি ১৮০ হাত উচ্চ বজ্রবারাহী মহিষমর্দিনী ও শিবদুর্গার মূর্তি উঠিয়াছে। মকরন্দ নগরের দক্ষিণ পূর্বে স্বর্ষ্য কুণ্ড। এখন শুক ও আলুক্ষেত্রে পরিণত। ভাদ্রমাসে মেলা

হইয়া থাকে । গ্রামের দক্ষিণে বৌদ্ধদিগের ভগ্নবিহার । উত্তরে রাজঘাটের নিকট হাজিহরমারন হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে মিরন কানর পর্য্যন্ত কান্তকূজ নগরের চিহ্ন পাওয়া যায় । যে দিকে চাও কেবল ভগ্নাবশেষ ও কবর-ক্ষেত্র । যে নগরের আভির্ভাষা বর্ণন করিতে বিখ্যাত মুঘল হইয়াছিলেন, যে নগর হর্ববর্দ্ধনের কালে ভারতকে কণ্ঠাঘাত করিয়াছিল, বাহার আশ্রয়ে বৌদ্ধ বিদলিত ব্রাহ্মণগণ বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, যেখানে এক কালে ত্রিশহাজার পানের দোকান ছিল এবং বাহা পৃথিবীর মধ্যে অধিতীয় নগর বলিয়া খ্যাত ছিল, আজ তার এই দশা ।

কান্তকূজের উত্তর ও কয়েকাবাদের কিছু দূরে কালীনদীতটে প্রাচীন সাতকাঞ্চা নগরী । বাস্তবিকর সে বর্ণনার আর কিছুই নাই । কেবল এক উচ্চ ভগ্ন ভূমির উপর কয়েকখান গৃহ ও পার্শ্বে আর কতকগুলি ভগ্নস্তূপ । কেন্দ্রার চিহ্ন ৩০ মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় । দক্ষিণ পশ্চিমে আধ মাইল দূরে রাজঘাট হইতে কাকরা বাট পর্য্যন্ত কালীনদী প্রবাহিত হইতেছে । পল্লীর দক্ষিণ স্তূপে বিশারীর মন্দির । তাহার ৪০০ ফীট উত্তরে অশোকের ৩৫ হাত উচ্চ শুণ্ডহীন হস্তীস্তম্ভ, দক্ষিণ পূর্বে প্রাচীন নাগকুণ্ডের অবশেষ কাকরা ভালাও । কিন্তু যেখানে বৌদ্ধ ত্রয়ত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র-সহস্রাণিময় সোপানে অবতরণ করিয়াছিলেন, যেখানে অশোক তাঁহার প্রকাণ্ড মূর্তি স্থাপন করিয়াছিল, যেখানে পূর্বে চারি বৌদ্ধ বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, যেখানে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার স্তূপ ছিল, যেখানে পুণ্ডরীক বর্ষা বৌদ্ধকে সর্শব করিয়াছিলেন, সে সকল স্থান স্থির করা বড় কঠিন । ১৩০০ বর্ষ পূর্বে এখানে বিস্তর ব্রাহ্মণের বাস ছিল । আর ১৮০০ বর্ষ হইল এই নগরের আভির্ভাষা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় । চীনবাত্রী ছোয়ানখসঙ্গের সময়েও দশ হিন্দুমন্দির ও লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস ছিল ।

এগুলি দেখিতে ইচ্ছা না হইলে হর্যাপুরি হইতে মাজেহানপুরে অগ্রসর হইবে । মাজেহানপুরের পর মুসলমানপুত্রিত বয়েলী । জুরা ও শকরা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত । এখানকার দোস্ততী ও কাঠের জিনিষ উৎকৃষ্ট । ৩০ মাইল দৈর্ঘ্যমার্গে গরাজাট প্রাচীন পিলিভিত নগর ।

বয়েলীর ১৭ মাইল ধরে এওনলা ফেমন । এওনলার ৭ মাইল উত্তরে

প্রাচীন অহিচ্ছত্র নগর। অজ্জুন সহ স্রোণ রূপদকে পরাভূত করিয়া এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। বাইতে পাথে মাঝে মাঝে গাঙ্গননদীর খাত। দূর হটেতে এক শিবমন্দির নেত্র গোচর হয়। নিকটে গিয়া ভূর্গ দেখিলে বোধ হয় যে অজ্জুন বিশ্বার্থই একজন ভয়ঙ্কর বীর ছিলেন। চীনবাত্রী হোয়ান-থসং ও ইংরেজেরা ইহার দুরাক্রম্যতার ভয়ানক প্রশংসা করিয়াছেন। রথ লইয়া নিকটবর্তী হওয়া অত্যন্ত কঠিন। উত্তর পশ্চিমে প্রবেশের একমাত্র পথ আছে। ভূর্গটী বিশ্বমাকার সমকোণি ত্রিভুজ। একদিকে বালুকাপূর্ণ রামগঙ্গা ও অপরদিকে গভীর খাতযুক্ত গাঙ্গননদী, উভয়ই পার হওয়া সুদুষ্কর। উত্তর পূর্বে খাল জল ভাঙ্গাল ও গহ্বরযুক্ত ভয়ঙ্কর শিরিয়া নালা। প্রাচীর কটকা-রুত, তাহার উপর অন্যান্য ৩৫টা স্তম্ভ উচ্ছ্রিত হইয়াছে। কোনটা ২০ কোনটা ২৪ ও কোনটা বা ৩২ হস্ত উচ্চ। আলি মহম্মদ খাঁ এই ভূর্গ দৃঢ় দেখিয়া সংস্কার আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্যয় দেখিয়া ছাড়িয়া দেন। শুনা যায় তাঁহার এক কোটি টাকা ব্যয় হইয়া কিছু হয় নাই। ইহার বিস্তার প্রায় ৩০ মাইল। লোকে ইহাকে পাণ্ডু ভূর্গ বলিয়া থাকে। ভূর্গ মধ্যে তিনটা স্তূপ। উত্তর ভিত্তিরদিকে ৪০ হাত উচ্চ একা বেদী। তদুপরি ভগ্নগৃহ মধ্যে ৭ হাত স্তূপ ও ৫ হাত উচ্চ মহাদেবের তয়লিঙ্গ। এই গৃহের প্রাচীর উত্তর দক্ষিণে ৬ হাত পুরু এবং পূর্বে পশ্চিমে বারান্দা সহ ৯০ হাত ও ১২০ হাতস্থল। মন্দিরের অভ্যন্তর দীর্ঘ ও প্রস্থে ১০ ও ৭ হাত এবং বহির্ভাগ ৩২ ও ২০ হাত। ইংরেজেরা ইহার বিকটাকার ভয়াবশেষ দেখিয়া হির করিয়াছেন যে ৪০ হাত উচ্চ বেদীর উপর এই মন্দির ৬৬ হাত অপেক্ষাও অধিক উচ্চ ছিল। ভূর্গ প্রাচীর অপেক্ষা বেদী ২০ হস্ত উন্নত। এতদ্ব্যতীত বাইতে শিবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। চীন বাত্রী কাহিয়ান বলিয়াছেন অহিচ্ছত্রে অনেক প্রকাণ্ড শিবমন্দির আছে। কেহ কেহ বলে যোর শিবভক্ত অশ্বখামা এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমে ২৪ হস্ত এবং কিছুদূরে ২০ হস্ত উন্নত দুই প্রকাণ্ড শিবালয়ের ভয়াবশেষ। ভূর্গ বাহিরে পশ্চিমদিকে ২০০ হস্ত সমতলক্ষেত্র ও ২০ হস্ত উন্নত আর এক ভগ্ন স্তূপ। ইংরেজেরা খনন করিয়া চতুর্ভুজ ত্রিনেত্র পদ্মহস্ত একমূর্ত্তি ও লাল প্রস্তরের শঙ্খ ও বজ্রধারী আর এক মূর্ত্তি বাহির করিয়াছেন। নিম্নে সমস্তই ভগ্ন। বোধ হয় মুসলমানেরা দগ্ধ করিয়াছিল।

দুর্গের উত্তর পশ্চিমে কতকগুলি স্তূপ, তাহার দুই মাইল দূরে ১২৫ বিঘা বিস্তীর্ণ গঙ্গানাগর সন্মোহন। আর আধ পোয়া দূরে ১৫০ বিঘা বিস্তীর্ণ অহিছত্রের আদি রাজার সন্মোহন। হর ও কাটারিঘের নামক স্তূপ বোধ হয় বৌদ্ধ কীর্তির অবশেষ। একটীর মধ্য হইতে কোটার অভ্যন্তরে মুক্তা নীল কাচ অম্বরমালা ও ১০ টী চাষড়ির বর্ণের জপমালা পাওয়া গিয়াছে। কাটারিঘেরের মধ্য হইতে ইংরেজেরা এক তাজা বুদ্ধ মূর্তি উৎখাত করিয়াছেন। অহিছত্রের ৩ কোশ দক্ষিণে দিলাবাড়ী নামক স্থানে সমচতুষ্কোণ স্তম্ভে গুপ্তরাজাদের বিবরণ লিখিত আছে। দুর্গের ২১০ মাইল উত্তরে গুলারিয়া গ্রামে আর এক প্রকাণ্ড ভীম লিঙ্গ আছে।

অহিছত্রের দক্ষিণ বদাউন ও কেরেকাবাদের মধ্যে গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ তটে মহাভারতের কম্পিলানগর। ঋপদ দ্রোণকর্তৃক তড়িত হইয়া কম্পিলানগর দক্ষিণ পক্ষালের রাজধানী করেন। এখন কম্পিলোর ভগ্নাবস্থা হিমালয় হইতে চম্বলপর্যন্ত পাকাল বিস্তৃত ছিল।

অহিছত্রের আর ২৩ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ তটে শরণ বা শূরকেন্দ্র। ভগবান এই স্থলে বরাহ অবতার হইয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। এজন্য ইহার নাম শূরকেন্দ্র। মহাভারতেরমতে এখানে গঙ্গাস্থানে মহাপুণ্য হয়। দুইশতবর্ষ হইল গঙ্গা এ স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন বেণ বা সোমদত্তের কেল্লার মধ্যে সীতারামজীর মন্দির। এবং পল্লীর উত্তর পশ্চিমে বরাহজীর মূর্তি। মার্গশীর্ষের শুক্ল একাদশীতে মেলা হইয়া থাকে। সীতারামজীর মন্দির মুসলমানেরা ভগ্ন করে। ১৮ বর্ষ হইল সেই ভগ্ন গৃহের সংস্কার করিয়া একজন বণিক বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়াছে। এখন গর্ত-গৃহ ১৮ ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ ও ১৬ টী প্রস্তর স্তম্ভ সংরক্ষিত। পূর্বের ৩২ স্তম্ভ ও প্রকাণ্ড আরতনের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। ভগ্নভিত্তি গায়ে বাত্মীদের নাম লিখিত আছে। একটা সম্বৎ ১২২৬ বা ইংরেজি ১১৬৯ অব্দে লিখিত। ১৫১১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ৩৮ বাত্মীর নাম আছে। ১২৪১ অবধি ১২৯০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত যোদ্ধীদের সময় ১৫ নাম। কিন্তু খিলজি ও তোগলকদের দিল্লীতে রাজ্যকালে কেবল ১৩৭৫ অব্দে ফেরোজের সময় এক নাম আছে। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। তুরস্কী আলাউদ্দীন ও উম্মাদ তোগলকের সময় তীর্থ

বাঘাত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, তাহার পর সৈয়দদের রাজ্যকালে মোট ৩ নাম । তদনন্তর বিলোলিলদীর রাজ্যকালে ১০ নাম । তাহার পর ষোর হিন্দুদেবী সেকেন্দর লোদীর রাজ্যে ১৫১১ অব্দের পর আর নাম নাই । বোধ হয় এই দুরাশ্বাই মন্দির নষ্ট করিয়াছিল । তাহা না হইলে প্রাশংসনীয় আকবর, অমনোযোগী জেহাদির ও প্রজারঞ্জক সাজেহানের সময় নাম নাই কেন ?

এওনলা ফেসন হইতে চণ্ডেসি জংসন । বামের রেল দিয়া আলিগড়ে দিল্লীগামী রেল স্পর্শ করা যায় । পথে মহম্মদপুরে গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ হইবে । এখান হইতে নৌকাযোগেও শূকর কৈতাদিতে যাওয়া যায় । ডাই-নের রেল মুরদাবাদে শেষ হইয়াছে । মুরদাবাদ নগর পাহাড়ের উপর সংস্থাপিত, পাহাড়টী ঈশানকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত ও ২০ হস্ত উচ্চ । জেলার উত্তর পূর্ব ভাগ পর্বতময় । উত্তর পশ্চিমে হিমবানের তড়াইকোড় অশ্বাস্থ্যকর ও জঙ্গলাকীর্ণ । এখানকার তুলু, গোমুখ, আকুর, গিণ্টির করণী আদি পিত্তলের উপর শিয়াকলমকারি কার্যাদি উৎকৃষ্ট ।

মুরদাবাদ হইতে নৈনিতালের এক পথ আছে । ডুলীতে কালাডুলী পর্যন্ত ৪৯ মাইল । পরে পর্বতোপরি ষোড়া, ঝাপান বা ডাণ্ডীতে ১৬ মাইল যাইতে হয় । নৈনিতাল বা নৈনি সরোবর অতি গভীর ও স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ । স্থান স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় বলিয়া ইংরেজেরা বাস করেন ।

নৈনিতালের কিছু দূর পশ্চিমে গোভিষণ, ত্রোণ সাগর, উজেন বা বর্তমান কানীপুর । কথিত আছে যে ত্রোণ সাগর ও উজেন কেলা পাণ্ডবেরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ত্রোণ সাগর অতি দিকে ৪০০ হাত । লোকে তীর্থ করিতে যায় এবং চৈত্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে মেলা হইয়া থাকে । উজেন কেলা মাঠ হইতে ১৩ হাত উচ্চ । কোন কোন স্থানে হয় হাত উচ্চ প্রাচীর আছে । প্রাচীরের এক এক থানা ইট ২০ অঙ্গুল লম্বা ও ১৩ অঙ্গুল চৌড়া । দুর্গের মধ্যভাগ বিঘম, প্রায় চারিদিকে পরিখা ও সর্বত্র জঙ্গলারত । দুর্গ মধ্যে উত্তরে ৩৪ হাত উন্নত, ৪৮ হাত লম্বা, ৪২ হাত প্রস্থ ও ৩ হাত পুরু ভিত্তি বিশিষ্ট ভীমগজ নামক এক প্রকাণ্ড তত্ত্ব স্তূপ । ঈশান কোণে ৪০০ হাত লম্বা ও ৩৩৩ হাত প্রস্থ বেদীর উপর ২২ হাত উন্নত আর এক স্তূপ । দক্ষিণে ১৪ হাত বেদীতে ১৩ হস্ত প্রশস্ত আর এক মন্দিরের অব-

শেষ । নানা স্থানে নানা চিহ্ন । চীনবাত্রী কাছিয়ান এই সকল প্রকাণ্ড হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন । খড়গপুরের নিকটে বৌদ্ধদের স্তূপ ছিল । এখন লোকে হুগের পূর্বে জাঙলা দেবী বা উজ্জুরিনী দেবীর মন্দিরে পূজা করে । এখানকার ভক্তের মূর্ত্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরগুলি নূতন নির্মিত ।

মৈনিতালের ২২ মাইল দৈশান কোণে কমায়ুনের রাজধানী আলমোড়া শহর পর্বতোপরি সংস্থিত । এই প্রদেশে নামাবিধ রত্নের আকর আছে । কমায়ুনের পর্বত শোভা অতি মনোহর । হিমালয় হইতে মিঝরিণী সকল আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইতেছে । অলকানন্দা সহ ডাগীরখী সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ, নন্দাকিনী সঙ্গমে কত্রপ্রয়াগ, পিণ্ডার সঙ্গমে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দাকিনী সঙ্গমে নন্দপ্রয়াগ ও দেবলী সঙ্গমে বিষ্ণুপ্রয়াগ । আলমোড়া হইতে ৮০ মাইল উত্তরে বিষ্ণুগঙ্গার ডাইন তীরে সাগর হইতে দশ হাজার কুট উচ্চ সুপ্রসিদ্ধ বদরীনাথ তীর্থ । বড় বরফ, বড় শীত । নিকটস্থ উচ্চ প্রান্ত-বর্ণের জলে অনেক আরাম বোধ হয় । মন্দিরটী ৩০ হাত উচ্চ, উপরে স্বর্ণবা কলস ও মধ্যস্থলে শ্রীমপাষণের নারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজমান । বিগ্রহটী প্রায় দুই হাত উচ্চ, মস্তকে বক্রমণি, কিন্তু মূর্ত্তিটী ক্ষয় হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য জল হইতে তুলিয়া স্থাপন করেন । এখনও মলবারের ব্রাহ্মণেরা পূজা করে । ব্যয়ের জন্ত গড়োয়ালে ১৭৫ ও কমায়ুনে ৫৬ খানি দেবদ্র গ্রাম আছে । বার্ষিক আয় ২ হাজার টাকা, বর্ষে ৭ অবধি ১০ হাজার যাত্রী যায়, প্রধান পুরোহিতকে রাওল কহে । শীতের সময় পুরোহিতেরা মন্দির বন্ধ করিয়া পাণ্ডকে-শর বা ঘণীঘাটে আসিয়া থাকে । ঘণীঘাটে নরসিংহ মন্দির আছে । বদরীনাথের নিকটে তিব্বত বা কৈলাস যাইবার মান্য পথ । ঐ পথ দিয়া বদ-রিকার্জমের স্রোতস্বতী অশ্পে অশ্পে আসিতেছেন, পথে তিনখানি গ্রাম । কিন্তু মধ্যে মধ্যে হিমবানশৃঙ্গ হইতে বরফসঙ্ঘ নিপতিত হইয়া গ্রামকে গ্রাম-উৎসন্ন করিয়া ফেলে । এই বিস্তীর্ণ ভরফর বরফসঙ্ঘকে পার্বত্যীয়েরা হুইনগল বলে । বদরীনাথ হইতে ২৫ মাইল, কিন্তু পথের বক্রতা বশতঃ ১০৯ মাইল দূরে কেশরনাথ তীর্থ । রাস্তা অতি দুর্গম, শীত ও বরফ নিত্য হুঃসহ । কেশরনাথের মূর্ত্তি বাঁড়ের ককুদের মত কতকটা প্রস্তর উন্নত হইয়া আছে মাত্র । তাহার উচ্চতা ২ হাত ও বেড় ৯ হাত হইবে । অমরসিংহ একটা মন্দির

করিয়া দিয়াছেন । পুরোহিত পুরোহিত ঘটে থাকেন এবং কেদারে প্রতিনিধি পাঠান । ইহারাও বলহারী ব্রাহ্মণ । মন্দিরের আর বদরীনাথের, তিন ভাগের এক ভাগ । যাহাদের প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় তাহারা মহাপথে ভৈরব স্বপ্ন দেয় অর্থাৎ উত্তরদিকে গড়ানীয়া বরফের মাঠে দৌড়িয়া যায় । গড়ানীয়া বশতঃ আর উঠিতে পারে না, শীতে প্রাণ ত্যাগ করে । এখন গবর্ণমেণ্টের লোকে সে দিকে যাইতে দেয় না । হিমালয়ে পঞ্চকেদার আছেন । পাণ্ডুরা বলে শিব স্বরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করাতে শরীরের পঞ্চস্থান বাহির হয় । তাহাই পঞ্চকেদার । কেহ কেহ কেদার কণ্ঠেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, কল্পনাথ ও তুঙ্গনাথ হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই পঞ্চ কেদারই দর্শন করে । বদরী, কেদার হইয়া সন্ন্যাসীরা মানা পথে না গিয়া দূরের অস্পতা বশতঃ হিমালয়ের হুগম জোয়ার পথ দিয়া মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বত দেখিতে যায় । রাস্তা বড় বিকট, কিন্তু পথে পচাশাও নগরে অতিথিসেবা আছে । কমাযুন গড়োয়ালের পার্বতীয় পল্লী সমূহে মাটি ও পাথরের হুই তিন তলা ঘর, নিম্নতলে গক থাকে । তাহার উপর মানুষ ও শস্ত থাকে । নদী পার হওয়া বড় দায় । কাঠ যোগ করিয়া শালী, দড়িতে কাঠ বাঁধিয়া ঝুলা অথবা দড়ির শিকার করিয়া নদী পার হয় । পাঁহাড়ের ফাটে ফাটে মধ্যে মধ্যে একরূপ আঠা পাথর চুয়াইয়া পড়ে । ইহাকে ইংরেজেরা বিটিউমেন ও বৈছেরা শিলা-যতু বলে । টার্পিন তৈলের ব্রকের কাঠ জ্বালিয়া পার্বতীয়েরা মশালের কার্য করে । এখানে চামরা ও চুরী নামক প্রায় ২০ হাত লম্বা গাছের ফলের ভিতর নবনীত পাওয়া যায় । ফল প্রায় পিয়ারার মত, ভিতরে বীজ, খাইতে সুমিষ্ট মাখনের ভায় । বীজ পিসিলে তাহার তৈল জন্মিয়া মাখনের ভায় হয় । বীজে চিনিও প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার ফুল চর্কণ করিলেও মধুর আশ্বাদন পাওয়া যায় । কমাযুনের লোক মধুর চাস করিয়া থাকে । পার্বতীয় চুরীফুলের মধু বড় মিষ্ট । হিমালয়ে নানা জাতীয় ফল ফুল ও কাঠ, জটায়াংশী পাওয়া যায় ।

যদি কাঙ্গী হুইতে অযোধ্যা পাকালাদি দেখিতে ইচ্ছা না হয় তবে মঙ্গল-সরাইয়ে দিগিয়া যাইবে ।

মদলসরাই পরে চুনার বা চরণাঙ্গি । গঙ্গার দক্ষিণ তটে শতহস্ত উচ্চ এক প্রকাণ্ড পাছাড় । তহপরি ১৫০০ হাত লম্বা ও ৬০০ হাত বিস্তৃত এক অদৃঢ় ভূগ । প্রাচীর কোথাও ৭ হাত কোথাও বা ১৪ হাত উচ্চ । তহপরি মধ্যে মধ্যে চূড়া, কামান ও বড় বড় পাথর । অভ্যন্তরে হিন্দুরাজার এক প্রাচীন প্রাসাদ, কুপ, স্থানে স্থানে তৃণ, বৃক্ষ, সেনাবাস, রাকদাগার, হাঁসপাতাল, জেল ও উৎকৃষ্ট অশ্বখরুক নিয়ে এক মার্বেল বেদী । লোকে বলে যে বিংশের ৯ ঘণ্টা এই মার্বেল বেদীতে বিরাজ করেন । ১৫২৯ অব্দে এই ভূগ বাবরের ছিল । তৎপরে অনেকের পর ১৭৬৮ অব্দে ইংরাজেরা প্রাণ্ড হইয়া আত্মধাগার করেন । একগুণে সীড়িত সেনাগণের আবাসস্থান । ভূগের পূর্বাংশে নগর । নগর বাহির কাশীমসলিমান ককীরের কবরো-পরি সম্রাট নির্মিত প্রকাণ্ড মসজিদ । চুনার প্রস্তর প্রস্তরের কাঠিষ্ঠ, স্থাপিত্ব, উৎকৃষ্ট আভা ও উৎকৃষ্ট দানার জন্য প্রসিদ্ধ । ইহা কলিকাতায় মূর্তিনির্মাণ কার্যে নিয়োজিত হয় । ফেঁসন পার হইয়া অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রস্তর প্রথিত ৭ খণ্ড বিশিষ্ট জরণালার সেতু । প্রত্যেক খণ্ড ৪০০ হাত । বামে বিক্রাপর্বতের বিকীর্ণ শৃঙ্গাবলী । পথে দশ মাইল মধ্যে ২১ সেতু । বর্ষায় বিছোর জল উহার মধ্যদিয়া গঙ্গায় নিপতিত হয় । তাহার পর ডাইন দিকে গঙ্গাতটে মির্জাপুর । নগরের প্রাসাদ মন্দির মসজিদ ও ঘাট-প্রেলীর শোভা ভাগীরথী হইতে অতি সুন্দর দেখায় । যে অংশে দেশীয় লোকেরা বাস করে তাহার মধ্য দিয়া উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ শোভিত তিনটী সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত ও সরল পথ চলিয়া গিয়াছে । ইহারই পার্শ্বে পার্শ্বে রালু-কা প্রস্তর নির্মিত মন্দিরাবলি । চক ও উজ্জানের শোভাও প্রশংসাযোগ্য । মির্জাপুর কার্পেট পশমী রেশমী ও স্বত্রবস্ত্রজন্য প্রসিদ্ধ । হুলিচা, কার্পেট-প্রস্তরের যন্ত্র গুলি দেখিতে প্রীতিকর । লোঁহের জিনিসও মন্দ নয়, এবং এলাচদানাগুলি অতি সুস্বাদু ও সুদৃশ্য । রেল হইবার পূর্বে মির্জাপুর মধ্যভারতের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল । ফেঁসন হইতে বিক্রাসিনীর মন্দির ৩ কোশ দূরে । একা ভাড়া ১০ । রেলওয়ের পথ হইতে এই মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্বে ঠক, ডাকাইত ও গাঁটকাটারী ব্যাজপূর্ণ এই পর্বতশ্রেণীতে বাস করিত, এখন নিবৃত্ত হইয়াছে । নবরাত্রি দিনে এখানে

যেলা হয়। এবং গঙ্গা বিহ্বো সঙ্গম হওয়ার দশগুণ কুরুক্ষেত্র ফল জন্ম
বহুলোক স্থান করিতে আইসে। মির্জাপুর হইতে ৬ মাইল দূরে তোরা
নামক সেনানিবেশ স্থানের নিকট ৪০ হস্ত উচ্চ একটা জলপ্রপাত দেখিতে
পাওয়া যায়, পাছাড় হইতে ঐ প্রপাত দেখিতে অতি সুন্দর। মির্জাপুর
হইতে ১ দিন গমন করিলে পূর্ববর্ণিত শোনপ্রভবণের সমীপবর্তী হওয়া
যায়। ইহারই নিকট সিদ্ধাবাসী কয়লা ক্ষেত্র। মির্জাপুর ত্যাগ করিয়া
কিছু দূর পরে সিরসা রোড। তৎপরে তমসার সেতু। তদনন্তর নইনি।

নইনি হইতে শাখা রেল জব্বলপুর হইয়া বয়ে গিয়াছে। নইনিরাপার যমু-
নার আশ্রয় সেতু। নিম্ন দিয়া নোঁকা, তত্পরি লোক ও তাহার উপর দিয়া
রেলগাড়ি চলিতেছে। ২১৪৯ হস্ত লম্বা সেতু, পঞ্চদশ কুকের অর্দ্ধমাইল বিস্তীর্ণ
কালিম্বীর উভয় কূল স্পর্শ করিয়াছে। প্রত্যেক ভাগ ১৩৬ হাত। তাহারই
মধ্যে যমুনার নীল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এক একটা স্তম্ভ জল হইতে
নিম্ন পর্য্যন্ত ৫০ ফীট প্রোথিত আছে। বর্ষাকালে তত্পরি আর ৪৫ ফীট
জল বৃদ্ধি হয়। স্তম্ভ সমূহের নিম্নভাগ প্রস্তর ও উপরিভাগ লোহ
নির্মিত। স্রোতসকুল যমুনার বালুকার এই স্তম্ভ প্রোথিত করিতে বিশেষ
কষ্ট হইয়াছিল। সেতুর দ্বিতীয় তল দিয়া গাড়ী ঘোড়া ও লোক চলিতেছে।
দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে হইলে বাঁধ দিয়া ও উত্তর মুখে প্রবেশ করিতে
হইলে ৩০ টী খিলানের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই উচ্চ স্থান
হইতে বালকেরা যমুনার ঝাঁপ দিতেছে।

সেতুর ডাইনদিকে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের পতাকা কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর
হয়। সেতু পার হইয়া বামদিকে পথের নিম্নে বিটপী আচ্ছাদিত প্রয়াগের
খাপরল-ঘর ও শ্বেতবর্ণের গৃহ সকল দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড স্টেশন। স্টেশ-
নের বাহিরেই অব্যাদি পূর্ণ ইষ্টক নির্মিত উৎকৃষ্ট বিভ্রামশালা। সম্মুখে কূপ,
পুষ্পবাটিকা ও ডাইন দিকে কোণাংশে মলগৃহ। স্টেশন নিকটে দুই এক
পরমা দিলেই প্রয়াগীরা প্রয়োজনীয় বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। উত্তর
পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্রই সামান্য পরমায় যথেষ্ট কার্য্য হয়। বামদিকে অল্পদূরে
বাল্লীদেব বাসস্থান শাদসাহী মুণ্ডী প্রয়াগ নগর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ-
ধানী। দেখিবার মধ্যে প্রথমে অব্যাদিপূর্ণ চক। 'তাহার কিছুদূর পরে

সরাই । এই স্থানে ৫০০ কীট বিস্তৃত স্থশোভিত ও প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত এক সুদৃশ্য সমতলক্ষেত্র দণ্ডল । মধ্যে মধ্যে নিঃস্ব পথিকদিগের থাকিবার জন্য গৃহ । একদিকে মুসলমানদিগের সারাসন প্রথার নিখিত ৪০ হাত উচ্চ ও ৩৩ হাত প্রস্থ এক প্রকাণ্ড দ্বার আছে । উহার মধ্য দিয়া হতভাগ্য জেহাদির পুত্র শশকর উদ্যানে প্রবেশ করা যায় । উদ্ভান মধ্যে তিনটী উৎকৃষ্ট গম্বুজবিশিষ্ট খসক পরভিজ ও জেহাদিরের মাড়োরারি বেগমের কবর মন্দির । এলাহাবাদ নগর বিস্তীর্ণ কিন্তু সুরমা গৃহাদি অতি অল্প । জমা-মসজিদ পূর্বে অধিবেশন গৃহ ছিল । বিদ্রোহের পর ইহাতে ক্যানিং টাউনে ইয়ুরোপীয়গণ রাজধানী করিয়াছেন । ইহার নিকৃষ্টশোভা অতি মনোহর । গোরাধারিক, আদালত ও হাইকোর্ট দর্শনযোগ্য বটে । এই প্রকারে এলাহাবাদ শহর দর্শন করিয়া অনেকে কেল্লা ও গঙ্গা যমুনা সঙ্গম দেখিতে যান । চক ইহাতে ঠিক সোজা এক রাস্তা বেলীঘাট চলিয়া গিয়াছে । প্রায় তিন ক্রোশ গঙ্গা যমুনা জলে স্নানিত হয় বলিয়া জলের গতিরোধার্থ মাটি ফেলিয়া এলাহাবাদপার্শ্ব উচ্চ করা হইয়াছে । উহাকেই বাঁধ বলে । ফেসন ইহাতে বাঁধ পর্যন্ত একাত্তা প্রায় ১/০ । বাঁধের ভাইনদিকে যমুনা তটে কেল্লা । বর্ষাকালে কেল্লার নিকট উভয় নদীর জল আইসে । কেল্লার চতুর্দিক লোহিত প্রস্তরে প্রথিত । বেড় প্রায় পাঁচ সহস্র হস্ত । ১৫৭২ অব্দে আকবর প্রাচীন হিন্দু-মূর্তির উপর এই দুর্গ নিৰ্মাণ করেন এবং প্রয়াগের নাম এলাহাবাদ রাখেন । ইহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য পূর্বে আরও অধিক ছিল । ইংরাজেরা ভগ্ন করিয়া বর্তমান কালের সুস্বোপযোগী করিয়া লইয়াছেন । কেল্লা মধ্যে আকবরের গৃহ, অশোকস্তম্ভ ও আকর বটাদি দেখিবার যোগ্য । আকবরের উৎকৃষ্ট হল ১৮০ হাত দূর । এক্ষণে অপ্রাণীর হইয়াছে । অশোক রাজার প্রস্তর স্তম্ভ প্রায় ২৮ হাত উচ্চ । ইহাতে পালিকায় অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের বিবরণ লিখিত আছে । ইহারই নিকট কেল্লায় সুতিকানিধি অক্ষর বট । অভ্যন্তরে গিরা অক্ষকার । দুই পার্শ্বে দেব দেবী মূর্তিবিশিষ্ট দুই প্রস্তর প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে । অঙ্গুষ্ঠ পেরেই অক্ষকারে এক শিব । এবং বটের শৃঙ্খল । গুড়ির নিম্নে একটা পিতলের দেবীমুখ । ইহারই পূজার নাম অক্ষরবট-পূজা, দক্ষিণা দুই পয়সা । কেল্লা হইতে বাহির হইয়া বাঁধের নিম্নে সমুখে

বালির চর । চরের মাথায় দিতাসিত সঙ্গমের মনোহর শোভা । কি গভীর ভাব । দক্ষিণ ও দৈবৎ পশ্চিমমুখী গঙ্গার প্রবল বেগে পূর্বাভিমুখী যমুনার বেগ শুদ্ধ প্রায় । ঘাটে কেশপূর্ণ, বালির উপর নিশান পোতা, প্রয়াগী পাণ্ডাদের কুটীর ও পূজোপকরণ স্রব্য পূর্ণ দোকান । প্রয়াগী পাণ্ডারা কাশী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, এজ্ঞা অগ্রে চুক্তি করিয়া কার্য করা কর্তব্য । মন্তক মুণ্ডন মূল্য ১/০ । স্নানকালে জলমধ্যেই পুষ্পদ্রব্যাদি বিক্রেতা ও ভিক্ষুক উপস্থিত । অনেকে নৌকা করিয়া গিয়া সঙ্গমে স্নান করে । কিন্তু সমস্তই বালির চর, তথায় বুঝিয়া পদব্রজেও যাওয়া চলে । তীর্থযাত্রীদের অনেকে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিতেছে । তীর্থশ্রাদ্ধ বড় সহজ ব্যাপার নহে । পাণ্ডাদের হস্তে নিস্তার পাওয়া ভার । কুশের পরিবর্তে কেশ ও সংস্কৃত মস্তুর পরিবর্তে নানা প্রণাম আদি অপশব্দ প্রয়োগ করে । শাস্ত্রজ্ঞান বিবর্জিত শৌচাচার বিহীন পাণ্ডারা পান চর্চন করিতে করিতে পাগড়ী বাঁধিয়া ইতস্তত মস্ত্রোবলায় । দেবপক্ষ পিতৃপক্ষের সম্পর্ক নাই, কেবল লুণ্ঠন পক্ষই প্রবল । এক স্থানে এক হরস্ত পাণ্ডা এক গরিবের হস্তে পৈতা জড়াইয়া কসিয়া বাঁধিতেছে এবং ঘোর মূর্তিতে বলিতেছে “আরে বোল কা দেগা !, জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি ? বলে উহার পিতৃ পুত্র উদ্ধার হইতেছে । ঐ গরীব শ্রাদ্ধকারীকে বলা হইল, মৃত যমের হস্ত হইতে তোমার মৃত পিতৃ পুত্র উদ্ধার হইয়াছে, এখন জীবিত যমের হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে বুঝি বা পুলিশ ডাকিতে হয় । পাণ্ডারা পুলিশের নাম শুনিয়া বন্ধন মুক্ত করিল । আর এক যাত্রী শত শত পিপিলাকা সহ ছাত্তু পাকাইতেছে এবং তাহার পাণ্ডা বড় খুসীতে সম্মুখে বসিয়া আছে । আর এক স্থানে গক উৎসর্গ করিয়া দামের জন্ত মারামারি । হাঃ ধর্ম ! এককালে যেখানে তুমি মূর্তিমান ছিলে— আজ সেখানে নিশাচর দৌরায়ে স্নান করা ভার । সমস্ত তীর্থেই শ্রাদ্ধের এই রূপ দশা । অথচ পাণ্ডাদের দৈনিক পরিশ্রমের বেতন ॥ আট আনার অধিক নহে ।

সঙ্গমের বিপরীত দিকে খুঁসীর উল্টান কেলা । পূর্বকালে খুঁসী স্থানে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানপুর ছিল । কেলায় পার্শ্বে যমুনাতে সরস্বতীরূপ ও প্রান্তে যমুনার ঋণমোচন ও কল্যাণতরঘাট । তদনন্তর রেলপুল, তাহার পর রাধ-

ঘাট ও দুৱে শীখারুওঘাট । বারমিকে গঙ্গাতীরে যে দুৱে বাঁধা ঘাট দেখা যায় তাহার নিকট রাজা বাহুকীর ঘাট বা ভোগবতী । প্রতিষ্ঠান প্রয়াগ কদম্পাতর ও ভোগবতী, ইহার মধ্যস্থান প্রজাপতির বেদী । এই স্থানে দেবতা, বতি ও নরপতিগণ ভূরি যাগ করেন বলিয়া স্থানের নাম প্রয়াগ, ইহাই পরম তীর্থ । প্রতিষ্ঠানে সমুদ্ররূপ ও তদুত্তরে হংসপ্রপতন । বৈশাখ পর্বাঙ্ক গঙ্গার মোকাসেতু দিয়া যাওয়া চলে । যমুনা দক্ষিণে দরওয়াজি নগরে অগ্নিতীর্থ, কেল্লা মধ্যে অক্ষয়বটে কদম্পাতন । দারাগঞ্জে বেণীমাধব ও কিয়-দুৱে ভরদ্বাজ আশ্রম । আশ্রমে শিব ও মারীর মিলে অক্ষকার গৃহে কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি আছে । বাহুল্যভয়ে অন্তর্বেদী ও মধ্যবেদীর ভূরি তীর্থ ও পঞ্চ-কোশী যাত্রা লিখিত হইল না । প্রয়াগমণ্ডল পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ । প্রয়াগের লোমজবজ্র, তরমুজ, কালাকন্দ ও পিয়ারা উৎকৃষ্ট ।

প্রয়াগ বহুকালের প্রাচীন তীর্থ । মহাবের সময়াবধি রাজধানী হয় । তিনযুগে বহু ঋষির আশ্রম ছিল । কলিতে কিয়ৎকাল পতিত থাকে । ১২০০ বর্ষ পূর্বে হেরানথসং বলেন দুই মাইল প্রশস্ত প্রকাণ্ড বালুকা ক্ষেত্রের পশ্চিমে প্রয়াগ নগর মধ্যে এক শিবমন্দির ও সম্মুখে ছাড়বেষ্টিত প্রকাণ্ড অক্ষয়বট । গঙ্গানীর সমকালবর্তী আবুরিহানের কথানুসারে রসিদ উদ্দিন বলেন সঙ্গমে প্রকাণ্ড বটরূক্ষ । আকবরের দুর্গ নির্মাণকালে আবহুলকাদের বলেন যমুনা-তীরে বটরূক্ষ । শিবমন্দির ভগ্ন ও ক্রমে মৃত্তিকা প্রভাবে নগর উচ্চ হও-রাত্রে অক্ষয়বট ও শিব মৃত্তিকানিলে পড়িয়াছে । ২৪০ পূঃ খৃঃ অঙ্গে অশোক স্বকীর আজ্ঞা সম্বলিত প্রস্তর স্তম্ভ উৎখাপিত করেন । তাহার পর লম্বভাবে লেখা দেখিয়া বোধ হয় পতিত ছিল । তাহার পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্র-গুপ্ত স্বীয় জয় ঘোষণা খোদিত করেন । তাহার পর পতিত হইলে সন্ন্যাসীরা নাম লেখে । তাহার পর জেহাজির ১৬০৫ অঙ্গে তুলিয়া দেন । তাহার পর ১৮০৮ অঙ্গে গারিফিন সাহেব মস্তকের ভগ্ন সিংহ পুনরায় নির্মাণ করিয়া তুলিয়া দেন ।

প্রয়াগের ১৫ কোশ দূরে যমুনাতটে প্রসিদ্ধ কোশাবী নগরের ভগ্নাব-শেষ । ২ কোশ বিস্তীর্ণ এক ভগ্ন দুর্গ, তদ্বাধ্য অশোকের অর্দ্ধ প্রোথিত এক প্রস্তরস্তম্ভ ও চতুর্মুখ ত্রিনেত্র এক শিবমূর্তি পড়িয়া আছে । পুরুষবার ১০ম,

পুরুষ কুশাব এই নগর স্থাপনা করেন । অজ্ঞানের অন্ধম পুরুষে হস্তিনা বিনষ্ট হইলে পাণ্ডুবংশীয়েরা শেষ পর্য্যন্ত এই নগরে রাজ্য করে । পরে ইহা বৎস রাজ্যের রাজধানী হয় । উদয়নাথের সময় ইহার অত্যন্ত মৌরব ছিল । ইনিই এখানে বুদ্বের চন্দনময় অবিকল মূর্তি নির্মাণ করিয়া স্থাপন করেন । কোশাবী ভারতের ১৯ রাজধানীর মধ্যে এক রাজধানী ছিল । শতবর্ষ হইল কোশাবী ভাঙ হইয়াছে, এখনও জৈনেরা তীর্থ করে । কোশাবীর ৭ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে ও শিবরাজপুরের ২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গুপ্তদের রাজধানী যরোরার ভয়াবশেষ । এলাহাবাদ হইতে দূরে গঙ্গাতীরে রামায়ণের শৃঙ্গ-বের-পুর ।

এয়াগ ত্যাগ করিয়া ময়ূর মধ্যদেশ দিয়া রেল চলিতেছে । সমস্তই সম-তল ভূমি স্থানে স্থানে জোয়ারির ক্ষেত্র । দৃষ্টির উত্তেজক কিছুই নাই । তদনন্তর প্রধান সহর কানপুর গঙ্গার বালুকাময় তীরে অবস্থিত । অধিবাসীর সংখ্যা অর্দ্ধ লক্ষ । কানপুরের দশবর্গ মাইল ইংরেজ সেনানিবেশে আচ্ছন্ন । সাতসহস্র সৈন্য স্বচ্ছন্দে থাকিবার বিলক্ষণ স্থান আছে । ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে কানপুরে ভয়ঙ্কর উপদ্রব হইয়াছিল । নানার ভীষণ অত্যাচার স্মরণার্থ ইংরেজেরা একটা উত্থান করিয়াছেন । তন্মধ্যে সেই ভয়-ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের গৃহ এবং যে কুপে নিহত বিবি ও বালকগণকে সিপাহীরা বিক্রেণ করিয়াছিল তাহার উপর একটা স্বর্ণীয় পরিণ প্রতিমূর্তি যেন ক্রন্দন করিতেছে । নিকটে নানাবিধাকারে খোদিত প্রস্তরাবরণ ও নিহত লোকের সমাধি । স্থানে স্থানে দৃষ্টিশ্রীতিকর রক্ষ । উত্থানের ১ মাইল দূরে ও গঙ্গার অর্দ্ধ মাইল অন্তরে হুইলর সাহেবের গড়খাই । যেখানে তিনি ২১ বার আপনা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন । এখন জলপ্লাবনের কূপ ব্যতীত আর কোন চিহ্ন নাই । নিহত ব্যক্তিদিগের কবরোপরি এক একটা ক্রুশ আছে । অনন্তর খেত চোড়া ঘাটের গির্জা । নানার অভয় পাইয়া ইউরোপীয়েরা চলিয়া যাইবার সময় নৌকায় এইস্থানে নিহত হয় । কানপুরের নিকটেই গঙ্গার খাল শেষ হইয়াছে । দুইকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই খাল দ্বারা এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইতেছে । কানপুরের সালুকাপড়, কলাকন্দ ঘন্ট নহে ।

কানপুর পার হইয়া পাকুণের পথে মধ্যে মধ্যে বস্ত্রহরিণ চরিতে দেখা

যায়। তদনন্তর ইটোর। যমুনাতটে অবস্থিত। গবর্ণমেন্টের সামান্যমত সৈন্স থাকে। ইটোর। ঐশ্বের অতি দূরন্ত প্রভাব। ঐশ্বকালের লু অর্থাৎ গরম বায়ু এলাহাবাদ পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। গাত্র আরত না থাকিলে শরীর দগ্ধ হইয়া যায়। আম-পোড়া লুর মর্দোবধ। যে দেশ দিয়া যমুনা বহিয়াছে, যমুনার পার্শ্বস্থ স্থানের কূপের জল প্রায়ই লবণাক্ত হয়। যমুনার তীরে ভ্রমণ করিতে স্থানে স্থানে প্রায়ই খাত পাওয়া যায়। পূর্বে ইটোর। টং বাস করিত। এখানে ময়ূরের পাখা অত্যন্ত সুলভ। ইটোর। পর দারাসিকো স্থাপিত সিকোয়াবাদ। তদনন্তর টুঙলা। টুঙলা হইতে এক পাখা রেল আগরা গিয়াছে।

আগরা। পূর্ব নাম অগ্রবন। কেহ বলেন এই স্থানে পরশুরামের জন্ম হয়। সেকেন্দর লোদীর কালে বাদলাগড় বলিত। আকবর নগর স্থাপন করিয়া আকবরাবাদ আখ্যা দেন। এই নগর যমুনার ডাইন তটে অবস্থিত। প্রবেশমুখে দুইপার্শ্বে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মূর্তিকা স্তূপ। তৃণ নাই, রস নাই ও মধ্যে মধ্যে এক একটা খাত। কিন্তু অনতিদূরেই ভাজের মনোহর রূপ। পশ্চিম হইতে ক্রমাগত বালি উড়িয়া আসিতেছে। রাজপুতানার মকর এই বালুকাতে আগরার পশ্চিমভাগ আচ্ছন্নপ্রায়। পথগুলি প্রস্তর নির্মিত। এতকাল হইয়া গিয়াছে কিন্তু কর্মের সম্পর্ক নাই। ব্রিটিশদিগের নির্মিত পথ ঐশ্ব ধূলি ও বর্ষার কর্মে আচ্ছন্ন হয়। চক ও অপরাপর স্থানে অত্যন্ত ঘন বসতি কিন্তু এক এক স্থলে কিছুই নাই। কেল্লা, তাজ, এহু-মর্দোলা, সেনানিবেশস্থান, সেকেন্দ্রা ও ২৪ মাইল অন্তরে ফতেপুর শিকরীর প্রাসাদ দেখিবার যোগ্য। কেল্লা কালিন্দীতটে অবস্থিত, চতুর্দিকে লাল প্রস্তরের প্রাচীর দেড় মাইল বেষ্টিত করিয়াছে, প্রাচীরের উচ্চতাও অল্প নয়, প্রায় ৪০ ফুট। উপরে তীর নিক্ষেপের কাটা কাটা কাঁক। পূর্বে বাহিরে এক ভিত্তিও ছিল। এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান পরিখা ২০ ফুট বিস্তৃত ও তল্য সমস্তই পাথরে গাঁথা। আমরা উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশের মানস করিলাম। সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড দরজা, তাহার দুই ধারে দুইটা বিশাল স্তম্ভ। যত ভিতরে যাওয়া যায় দোধারি সারি সারি ঘর তত্বেপরি স্তম্ভলা মত কোলঙ্গী ও অর্দ্ধচক্রাকার ছিন্ন। সমস্তই খোদিত ও চিত্রিত।

বার হইতে এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমাগত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরেই দেখি এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, প্রায় ৩০৩ হাত লম্বা ও ২৪৬ হাত প্রশস্ত। তাহার চারিধারে বৃক্ষলতাকীর্ণ পথ, ইহারই একদিকে আকবরের বিখ্যাত দেওয়ান আম বা সদর কাছারি। গৃহটী প্রায় ১২০ হাত লম্বা ও ৪০ হাত প্রশস্ত। এখন গবর্ণমেন্ট অস্ত্রাগার করিয়াছেন। প্রায় বিশশতাব্দ অস্ত্র ভিত্তি ও স্তম্ভগাত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত রাখিয়াছে। পূর্বে এই গৃহমধ্যে তিন খাক স্তম্ভ ছিল, এবং প্রত্যেক স্তম্ভদ্বয় যাবনিক খিলানে সংলিপ্ত ছিল। গবর্ণমেন্ট একগনে সেগুলি বন্ধ করিয়াছেন, গৃহের মধ্যভাগে খেতমার্কেল বিনির্মিত আকবরের বিচিত্র সিংহাসন স্থান। ইহার নিম্নে একটা প্রস্তর ফলক। আকবর ইহার উপর উপবেশন করিতেন, দেওয়ান আমের গম্ভীর ভাব ও বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মন আকুলিত হইল। যেখানে গমন করিবার জন্য ইংরাজেরা শত শত লোকের উপাসনা করিতেন, এখন সেই স্থানে দেওয়ান হইয়া ব্রিটিশ সৈন্যগণ ধূমপান করিতেছে। যে স্থানে তানসেনের স্মৃতিস্তম্ভ উখিত হইত, আজ সেই দেওয়ান আমে চামচিকা চীৎকার করিতেছে। শত শত বিশসের স্বর্ণ সামাদানে তিন তিন গজ লম্বা কপূর বাতিতে যে গৃহ আলোকিত হইত, আজ সেই দেওয়ান আম অন্ধকার। যে জনপূরিত স্থানে প্রবেশ করিতে মূর্দ্ধাভিযুক্ত রাজগণও ভয় করিতেন, আজ সেই স্থানে একাকী করদেশে কপোল বিন্যাস করিয়া আমরা অতীত ইতিহাস স্মরণ করিতেছি। হা কাল! তুমিই ধন্য। গৃহের পার্শ্বে এলেনবরা আনীত সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠের দরজা। প্রায় ৮ হাত উচ্চ। দ্বারের সমস্ত ভাগই উত্তমরূপ খোদিত এবং তদুপরি তিনটী ঢালের ফুল আছে। শুনা যায় এই তিনটী মহম্মদের ঢালের ফুল ছিল। দরজা যে সোমনাথের তাহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই নাই। দেওয়ানখাস বা আকবরের মকঃস্বল কাছারীর সম্মুখে অনারত স্থানে ৪ হাত সমচতুষ্কোণ এক খান কাল মার্কেল স্তম্ভ পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে ফাটা ও গায়ে একস্থানে একটু লালমাগ। মুসলমানেরা বলে যে আকবরের এই স্তম্ভের ভরতপুরের রাজা বসাতে তক্ষা কাটিয়া যায় ও রক্ত পড়ে। এবং লর্ড এলেনবরা বসিলেও আবার রক্ত

পড়ে। ইহার সম্মুখে ক্ষুদ্র সাদা মার্বেলের আর এক খান সিংহাসন। এই সিংহাসনে ভাঁড় বসিয়া বাদশাহ সাজিয়া আকবরের সহিত তামাসা করিত।

দেওয়ান আমের পর সন্ধ্যাটের আবাসগৃহ। আবাসগৃহের নিম্ন দিয়া কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছে। গৃহের ভিত্তি ও মধ্যভাগ সমস্তই সাদা মার্বেলে ঝক ঝক করিতেছে। তহুপরি নানা রঙের নানা গতা ও নানা ফুল নানারূপে চিত্রিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন কে রং দিয়া চিত্র করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সে গুলি সমস্তই জাজ্বল্যমান ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর প্রকৃপ বিনিবেশিত হইয়াছে। গৃহগুলি আরতনে ভূষ, কপাট আলের ও কোলজার মধ্যে পূর্বকালীন কোলজার ন্যায় অর্থ রাখিবার গহ্বর আছে। গৃহের বাহিরে যমুনারদিকে বারান্দা অতি মনোহর। গজদন্ত বিনির্মিত খেত মার্বেলে সৌর কিরণ পতিত হইয়া তাহার উপরিভাগস্থ রত্নময় ফল পুষ্প হইতে কত রত্নের কতরূপ আভা নির্গত করে। উপরিভাগের মার্বেল আচ্ছাদন কি চমৎকারই বিরচিত। তহুপরি স্বর্ণ বর্ণ কলস সকল জ্যেষ্ঠবদ্ধ রূপে সজ্জিত হইয়াছে। স্তম্ভ সকলের শোভাই বা কি? এবং স্তম্ভ যোজিকা সকল এরূপ সুগঠিত যে নিম্ন হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন উৎকৃষ্ট ঝালর সংযোজিত আছে। কামিনীগণের গৃহসমস্তই যমুনার হিম্মোলে সুখপ্রদ। ৪৬ হস্ত নিম্নে কালিন্দীর নীল প্রবাহ। দূরে নিকুঞ্জবন ও তাজের মনোহর মূর্তি। গৃহে একবার উপস্থিত হইলে আর কিরিতে ইচ্ছা হয় না। অনন্তর আমরা সীসফল বা দর্পণ গৃহে প্রবেশ করিলাম, সন্ধ্যাট এখানে স্থান করিতেন, ভিত্তির কিরদংশ লইয়া গৃহের উর্দ্ধভাগ সমস্তই সমবিষম। এই সমবিষম ভাগে আরনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচও সংলিপ্ত আছে। একজন প্রবেশ করিলে এই অসংখ্য দর্পণে প্রতিমূর্তি পড়িয়া অসংখ্য মূর্তি দেখা যায়। কেলিকালে এক সন্ধ্যাট ও এক কামিনী শত শত সন্ধ্যাট ও শত শত কামিনী হইয়া নায়কের দর্শন পথে এক কালে পতিত হইত। ভিত্তি গায়ে শত শত কৃত্রিম নিকরিনি। জলের পথ এরূপ নির্মিত যে জল আনিবার কালে বোধ হইত যেন জীড়মান মৎস্ত আসিতেছে। এইরূপ কোশলে জল আনিয়া ধায়াস্থলের চৌবাচ্চায় পতিত হইত। চৌবাচ্চায়

মধ্যেও এরূপ কৌশল আছে যে, উহার অভ্যন্তর ভাগ দীপ দ্বারা আলোকিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন স্থলতানের কেলিগৃহ ও সম্মুখের পুষ্পশোভিত প্রাঙ্গণ সমস্তই কৃত্রিম উৎসে পরিশোভিত। এই স্থানে মার্কেল ও বহুমূল্য প্রস্তরাদির শোভা আছে সত্য কিন্তু উৎসই ইহার পরম শোভা। প্রাঙ্গণের পূর্বতন পুষ্প সকল এখন জঙ্গলাবস্থায় পতিত। ইহার পর আমরা ক্রীড়াগৃহে প্রবেশ করিলাম, কৃষ্ণ ও শ্বেতমার্কেলফলক দ্বারা স্তম্ভের ঘর হইয়াছে। বেগম সহ বাদসাহ কেহ রাজা, কেহ অর্থ, কেহ গজ, সাজিয়া স্তম্ভের গতিক্রমে পরস্পরকে ধরিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি খেলা করিত। ক্রীড়াগৃহ ত্যাগ করিয়া আমরা উপাসনা মন্দিরের দিকে গমন করিলাম। যে প্রাঙ্গণের উপর উপাসনা মন্দির আছে সেটী অতি উচ্চ, এত উচ্চ যে নিম্ন হইতে মসজিদের তিনটী সাদা গম্বুজ মাত্র দেখা যায়। অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিল একটি দস্তাস দরজা। খুলিবামাত্র বিস্তীর্ণ বেলে-পাথরের প্রাঙ্গণ, মধ্যে চৌবাচ্চা ও সম্মুখে মতিমসজিদ আছে। আহা, নামেও মতি দেখিতেও তদ্রূপ। উল্লে নীলবর্ণ আগরার আকাশ দেখিতে বড় সুন্দর। মতিমসজিদ অতি উৎকৃষ্টজাতীয় মার্কেলে নির্মিত। অতি শুভ্র, অতি রমণীয়, অতি পরিপাতি ও সম্পূর্ণরূপ খোদকারী। দুর্গার দালানের ভায় ঠিক তিন-কুকুরে ও তিনভাগে বিভক্ত। স্তম্ভের মধ্যস্থ খিলান গুলি সমস্ত সারাসন জাতীয়, ভিত্তিগাত্রে লেখা আছে, সাজেহান ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে নির্মাণ করেন। মতি মসজিদের পার্শ্বে এক অদ্ভুতকাণ্ড। ভিতের ভিতর দিয়া এক আশ্চর্য রকমের সিঁড়ি নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। এবং ইহার সহিত অপরাপর স্থানের যোগ আছে। সন্ধ্যাট শরনবেশধারিণী কামিনীগণকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি ও লুকাচুরি খেলা খেলিতেন। তাহাদিগের পদালঙ্কারের স্বন্দরতার রব ও স্রমধুর হাস্য চারিদিক শব্দায়মান করিত। শুনা যায় যে, তাজমহল ও সেনানিবেশের ঘাট পর্য্যন্ত এই সিঁড়ির যোগ আছে। সন্ধ্যা কামিনীগণকে নিকেপ করিবার জন্ত এখানে একটি কূপ ছিল। দুই জন গোরা পড়িয়া যাওয়াতে ইংরাজেরা মুখ বন্ধ করিয়াছেন। এইরূপ এখনও আকবরের অন্তঃপুর, স্নানাগার, ক্রীড়া স্থান ও কেলিকুঞ্জাদি সমস্তই বিচ্যমান আছে। অন্তঃপুরের মার্কেলের জাকরী কাটা পর্দা দিয়া কেবল একটি গোলা যাওয়াতে ৪০ ৫০মাণ স্থান শুই-

রাছে, এবং দুই এক স্থানে কেহ বা এক আধ খান প্রস্তর তুলিয়াছে । ফোরারা সকল শুক কিছু নষ্ট হয় নাই, সমস্তই বিদ্যমান, কেবল বাদসাহ নাই । কোথায় সে আকবর কোথায় বা তাঁর কামিনীগণ, কোথায় সে বীরবল, কোথায় সে মানসিংহ, কোথায় বা সে জরসিংহ, কোথায় সে অতুল ঐশ্বর্য, কোথায় সে প্রবল প্রতাপ । ২০০।২৮০ বর্ষ পূর্বে এখানে আইসে কাহার সাধ্য । যে অন্তঃপুরে মকিকাও প্রবেশ করিতে পারিত না এখন আমরা পাছুকাঁসহ সেখানে ভ্রমণ করিতেছি । যেখানে কামিনীগণের ককণ, কনক-কর কর্ণগোচর হইত, হায় রে কাল ! এখন ঐ দেখ সেখানে বসিয়া কে কার্কে কাটিতেছে । রজপুত কামিনীর শাঁখা চূর্ণের বিবরণ ও অপরাপর রাজবাচী বাজল্য ভয়ে লিখিত হইল না । বেলা অপরাহ্ন প্রায় । আমরাও কোর্ট হইতে বাহির হইলাম । কোর্ট প্রবেশের পূর্বে ব্রিগেড মেজরের পাস লইয়া প্রবেশ করিতে হয় ।

অনন্তর তাজ পরিদর্শন । পথের বামদিকে এক প্রশস্ত রওরাক । তহপরি লালপাথরের মানারূপে খোদিত প্রকাণ্ড গেট । এত উচ্চ যে উর্দ্ধমুখে দেখিতে গেলে সত্য সত্যই মাথার আঘরণ খুলিয়া পড়ে । এই প্রকাণ্ড গেটের উপর সারি সারি ২৬ কলস, অন্তরাল ও বহির্দেশ সম্বন্ধিত গেট পার হইয়া মাত্র এক প্রকাণ্ড উদ্যান । সম্মুখে একতলাসম লালপ্রস্তরের প্রকাণ্ড বেদী । তহপরি মার্বেলমণ্ডিত অপেক্ষাকৃত অল্প প্রশস্ত একতলাসম আর এক বিস্তীর্ণ বেদী । তাহার চারিদিকে চারিটী গগনভেদী মার্বেল স্তম্ভ এবং মধ্যস্থলে মন্দির সদৃশ স্বেতকায় প্রকাণ্ড তাজ । তাজের উদ্যানটী পূর্ব পশ্চিমে ১৪০ ফুট লম্বা ও উত্তর দক্ষিণে ৬৬ ফুট প্রশস্ত, চারিদিকে লাল-পাথরের প্রাচীর, কোণে কোণে চূড়া, দক্ষিণে ও বামেও আর দুই দরজা এবং পশ্চাতে কালিন্দীর নীল প্রবাহ । প্রবেশ গেট হইতে তাজপর্যন্ত সম্মুখে প্রজ্বলগরাজি জ্বীড়া করিতেছে । প্রজ্বলসমূহের দুই পার্শ্বে প্রস্তরের পথ । গমনকালে পথের পার্শ্বে সমশীর্ষ, সমবর্ণ ও সমকায় বিলাতী কাউঞ্চেটী, উদ্যানস্থ বৃক্ষের স্থগন্ধ, ফোরারার বারিবিহু ও চারিদিকে নিকুঞ্জশোভার প্রভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । উদ্যানের অর্দ্ধেক পথে মার্বেলের উচ্চ বেদী মধ্যে আর একটি উৎকৃষ্ট কৃত্রিম উৎস । বালকেরা উৎসের উপর

প্রান্ত কক্ষ ও কুলের কীড়া দেখিয়া করতালি দিতেছে। অনন্তর তাজের লালপ্রস্তর ও মাঝে মাঝে মার্বেল মণ্ডিত প্রথম বেদী। দীর্ঘ ৬৪৩ ও প্রস্থ ৩২০ হাত। ইহার দক্ষিণে ও বামে দুইদিকে দুইটা মসজিদ ও যমুনারদিকে দুইধারে দুইটা মার্বেলশীর্ষ রথের মত গৃহ। প্রথম বেদীর উপর মার্বেল মণ্ডিত ২০১ হস্ত সমচতুর্কোণ দ্বিতীয় বেদী। ইহারই চারিকোণে শত হস্ত প্রমাণ চারিটা চমৎকার মার্বেল স্তম্ভ বা মিনার, তাহার উপরিভাগে বসিবার জন্য অষ্ট স্তম্ভে সংরক্ষিত এক এক গম্বুজ। উঠিলে বহুদূর দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্তম্ভ বেদীর মধ্যস্থলে তাজমন্দির। তাজের মন্দির অষ্টকোণ বিশিষ্ট, চারিদিকের চারিভিত প্রত্যেকে ৮৬ হাত ১৬ অঙ্গুল লম্বা। প্রত্যেক ভিত্তির উপরে দুইপার্শ্বে দুইটা ও মধ্যস্থলে দুইটা স্তম্ভ শীর্ষের ভ্রায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যস্থলে স্তম্ভদ্বয়ের ব্যবধানে ভিত্তি গাত্রে জাকরীকঙ্ক এক এক দরজা, দরজার দুইপার্শ্বে কোলঙ্গার ভ্রায় উর্দ্ধে ও নিম্নে এক এক জোড়া জাকরীবন্ধ প্রকাণ্ড কোলঙ্গ। ইহারই মধ্য দিয়া তাজগৃহে আলোক প্রবেশ করে। চারিকোণের চারিভিত অপেক্ষাকৃত অল্প লম্বা। এইরূপ অষ্টভিত্তি বিশিষ্ট তাজের ছাদের উপর চারিকোণে অষ্ট স্তম্ভোপরি চারিটা গম্বুজ আছে। এই চারি গম্বুজের মধ্যস্থলে তাজের বিশাল গম্বুজ। গম্বুজের ব্যাস ৪৬ হাত ১৬ অঙ্গুল বেড় ইহার তিনগুণ এবং উচ্চতা ৮০ হাত। গম্বুজের উপর স্বর্ণবর্ণ কলসোপরি চন্দ্রের স্বর্ণময় মূর্তি, ভূমি হইতে চন্দ্রপর্বাণ্ড তাজ মন্দির ১৭৩ হাত ৯ অঙ্গুল উচ্চ, তাজের ছাদকে বাতীর ছাদের মত বোধ হয়, অথচ কলিকাতার মস্কেট হইতেও উচ্চ। সম্পূর্ণ রূপে খেত মার্বেল বিনির্মিত এই প্রকাণ্ড অবয়বের আমূল্য। নানাজাতীর বহুমূল্য প্রস্তরের পত্রাদি রচনা ও ব্রহ্ম ব্রহ্ম অক্ষরে কোরাণের পদাবলির দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে। মুনলমানেরা সত্য সত্যই দৈত্যের ভ্রায় এক প্রকাণ্ড হুয়া আরস্ত করিয়া জহরীর ভ্রায় তাহার প্রত্যেক অংশ স্বাক্ষররূপে সমাপন করিয়াছে। তাজের মন্দিরের প্রবেশ দ্বার অতি ক্ষুদ্র। ভবিষ্যতে যদি কেহ সেলাম না করে এই কারণে প্রবেশ কালে মস্তক অবনত করাইবার জন্ত দ্বার এত ক্ষুদ্র করা হয়। প্রবেশ করিলে গৃহের মধ্যভাগে অষ্টকোণ জাকরী বা মার্বেল পুরদা বেষ্টিত কবরদ্বয়।

ঐ কবরের নিম্নে যথার্থ কবর আছে, প্রবেশদ্বার ও মার্কেল-পার্শ্বের মধ্যে মন্দের গহ্বর দিয়া নিম্নতলে যথার্থ কবরের অঙ্ককার গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। রক্তকেরা পুরকারের প্রত্যাশায় আলো জালিয়া ধরে, নানাবর্ণ প্রস্তরে সূচিক্রিত ও মালাদামে বিভূষিত, সম্মুখের খেত-কবর রানীর ও তৎপার্শ্বের কবর সাজেহানের। কবরের উপর তক্তদ্বারা স্ত্রী ও কলযদান দ্বারা পুরুষ চিহ্নিত হয়। উপরের কবর ইহারই অনুরূপ। উপরের জাকরীকাটা মার্কেল পর্কী চারি হাত উচ্চ ও নানাবিধ খোদকারিতে পূর্ণ, এই খোদকারী মধ্যে অনেকে ইটালীয় পুস্পের চিহ্ন দেখিয়া তাজ ইটালীয়দের নির্মিত বলিয়া বুঝা সম্ভব করেন। তাজের উপর নির্মাতাদের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। প্রাচীরের চারি দরজার জাকরী, অভ্যন্তরে মার্কেল পরদার জাকরী ও উপরে গম্বুজ নিম্নের জাকরী দিয়া আলো প্রবেশ করাতে উপরিভাগের কবর আলোকিত হয়, কবর দুইটী চতুষ্কোণ বেদী মাত্র। নিম্নভাগ প্রাপ্ত কিন্তু উর্দ্ধ যত উঠিয়াছে ততই ক্রমে অগ্নি পরিসর হইয়াছে, ইহার সর্বদিক বহুমুখ্য প্রস্তর দ্বারা নানাবিধ লতাপাতায় চিত্রিত আছে। সম্মুখপ্রান্তে অঞ্জলিমান বাহু বেগম বাহার নাম সমতাজমহল, তাঁহার জন্ম ১০৪০ হিজরীতে তাজ নির্মিত হয় ইত্যাদি বিবরণ লিখিত আছে। শীতল, স্নেহসেব্য, মৃদু, সর্বত্র স্নেহবর্ণ ও চাকচিক্যশালী নানাবিধ রঙের আভাষ উজ্জ্বলিত তাজগৃহ মধ্যে সমস্তমান হইলে মনে অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। শব্দ করিলে বা গান করিলে তাহার স্বর বহুক্ষণপর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন ইয়ুরোপের স্মৃতিস্মৃতি পাটসার ব্যাপটিহুটি প্রতিধ্বনি এরূপ স্নমধুর নহে। তাজের রমণীয় রূপ নয়নে পতিত হইলে হৃদয় শিথিল হইয়া যায়। পরে পার্শ্ব ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার কমনীয় কান্দি, স্নেহোভন উদ্যানের সুবিমল সমীরণ উৎকৃষ্ট আভ্রাণ ও উৎসলিত উৎসের ক্রীড়াসহ সাজেহানের অতীত বিবরণ স্মৃতিপথে উদিত হইলে নেত্রজল সহসা করিত হইতে থাকে। সূর্যোদয়ের পূর্বে তাজ সৈবৎ নীল, উদয়ের পর রক্তাভ, কিরৎক্ষণ পরে পীতবর্ণ এবং মেঘাচ্ছন্ন হইলে নীল রক্ত হয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা চন্দ্রালোকেই অধিক রমণীয় হইয়া থাকে। বায়দিকে যাইতে প্রায় ৮০ হাতের পর হইতে তাজ দেখিতে অর্ধত স্তম্ভর, বোধ হয় যেন বায়ুতে ভাসিতেছে এবং

যত্ন নিকটবর্তী হওয়া যায় ততই অপসৃত হইতে থাকে, চত্বার্লোকে অশ্লীল
 মুক্তি হওয়ার আশ্রয়ে অভ্যস্ত হইতে বসে হয় । তাজ নীলবর্ণ আলোকে আলো-
 কিত হইলে অতি আশ্চর্য দেখায় । ইহার তুল্য উজ্জ্বল হর্ষ তুমুলে আর
 নাই । মাজেহান শবীর পরমা সুন্দরী জীব সমতাজমহলের কবরের জন্ম এই
 দর্শনশ্রুত করেন । ১৬-৩৩ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭ বর্ষে তাজ সমাধি হয়, এবং
 ইহার সম্মুখে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইরাছিল । টাভাবনিয়ার মধ্যে, বিশ-
 হাজার লোকে ২২ বর্ষ পরিভ্রম করিয়া ইহা সন্নিধান করে । কিছু বানশাহের
 সন্তানে বিনা বেতনে অধিকাংশ লোককে কার্য করিতে হইরাছিল । তাজ
 সন্নিধান করিতে ইনা মহম্মদ সিরাজবাদী আরম্মদ খাঁ ও যোগদান বাসী মহ-
 ম্মদ হানিক মাসিক সহস্র টাকা বেতনে নিযুক্ত হন । সুরক, পারস্ত, দিল্লী,
 পাঞ্জাব, ও কটক হইতে যে সকল স্থপতি আসে তাহাদের বেতন ১০০ হইতে
 ৫০০ পর্যন্ত ছিল । জয়পুর হইতে শ্বেত মার্বেল, মর্যাদা হইতে ৪০ টাকা গজে
 পীত মার্বেল, চারখো পাহাড় হইতে ২০ টাকা গজে লুকমার্বেল ও চীন
 হইতে ৫৭০ টাকা গজে স্বপ্ন প্রস্তর আনীত হয় ।

পঞ্জাব হইতে জবরজন, তিস্ত হইতে ফেরোজ, ইরান হইতে এলফ,
 লক্ষা হইতে সংসেভারা, আরব হইতে এবাল, বুলন্দশহর হইতে হীরা,
 পারস্ত হইতে মোলোমানি ও জবালীরা, লক্ষা হইতে নীলকান্তরসি ও কতে-
 পুর শিকরী হইতে ১ লক্ষ চৌক হাজার গাড়ী লালপ্রস্তর আনীত হয় ।
 খাজুর ও মজরে বিস্তর বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া হইরাছিল । লোকে বলে
 ইংরাজেরা তাজের অনেক পাথর খুলিয়া লইরাছে । ইংরাজেরা বলেন রাধা !
 আবারের এমন কাজ ! সে সকল জাটেনের কর্য । মাজেহান নিজের জন্ম
 নদীর বিপরীত তীরে আর এক তাজ তুল্য হর্ষ করিবার ইচ্ছা করেন । কিন্তু
 শীতলী পূজবিদ্রোহে পদচ্যুত ও বন্দী হইলেন ।

এতমর্দোলা ! নদীর অপর পারে প্রতিজ্ঞাতা যত্না অবলম্বন করিয়া
 গমন করিলে রাসমাগ জাগ্রত হওয়া যায় । রাসমাগ তাজ উত্তাপের অঙ্কুর
 মলে । ইহার মধ্যে খাজুর জাইন বা মাজেহানের পিতা মাসাফার হানসাক
 এতমর্দোলা করব । উল্লেখ্য, মাজেহানের পিতা মাসাফার হানসাক
 ৩০ হাত সমতাজের ও ৮ হাত উচ্চ হইয়া ১৭ স্তম্ভপতি চারিকোণে ২৩ হাত

উক্ত চারিটি স্তম্ভ, তাহার সম্মুখভাগে কবরস্থকির । গৃহীতী গোলাকার এবং উপরিভাগে অক্ষররূপে অলঙ্কিত । অভ্যন্তরে এতমার্কেল বিলীন আছেন । এখন লক্ষ্য করুন, স্তম্ভের আকৃতি ।

সেকেন্ডারী আকৃতির কবরস্থান । আশ্রয় ছইতে মথুরা পথ ৬ মাইল । পথদ্বারা কয়েকটি পোতাশালী স্তম্ভ, তাহার সম্মুখে এক অতি প্রকাণ্ড মরজা, আর ওপরে স্তম্ভ । আরেক চারিকোণে চারিটি স্তম্ভ, সম্মুখের স্তম্ভ-বরের সম্মুখের স্তম্ভ ছইয়াছে । স্তম্ভ উঠিবার সিঁড়ি আছে, কিন্তু ভেঙেছে, স্পর্শ স্থানিকের অসম্ভাব্য নাই । আর পার ছইলেই লেবু, আম, কলা, কুল ও অর্ধ-পুষ্টিত এক প্রশস্ত উদ্যান, তাহার তিন দিকে ভিন্ন ভিন্ন । মরজা এবং সম্মুখের স্তম্ভের অলঙ্কৃত কবর হইয়া থাকে থাকে উঠিয়াছে । চারিদিকের চারি মরজা ছইতে মেঘের ভার চারিটি পথ গিয়া হইয়া স্পর্শ করিয়াছে । এই পথের মধ্যে রমণীর পুষ্করী ও ফোয়ারা । পূর্বের মার্কেলবেদী সমস্তকোণে এতদিক দিকে ২৬৬ হস্ত । ইহার উপর ২০০ হস্ত সমস্তকোণ লালপ্রস্তরের হইয়া পাঁচ থাকে আর ৬৬ হস্ত উক্ত ছইয়াছে । এতদিক থাকের চতুর্দিকে খিলান করা বারান্দা, তদুপরি কলসজোঁড়ী বিবিধাকারে সজ্জিত ছইয়াছে । সমস্তই লাল-প্রস্তরের, কেবল মার্কেলপরিভাগের থাক যেতমার্কেলে নির্মিত । হইয়ামধ্যে ক্রিষ্ণ নিম্নগামী এক পথ দিয়া এক অন্ধকারময় খিলান করা গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, হামলী ভিত্তির দ্বারা আলোকে নাম যাত্রা আলোকিত । এ গৃহ মধ্যে আকবরের গম্ভীর কবর । বাহিরে আসিয়া তাইন-দিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি । ছইতে আকবরের পরিবারগণের আরও ছই এক কবর । সিঁড়ি দিয়া উপরে দোতলা ভেঙে পার ছইয়া মার্কেলপরি ভলে যেতমার্কেল নির্মিত চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর বেতন এক অমাবৃত ছাই, তাহাদের সম্মুখের প্রাচীরের পূর্ব ও পশ্চিমের ৯৯ নামনিশিষ্ট সিলেক্ট করের ঠিক উক্ত আকবরের কবরের অধিক । ছাইের চতুর্দিকে মার্কেল প্রাচীর জালকী করা ও অতি চমৎকাররূপে সজ্জিত । ইহাতে লালপ্রস্তরের সোপান টাংকী ছিল, আটেরা হরণ করিয়াছে । ছাইের এতদিক দোতলা জোড় জোড় মার্কেল স্তম্ভ এবং উপরিভাগে অর্ধ-পুষ্টিত কলস । সেকেন্ডারী অমতি দূরে আকবরের বেগম মেরান মাখক পোতাশীল গ্রীষ্ম

কবর । বিশ্রোহী সিপাহীরা অনেকাংশ নষ্ট করে । এখন কবরে বাইবার পথ বন্ধ আছে ।

আগরা হইতে ২৩ মাইনদূরে জয়পুরের পথে আকবরের কতেপুর নিকটীয় রাজবাগি । সম্রাট অধিকাংশ সময় এই স্থানে আতিবাহিত করিতেন । লোহিতবর্ণ বাজুকা প্রভৃতির এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকট এই মনোহর স্থান নির্মিত হইয়াছে । ইহার চারিদিক লোহিতবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীরে বেষ্টিত । তাহার বেড় প্রায় ৩০ ফুট । প্রবেশকালে এক প্রকাণ্ড মরজা, বামে ও দক্ষিণে সুবিশীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সকল দেখিয়া মন মুগ্ধ হয় । উপরে উঠিলে এক বিশীর্ণ সমচতুর্কোণ কেজ । চারিদিকেই সৌধমালা, ইহার এক দিকে আকবরের দরবার গৃহ । ৩০ ফুট ভ্রমণ করিতে বস্তু হইবে বলিয়া অনেকে এইস্থানে আহারের উদ্যোগ করিয়া লন । কিঞ্চিৎ দিলে সঙ্গে এক জম দর্শক যায় । অনন্তর প্রথমে সেলিম চেন্তির কবর । সেলিম এক জম ককীর । ইহার ভজনায় আকবরের সেলিম বা জেহাজির পুত্র হইয়াছিল । কতকগুলি সিঁড়ি উঠিয়া কবর গৃহের দরজা, কলস শীর্ষ সমন্বিত, এই দ্বার অতি বৃহৎ । কেবল কুর ৪৮ হাত ও কলস সহ দ্বার ৮০ হাত উচ্চ । প্রবেশ করিতে ডাইনদিকে আরবীতে লেখা আছে । জিস বলিরাহেন, সুখিবা সেতু রূপা, পার হও, যেন উপরে গৃহ করিও না । দ্বার পার হইলে ৩৩ হস্ত বিস্তৃত এক সমচতুর্কোণ কেজ, তাহার চারিদিকে ৩৩ হস্ত উচ্চ স্তম্ভমালা । বামে তিনতী মার্কেল গম্বুজবিশিষ্ট মনোহর মসজিদ, সম্মুখে ককীরের কবর গৃহ । স্বেতমার্কেলমণ্ডিত গৃহতী চারিদিকে ৩১ হাত, বহাছানে কবর । কবরের চারিপার্শ্বে খোদকারীপূর্ণ মার্কেল পর্কা, উপরের চতুর্ভুজ শক্তিমানিত, নিম্নভাগ সূর্য্যকাস্তমণিতে জড়িত, ভিত্তি সকল বহুদুলা প্রস্তরে বিচিত্রিত ও দ্বারে আবলুসকার্ত্ত স্থাপিত । মসজিদের দ্বারে দাঁড়াইলে দেখা যায় যে, কি অভ্যুতকণ্ড করিয়া পাহাড়ের উপর জল আসিত । সম্মুখে অতিদূরে ভরতপুরের মন্দিরের শীর্ষ সকল দৃষ্টিগোচর হয় । কবর গৃহের পার্শ্বেই সম্রাটের প্রাসাদ ছিল, এখন ভগ্নাবস্থা । দরবার গৃহের কিয়ৎংশ অবশিষ্ট আছে, তাহার এক পার্শ্বে একখান মার্কেল সিংহাসন দেখা যায় । তাহার পর আকবরের মজী ও সখা বীরবলের গৃহ । গৃহতী বিতল, বরঙলি ছোট ছোট কিন্তু

অবস্থার ধোঁবাকারিতে শূন্য । সন্ন্যাসীদের হৃদয়ের পার্শ্বে তাঁহার শ্যামসুখী কীর
 বর । ইহাতে কলৌষীরা নাহা মনি । এদের রক্তের কাঁচা স্রবস চিত্রিত
 আঁখির মত । অসামান্য হৃদয়ে হৃদয়ে গগণে মহাদেবের সাক্ষীর প্রতিমূর্তি ।
 কোমলকায় হৃদয়ে বীজের স্পন্দচিহ্ন আছে । নিকটে পাঁচবহনবা পড়িয়াছে ।
 সপ্তকুমোদ পদ্ম বৃক্ষ উত্তম পৌরিত শুভোপরি আছে সুসজ্জিত হইয়া বহুদূর
 উঠিয়াছে । অল্পের সততক খেলিবার চিত্রিত বর । আগনের কোণের নিকে
 কামিনীসদ খেলিবার খোলে কথাকার বর, কিছুদূর সে গয়ামখাস বা মকমল
 লুহরি । হৃদয়ী বাহির হইতে দেখিতে যেন বিতম । প্রতি কোমে এক একটী
 কলম । কিন্তু আবেশ করিয়া কেবা যায় যে, একটী একতলা বর জানালা লর-
 উর শুভোপরি লহয়ালিত হইয়াছে । শুভমসুখ উত্তমরূপ ধোমিত ও শুভা-
 পোকা তিন জনে বিভূত । ইহার সহিত যেতুর তার প্রস্তর পথ দ্বারা চারি-
 দিকের চারি বৃহৎ যোজিত আছে । আকবর সন্তের মধ্যস্থলে বসিতেম এবং
 প্রত্যক্ষ প্রধিক লোক চারিকোণে যমিয়া ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করি-
 তেন, কিন্তু বিদ্বৎক সঙ্গদেক সহিত উপবেশন করিতেন না । এজন্ত তাঁহার
 বিকিত ও স্তম্ভের উপর উচ্চকূট খোদিত প্রস্তরের চম্পাতশিখিট স্থান
 নিকটে নির্মিত হইয়াছে । ইহার কার্নিস সর্পাকার । নাম শুককামতী । অব-
 স্তর কনকটী উপবেশনের ছলতনিয়ার বর । ইহার প্রত্যেক ইকি বিবিধাকারে
 খোদিত, এবং অমর স্থান কাক নাই যেখানে কোন রূপ না কোন রূপ বুদ্ধ-
 নভাকিচিত্রিত হইয়াছে । ভাস্করগণকে কতরূপ কপনাই করিতে হইয়াছিল ।
 শাখর স্থানি বেলে পাথর । অমস্তর ভগ্নপূরিত চাঁকশালের চতুর্কোণ কেন্দ্র ।
 তামস্তর ২০০ যোড়ার প্রস্তর নির্মিত ভাণ্ডা ও লৌহ কড়াযুক্ত লালপ্রস্তরের
 অবলম্বা । কীরতলের দ্বারিক উত্তরে হাতী বরওয়াজা, আকবর হুর্গ নির্মাণ
 ইচ্ছা করিয়া এই করজা পাতন করেন । ইহার অন্তকোণ কুজবর প্রতি
 দিকচাকার, দুই পার্শ্বে বেনীর উপর শুভভাঙ্গা প্রস্তরের দুই একাও হস্তী ।
 অমস্তর দুইটী উদ্যানের মধ্য দিয়া একে এক উচ্চ শিখা । পার্শ্বে দাঁকে বহুকে
 ভাঙ্গা কটর তাহার পরি আদুবার প্রস্তরের হস্তীসদে বিভূষিত এক বৃহৎ
 হস্তীস্তম । আকবর বহু ভাব করিয়া এই সকল হুর্গ প্রস্তুত করেন । কিন্তু যে
 ককীর আকবরের সম্ভানের জন্ত দ্বারের নিকট আর্পণ করিয়াছিল, সে আপ-

নার ভজন স্থানে গোলযোগ দেখিয়া এক দিন আকবরকে কহিল, হর কুমি স্থান পরিত্যাগ কর, নর আমি স্থান পরিত্যাগ করি। ককীরের কুটীরের কাছে রাজবাটীর গোল কেন! আকবর বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, বকি বিকটে না ভাবেন, তবে এই কুতাই স্থান ত্যাগ করিতেছে। এই বলিয়া তিনি আগরা নির্দাণ করিলেন। তদবধি কুতেশ্বর পরিত্যক্ত হইল। আগ্রার সাদা পাথরের উৎকৃষ্ট জব্যাদি, ভরতপুরের আমদানী পাথরের মানা দেবমূর্তি, উৎকৃষ্ট সতরঞ্চ বা দড়ি, লোমজব্বত্র শুড়শুড়ির নল, আম ও শিশুকাঠের জিনিস, চুড়ী, উত্তম জাক, বারান্দী, ভরবুজ, ডালভাজা ও কালাকন্দ বা বরকী, নকলদানা পাওয়া যায়। আগ্রা অঞ্চলে ছাগ উষ্ট্রাদির সকল হৃৎ একত্রে দোহন করে এজত সাংঘবান হইয়া শ্রিদ করা উচিত।

আগরার পরে ভরতপুর। উর্করা কেন্দ্র ও হুন্দর বনরাজি দেখিত ভরতপুর। চতুর্দিকে মৃত্তিকা প্রাচীর ও পরিখা। নগরের অভ্যন্তরে পাকা কেল্লা, পরিখা এত বিস্তৃত যে একটী ক্ষুদ্র নদী বলিয়া বোধ হয়। তথ্যে রাজবাটী, ৮ কোশ দূরে রাজার হুপ্রসিদ্ধ ডিগের উদ্ভান, লম্বে ৩১৬ ও প্রস্থে ২৩৩ হাত। উদ্ভান মধ্যে একটী অষ্টকোণ পুক-
রী, তাহার ৪ দিক হইতে চারিটী পথ চারি প্রাসাদে গিয়াছে। সে
গুলি ভরতপুরের বালিজাত অতি উৎকৃষ্ট বালুকা প্রস্তরে নির্মিত, ইহার
নির্মাণ প্রাণালী এত উৎকৃষ্ট যে ভারতে এরূপ নির্মাণ কোশল অতি
অল্প আছে। উদ্ভানের গোপালভবন অতি শোভাকর, আগরা তন্ন
করিয়া এই গোপাল ভবন নির্মিত হইয়াছে, কোরারার সৌন্দর্য অত্যন্ত
অধিক, বৎস্র ভবনের দ্বার, শুভপ্রকৃতি নানা স্থান হইতে উৎস উঠি-
তেছে। উহার জল উঠিবার প্রথা এরূপ চমৎকার যে তত্পরি সূর্য-
রশ্মি পতিত হইয়া গৃহ মধ্যে ছই ইন্দ্রধনুকের আবির্ভাব হইয়াছে।
রাজার এক প্রাসাদের উপর কৃত্রিম পুকুরিণী আছে, প্রীতকালে সেই স্থান
অতি শীতল থাকে। হুপ্রসিদ্ধ ভরতপুরের ফেরা নগরের দক্ষিণে এক
দিনের পথে বর্তমান আছে। প্রকাণ্ড পর্বতোপরি অতি সুদৃঢ় কেল্লা।
অভ্যন্তরে পতীর কুণ্ড ও খোদিত প্রাচীর প্রভৃতি। গৃহের এক ভবন

হস্তের অক্ষুণ্ণ চিত্র, বার-বার উদ্ভব করিয়া ইংরাজেরা এই দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই । পরে ১৮৫৬ অব্দে অধিকার করেন ।

“ভরতপুরের বিরুদ্ধে জয়পুর । দক্ষিণ-বাঙালি তিনটিকে শাহাড, মধ্যস্থল-বালুকাধর, চারিদিকে শাকী প্রাচীর, ইহার অভ্যন্তরে তিন মাইল দূর্য্য ও দৈর্ঘ্য মাইল প্রশস্ত সহর, জয়পুরের দুর্গা শৃঙ্খলাবদ্ধ নগর অতি অল্প দেখা যায় । শব্দ সকল প্রশস্ত ও সম্পূর্ণ রূপ সরল, শব্দ প্রাচীর-গৃহ সকলের প্রাচীর এক রেখায় সম্মিলিত আছে । সৌধসমূহ বিভিন্ন রকম ও স্বর্ণবর্ণ কসমে বিভূষিত । কেহ কেহ বলেন, জয়সিংহ নগর পতনের পূর্বে এক জন ইটালীর কর্মকার দ্বারা রথাদি প্রস্তুত করান, তাহার পর অধিবাসিরা সেই ঘাটে গৃহ নির্মাণ করিয়াছে । এই জন্ত সর্ববিভাগই দেখিতে এরূপ সুদৃশ্য । রাজবাটী আর সহরের চতুর্থাংশ ব্যাপ্ত করিয়াছে । ইহার মধ্যস্থ উত্তান ফোয়ারা গোবিন্দজির মন্দির ও বাজার ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ অভ্যন্তর সমীপ । জয়পুরের দোকান সকল উত্তম রূপে সুসজ্জিত । কিন্তু দোকানের পার্শ্বে বিস্তর পাররা চলিয়া থাকে । বর্ষায় এখানে বালুকা বনতঃ কিছুদূর কর্দম হয় না । কিন্তু গ্রীষ্মকালে দ্রুত গ্রীষ্ম ও পথের উত্তম বালুকাতে গমনাগমন আর বন্ধ হয় । এখানে বেতপাথরের জবা, চিত্রপট, স্বর্ণমোহর অতি উৎকৃষ্ট পাওয়া যায় । এখানকার লোকে উচ্ছিন্ন ভোজন পাত্রাদি জলে ধোঁত না করিয়া শুক বালিতে ধোঁজিয়া কাড়িয়া ফেলে, ব্রাহ্মণভোজনাদি রাজপথে হইয়া থাকে । জয়পুরের বাজার বার্ষিক আর ৮-৫ লক্ষটাকা, ইহার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ টাকা জায়গীর ও কৃষক সেবার ব্যয়িত হয় । আরাংজেবের দৌরাওয়া সময়ে স্বাধীনতার গোবিন্দজী এখানে আনীত হন । এখানকার জৈন মন্দির সকলও উৎকৃষ্ট । জয়পুরের ৩ মাইল অগ্নিকোণে সুন্দর মন্দির ও সুন্দারি আছে, চারি মাইল দূরে প্রাচীন রাজধানী ও বান্য রজের কাছে শাকী শোভিত রাজার শীল মন্দির । নিকটে কেলার অভ্যন্তরে শীল মাঠে কতকগুলি খাত আছে, উহার মধ্যে বিশেষ দোষীদিগকে কষ্ট ও লম্বাভাঙ্গ জল দেওয়া হয় । ইহার অপরূপ বলিতে অতি অল্প লোক বাহির হইয়াছে । কেলার মধ্যে কি ইংরেজ কি অপর কেহই বাইতে

পার না, ৭৫ মাইল অধিকোণে বিখ্যাত রিভাঘোয়ের কেল।। যেখানে
হাথারে চৌহান আলাউদ্দিন সহ যুদ্ধের বশ্যী হন এবং রাজপুত রাণীর
জলন্ত চিত্তর আগজাগ করেন। জয়পুরই বিখ্যাত মৎস্যক্ষেত্র। জয়-
পুরের ৫০/৫৫ মাইল উত্তর পূর্বে ও দিগির ৪০ কোশ দৈর্ঘ্যকোণে আটান
বিরাট নগর, তথায় পাণ্ডপর্বত ভীমঙ্কর ও কিছুদূরে অশোকের স্তম্ভ
আছে। পর্বত হইতে বড় বড় পাথর খনিয়া পড়িয়াছে এবং এতদ্বারা
এক প্রস্তরে অশোকের আজাদিগি খোদিত, ভীমঙ্কর বেড় ৪০ হাত
ও উচ্চতা ১০ হাত। জয়পুর হইতে ডাইনদিকে এক রেল সাধর হ্রদে ও
দক্ষিণদিকে এক রেল কুঙ্গগড় হইয়া আজমীর গিয়াছে। আজমীর পর্বত-
পার্শ্বে সংস্থিত। কিন্তু উপত্যকা ভূমি প্রাপ্ত হ্রদ পুষ্করিণী ও অবশ্য
তৈলুলাদি বৃক্ষের হরিত শোভায় শোভিত, এখানকার ভ্রূর্গ অতি বৃহৎ,
তদ্বাধ্য প্রস্তর নির্মিত মৈউকীনের কবর। কবরগৃহ পূর্বে জৈনমন্দির
ছিল। আজমীরের ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে প্রসিদ্ধ পুষ্কর তীর্থ, জয়-
পুরিত পুষ্কর নগর পুষ্কর হ্রদের তীরে অবস্থিত, হ্রদটী বিকসিত, পাথরপোতার
শোভায় অতি রমণীয়, তীরে ব্রহ্মার মন্দির, পূর্বতের উপর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ
ও মধ্যম পুষ্করাদি স্থানে আছে, কিন্তু সরস্বতী নদী প্রবাহিত নাই, এখান-
কার আকাশ সিরাজের আকাশ তুল্য বহৎ ও মধুর। আজমীর হইতে নদী-
রাবাদ, এখান হইতে রাজপুতানার অপরাপর স্থানে যাওয়া চলে, উদয়-
পুরের নাথদোরার সেবা অতি প্রসিদ্ধ, এই বিএক বুন্দাবনের তিন প্রসিদ্ধ
বিগ্রহের মধ্যে আর একটী।

রাজপুতানা দেখিতে ইচ্ছা না হইলে আগরা টুণ্ডলায় ফিরিবে। তাহার
পর হাটোত্রস জংসন, রায়ে মধুরার রেল। মন্দির ও ষাট সম্বিত মধুরা
বসুনার ডাইন তটে অবস্থিত। ৩ কোশ দূরে বুন্দাবন ও বসুনা, হাটো
গোহুল, গোহুলকে পদ্মের কর্ণিকা করিয়া পুবাণে চারিদিকের বিখ্যাত স্থান
সকল বিস্তৃত হইয়াছে। অধিকোণে বিস্তীর্ণ দলে রিত্তকক, পূর্বদিকে
তৃতীয়াংশে শতগজাসম ভীর্থ, ইখানে চতুর্থদলে বত্রহরণ, উত্তরে পঞ্চম-
দলে স্বাদশদিত্য স্থান, রাহুতে ষষ্ঠদলে কালীহ্রদ, পশ্চিমে সপ্তমদলে
অম্বাহুর নির্বাণ ও ব্রহ্মদেহন এবং ঐশ্বর্যতে অষ্টমদলে শতচতুর্ভুজ স্থান

হুলাবন । তৎপরে ঐকপা ক্রমে আর বোড়শবনের প্রথমদলে যধুবন, দ্বিতীয়ে
খদিয়াবন, তৃতীয়ে গোবর্দ্ধন, চতুর্থে কনকখন্ডী, পঞ্চমে নন্দীঘর, ষষ্ঠে
নন্দবন, সপ্তমে বনকারণ্য, অষ্টমে তালবন, নবমে কুমুদবন, দশমে কাশ্য-
বন, একাদশে সেনকুবর নির্ঝণ, দ্বাদশে ভাণ্ডীর, ত্রয়োদশে ভদ্রবন, চতুর্দশে
ক্লিষ্টবন, পঞ্চদশে লোহবন ও ষোড়শে মহাবন । ইহাতে দেখিতে পাওয়া
যাইবে যে, ভদ্র, ক্লি, লোহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন যমুনার পূর্বকূলে ও তাল,
খদিয়া, কনক, কুমুদ, কাশ্য, যধু ও হুলাবন পশ্চিমকূলে অবস্থিত । এতদ্ব্যতীত
দ্বাদশ উপবন, দ্বাদশ প্রতিবন ও দ্বাদশ অধিবন আছে ।

সায়রা চারিদিকে হুলাবনের শোভা দেখিতে লাগিলাম । নানা
বিহুক নানা ছানি ভ্রমণ করিতে লাগিলাম । আর সে গোশাল নাই,
আর সে রাশাল নাই, আর সে রাই অভিসারে দার না, আর কেহ রাধা
রাধা বলিয়াও ডাকে না । কিন্তু সেই গোবর্দ্ধন, সেই যমুনা, সেই বনস্থান
এখনও আছে । কোকিলের কলরব, জয়ের গুঞ্জ ও ময়ূরের নৃত্য এখনও
হুলাবন পোড়িত করিয়াছে । মন্দির ঘাটে যমুনাতীর আকীর্ণ । চারি-
দিকে কুঙ্করুণ, চারিদিকে কুঙ্কমাখ, গায়ে কুঙ্ক, বস্ত্রে কুঙ্ক, লোকে বলে কুঙ্ক
কুঙ্ক । মধ্যে মধ্যে জয় রাধারানী শব্দে গগন বিস্তারিত হইতেছে । পদে
পদে-বিকুঙ্কশোভা ।

বত দেখি বত বাই, কিরে কিরে পুনঃ চাই, ✓

মব নব তাব বেন বিকসিত ছার রে ।

বারে বারে মনে করি, একি সেই মধুগুরী,

যাহার বর্ণনে বাস উদ্বত্তের প্রায় রে । ৮

পূর্বে এই গুরী যধুবন নামে খ্যাত ছিল । ক্রমে এই বনে কিছুকাল
তপস্বী করিয়াছিল । তাহার পর মধু মৈত্রেয় বাস করিয়াছিল, শঙ্কর
ভট্টাচার্য্যকে বধ করিয়া মধুরী নগর নির্মাণ করেন । কালে এই নগরী উগ্র-
সেনের হস্তগত হয় । উগ্রসেনকে পদদ্ব্যুত্ত করিয়া কংস রাজা প্রাণ হন ।
কংসকে কুঙ্ক বধ করিয়া পুনরায় উগ্রসেনকে লিংহাসন দান করিয়াছিলেন ।
জয়নন্দ ভট্টাকর বীরবাহুর মধুরী আক্রমণ করিত, মাঠ সকল শব্দময় ও
ইজ্ঞাপন বলিয়া থাকে । কেরোজের কোটিল হইতে হুলাবনের কবর

প্রাচীর ভয় করিয়াছিল। কংসের সময় কৃষ্ণ ব্রজনিবাসে বাস করিতেন। ব্রজনিবাসের উত্তর এককোশ বিকশিত হইল। তাহার পরেই সম্পূর্ণরূপে কালীর ভ্রম, গোবর্দ্ধনের প্রকাণ্ড ভাণ্ডারবট বর্ষার নীল অঙ্কন ও কদম্ব-শোভিত যমুনা ছিল ও গোবর্দ্ধনের উত্তরে যমুনাভীরে তালবন ছিল। কাষ্ঠ ও কৃষ্ণবহন হুন্দাবনের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও প্রস্তর গুটিকানি শূন্য দেখিয়া কৃষ্ণ তথায় গোষ্ঠারূপ করিতেন। যমুনার কংসবধ হইলে ভরাসঙ্কর সাহিত তাঁহাকে বারবার বৃদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শেষে প্রাচীরাদি ভয় হইলে কিছুকাল তিনি যমুনা ত্যাগ করিয়া যান। কৃষ্ণযুদ্ধের পর যমুনার কৃষ্ণ-বংশীরেরা রাজ্য করিয়াছিল, এখন যমুনা অপসৃত হওয়ার কালীর ভ্রম ভূমি মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বৌদ্ধ আহার এখানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় যমুনার প্রাচীন দুর্গের ১ মাইল পশ্চিমে কাঠরায় ও কাঠরায় তিন মাইল দক্ষিণ পূর্বে বৌদ্ধদিগের মন্দির ও বিহার ছিল। ৪০০ খৃঃ অব্দে কাহিরান তিন সহস্র বৌদ্ধপূর্ণ ২০ বিহার ও ৬৩৪ খৃঃ অব্দে হোরান-ধর্ম ২ সহস্র বৌদ্ধ দেখেন। তৎকালে ব্রাহ্মণদের পাঁচ ও বৌদ্ধদের ৭ প্রধান মন্দির ছিল। ১০১৭ অব্দে মহম্মদ গজনি আসিয়া বিশাল মন্দির শোভা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হন। কিন্তু হুন্দাবা মুসলমান বিশদিন যমুনা লুণ্ঠন করিয়াছিল, যবনেরা মাণিক্যের চক্ষুযুক্ত পাঁচটী স্বর্ণবিগ্রহ ও একখণ্ড ১৮০ সের নীলকান্তমণি জড়িত আর এক প্রকাণ্ড স্বর্ণমূর্তি এবং ১০৮ উষ্ট্রের উপর ১০৮ রৌপ্যমূর্তি লইয়া যায়। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন গজনি যমুনার অনংখা স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। গজনির পত্নবর্তী মুসলমানেরা যমুনার মন্দির সকল চূর্ণিত করে। কাঠ-রায় কেশব রায়ের মন্দির বলিয়া এখনও একটান কিরদংশ বর্তমান আছে। আরংজেব এই মন্দিরে জফারজাদ স্থাপন করিয়াছিল। ইহার গাভের প্রস্তর ১৭২০ সনৎ পর্যন্ত সন্ধ্যাটের নাম খোদিত আছে। অতএব অন্ততঃ ৫ বর্ষকাল আরংজেবের রাজ্য সময়েও এই মন্দির হিন্দুদিগের দেবালয় ছিল। তাহার পর মসজিদ হয়। কিন্তু গজনির পর হইতে যমুনা ও হুন্দাবনের দূরবর্তী আরম্ভ হইয়াছিল। অনেক স্থান জগদময় হয়, গোবর্দ্ধ ও রূপ সনাতন অবের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের

নগর মথুরা ও বৃন্দাবন একবারে চিহ্ন ছীন হয় নাই, ঘোড়ীদের সময়েও স্নেহে বীতিমতে ভীর্ণ করিয়াছিল। গৌরীদের অঙ্গকাল পূর্বে মন্দির সকল ভূষিত হয়। ঘোড়ের সমস্তই স্বরণ ছিল, এখনও স্নেহে বোধশিখা স্নানার্থে গৌরীদের স্নান আনন্দটিয়া ও মিনারকটিয়া বলিয়া দেখাইয়া দেয়া। গৌরীদের উৎসাহে গোবিন্দজী মদনমোহন ও গোপীনাথের মূর্তি সংস্থাপিত হয়। আকবরের সময়ে মানসিংহ মথুরা ও বৃন্দাবন-বৈষ্ণব-মন্দির শোভা সম্পাদন করেন। জয়সিংহ মথুরাতে এক মানসিংহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ক্ষতিবৃত্ত বামোত্তর ভিত্তিযন্ত্র, বাড়ীদিল ও অগ্রযন্ত্রাদি সকল ভগ্ন প্রায়। এই সময়েই হুশিয়াত তানসেন ও তাহার গুরু হরিদাস এই স্থানে বসিয়া কুললীলা গান করিতেন। আকবর বৃন্দাবনে আসিয়া তানসেনকে সঙ্গে লইয়া যান, আকবরের সময়ে মথুরা ও বৃন্দাবনের যে সকল উন্নতি হইয়াছিল আরংজেবের সময় তাহার অধিকাংশ বিনষ্ট হয়, এই সময়ের রাজ্যকালেই গৌরাদ সম্প্রদায় স্থাপিত প্রায় প্রধান বিগ্রহ রাজপুতানার চলিয়া যায়। আরংজেবের মৃত্যুর পর মথুরাভীরকালে সিদ্ধিরা, জয়পুর ও রাজপুতানা প্রবল হইলে পুনরায় মথুরা শোভিত হইল। বৈরাগী, বানর ও ব্রজমাযী পূবিত বৃন্দাবনে সতত কোলাহল হইতেছে। বর্তমান বিগ্রহের মধ্যে গোবিন্দজী, মদনমোহন গোপীনাথ এই কয়েকটি প্রধান, গোবিন্দজীর গৃহে প্রবেশ করিবার তিনটী খিলাস ও সন্ধ্যা বারান্দা, অভ্যন্তরে বনাতের লালকানাৎ খুলিতেছে, হুইদিকে হুইট পিতলের সামান্য। মূর্তিটী হুন্দর, বামে রাধিকা ও দক্ষিণে ললিতা। গোপীনাথ মূর্তি গোবিন্দজীর তুল্য উৎকৃষ্ট নহে। এখানে গোবিন্দজী দর্শনকালে যে ভেট দিতে হয় আর হুই বাড়িতে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনে বিস্তর রাজার মন্দির ও দানশালা আছে। মথুরা বৃন্দাবনের অপরায়ণ কীর্তির মধ্যে শেঠেনের মন্দিরাদি দেখিবার যোগ্য, বৃন্দাবনে অধ্যাদি হলত কিন্তু কুজওয়ারা দালালী লয় বলিয়া কুজের নাম করিয়া মাত্র অধিক মূল্য লয়। বৃন্দাবনের রাবড়ী, গোড়া, গুরুদাসাদি বৃন্দাবন বিবিধ অর্য, ছোলা ডাঙ্গা, পিতলের দোটা, কুজপুরী লোকরূত ছাপা কাপড়, হুন্দরী প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

তদনন্তর আলিগড় জংসন। এখানকার অধিবাসীরা একপেে ভুলার ব্যবসারে রত। আলীগড়ের কেল্লা মহারাষ্ট্রীদের সময় দৃঢ় ছিল। এখানকার মাটির সরাই বা জলের কুজা ও সতরক বন্দ নহে।

দিল্লী। আলিগড় পার হইয়া দিল্লী প্রবেশ করিতে যমুনার দ্বিতীয় আশ্চর্য্য সেতু। ষাদশ খণ্ডের মধ্য দিয়া বাসুকাপুরিত যমুনা বিহীনভাবে প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেকখণ্ড ১৩৬ হস্ত বিস্তৃত। পুলের উত্তর পার্শ্বে জাকরী, সর্কানিলে নদী, তত্পারি' লোক ও তত্পারি দিয়া রেলগাড়ী চলিতেছে। প্রথমেই সেলিম গড়ের কেল্লা। হুধারের প্রাণ্ড ও কাণ্ড দেখিয়া ঐশ্ব্য হয় যেন সভা সভাই কোন মহানগরীতে প্রবেশ করিতেছি। তদনন্তর দিল্লী নগর। দিল্লী কতবার কতস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমান সহরের নাম নয় বা নূতন দিল্লী। দুই শত বর্ষ হইল সাজেহান এই নগর স্থাপন করিয়াছেন, ইহার চতুর্দিকে লোহিত প্রস্তরের প্রাচীর বেষ্টিত, তাহার বেড় প্রায় ৫১০ মাইল, প্রাচীরের উপর তীর নিক্ষেপের জন্য কাটা কাটা ফাক। নগর প্রবেশের একপেে দশটী মাত্র দ্বার আছে। তন্মধ্যে কলিকাতা, কাশ্মীর, মোরী, লাহোর ও দিল্লী এই পাঁচটী প্রধান। উত্তর পূর্বে মালিমগড় বা কলিকাতা উত্তরে কাশ্মীর ও মোরী, পশ্চিমে কাবুল ও লাহোর, দক্ষিণ পশ্চিমে করাস ও আজমীর, দক্ষিণে তুর্কিস্তান ও দিল্লী ও পূর্বে যমুনাদিকে রাজঘাট এই দশটী ক্রমান্বয়ে আছে। নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে নানা সময়ের স্থাপিত পূর্ব দিল্লী সমূহের ভগ্নাবশেষ ক্রমাগত দশ মাইল চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান সহরের ফেরোজসহরে কোটিলার নিকট এই ভগ্নাবশেষের উত্তর প্রান্ত তিন মাইল ও কেল্লা রায়পিথোর হইতে ভোগল-কাবাদ পর্বাত ইহার দক্ষিণ প্রান্তের বিস্তার ৬ মাইল। এই ৪৫ বর্গ মাইল জুড়িয়া নানা সময়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। দিল্লী বহুকাল ভারতের রাজধানী ছিল, কতবার শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইরাছে ও কতবার হংস হইয়াছে, শত্রু কর্তৃক প্রাচীন সহর বিনষ্ট হইলে কোন সম্রাটের উৎকৃষ্টতর সহর নির্মাণ ইচ্ছা হইলে প্রাচীন সহরের স্থান পারিত্যক্ত হইত। এইরূপে রায় পিথোর হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে বর্তমান সহর, সর্বপ্রাচীন সহরের ১০ মাইল দূরে পড়িয়াছে। বর্তমান সহরের সর্ব প্রাচীন রাস্তার

নাম তাঁকনী চৌক । রাজ্যের দুই পার্শ্বে বিস্তর নোকান, শুভকৃতীর মন, গিণ্টী কলনী, জরীর কুশি, ও কপড়খি বিক্রয় করিতেছে । রাজ্যাদি সমস্ত কোশ পূর্ব পশ্চিমের লম্বা ৮০ হাত বিস্তৃত, পরিষ্কৃত, সুরক্ষিত এবং উত্তর পার্শ্বে ককাদি দ্বারা শোভিত । দিল্লীর পূর্বপ্রান্ত হিত যমুনাতীরে সত্যাতের বাজীর পশ্চিম-বারে আনন্দ হইয়া নগরের ঠিক কথা দিয়া পশ্চিমদিকস্থ লাহোরী দরওয়াজার আগিয়া এই রাজ্য শেষ হইয়াছে । এই পথেই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দিল্লী ইনজিউরিট নামে বিদ্যালয় আছে । এই পথেই সেই কোতো-জামি, যেখানে গবর্ণমেন্ট নগর অধিকার করিয়া বিজোহীগণকে বধ করেন । ইহারই নিকটে সেই তরাসক মসজীদ, যেখানে মণ্ডাযমান হইয়া ১৭৩৮ খ্রঃ-নাগীর সাহা নগর লুণ্ঠনে আদেশ করিলে একদিনে বধ্যমান লক্ষ নগরবাসীর আশ্রয়ভাগ কালীন চীৎকার শব্দে দিল্লীতে আকাশ বিচ্ছারিত হইতে লাগিল । এইরূপ হত্যা করিয়া মাজীর মদুর সিংহাসন লইয়া প্রস্থান করেন । ইহারই সম্মুখে বহারাগীর বাগান । কাশীর দরজা হইতে উত্তর দিকিণে লম্বা আর এক রাজ্য । দ্বারা দিল্লী সহর পূর্ব পশ্চিমভাগে বিভক্ত হইয়াছে । এই রাজ্যের পার্শ্বে কর্ণেল কিনির গির্জা নির্মাণ করিয়াছেন । ইহারই সম্মুখানে গবর্ণমেন্টের শিলাখানা বা অস্ত্রাগার ছিল । পাছে বাকদ ও অস্ত্রাগার বিজোহীর হস্তে পতিত হয় এই তরে ১৮৫৭ অব্দে লেপ্টেনেন্ট উইলসন ইহাতে অগ্নি প্রদান করেন ।

রাজবাড়ী বা হুগ । যমুনাকূলে এক মাইল বিস্তীর্ণ তিন দিকে লোহিত প্রান্তরের প্রাচীর, বেড় ১১০ মাইল, উচ্চতা ২৬ হস্ত উপরিভাগ শীর্ষ ও কলসে শোভিত । দুইটী প্রাঙ্গণ দ্বার আছে, লাহোর ও দিল্লী । পরপারে সেলিম গড়ের কোলা, এই দুয়ের সহিত এক সমীর্ণ সেতু সংযোজিত আছে । আদিবা লাহোর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম । সম্মুখে এক বিশাল চুড়ার বিশেষ এক প্রাঙ্গণ দ্বার । তাহার পর খিলানে আবৃত এক পথ বরাবর চলিয়া গিয়াছে । তাহার মধ্যে একটী অভ্যেক্ষণ গৃহ । জিজ্ঞাসিল সকল লালসেবের প্রস্তরবিত্ত, তখনকার এক দ্বিতীর্ণ প্রাঙ্গণ, চারিদিকে প্রস্তর দ্বারা এবং সম্মুখে দেওয়ান গার বা লক্ষ সিংহাসী, দেওয়ান গার অতি প্রশস্ত, তিনদিক চতুর্দাল । মধ্যে সোঁহিত প্রস্তর স্তম্ভ ত্রয়ী, পূর্বের স্তম্ভভাগ হৃদয়রূপে নির্মিত

ছিল । এখন ইংলণ্ডের দের হাতে চূর্ণ হারা আঁতুত হইরাছে । দেওয়ান আম
 মধ্যে জিত্তি গায়ে দশকিষ্ট উচ্চ সিংহাসন স্থান । তন্নিম্নে সিঁড়ি, উপরে প্রস্ত-
 বের চক্রাতপ । চক্রাতপের চারি প্রান্তে বেষ্ট বার্কেনের স্তম্ভের উপর
 সংস্থাপিত । সমস্তই চিত্রিতের দ্বারা নানাবিধ প্রস্তর দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট
 সজ্জিত হইরাছে । সিংহাসনের পশ্চাতে একটা দরজা সত্ৰাট অস্তঃপুর হইতে
 ঐ দরজা দিয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিতেন । সিংহাসনের পার্শ্বস্থ ভিত্তি
 সকল নানাবিধ বহু মূল্য প্রস্তরদ্বারা শোভাশালী । পুষ্প, কল, পক্ষী ও
 পশুতে চিত্রিত হইরাছে । অধিকাংশই একগো নষ্ট প্রাণ । দিকটাই দেও-
 রান খাস বা মকঃবলকাহারি । অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বায়ে সংস্থাপিত । গৃহী
 সমচতুর্কোণ এবং ইহার স্তম্ভ ও সমচতুর্কোণ । স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট মিলান ।
 সমস্তই মার্বেল নির্মিত এবং ইহার মার্বেল অতি চাকচিক্যশালী । অধিক
 কাড় বুটাকাটা নাই বটে কিন্তু বাহা দুই একটা আছে তাহা অতি সুন্দর ।
 দেওয়ান খাসের এক দিকে প্রাক্কম অপর দিকে উচ্চান শোভা আর এক
 দিকে যমুনা ও অবশিষ্টদিক অস্তঃপুরের ভিত্তি সংলগ্ন । বাহিরের স্তম্ভগুলি
 অতি উৎকৃষ্টকণ খোদিত মার্বেল গরাদিয়ার সংযুক্ত, উপর ছাদে প্রত্যেক
 কোণে এক একটা মার্বেল শীর্ষ তত্পরি গিল্টি করা গম্বুজ । গৃহী মধ্যে ৪০
 হস্ত, পূর্বে উপরিভাগ স্বর্ণ ও রক্তবর জালে আবৃত ছিল । তন্নিম্নে স্নায়-
 সিক মন্দির সিংহাসন থাকিত । সিংহাসনের পশ্চাৎস্থ নানাবিধ রত্ন খচিত
 হইরা মন্দিরপুন্ডের দ্বারা শোভা দারণ করিত বলিয়া লোকে ইহাকে তক্ত
 তাউস বা মন্দিরসিংহাসন কহিত । মন্দির সিংহাসন সমস্তই নিকটে স্বর্ণ
 নির্মিত ছিল । লম্বে ৪ হাত ও প্রস্থে ২ হাত ১৬ অঙ্গুল । উপরে হাদশাটী
 স্বর্ণ স্তম্ভ । তত্পরি স্বর্ণের চক্রাতপ । চারিদিকে মন্দির আলার । কাশ-
 লাঐ সমস্তই বহুমূল্য রত্নে খচিত । দুই পার্শ্বে বজ্রমনিঘণ্ডিত দুই ছত্র
 সও, লম্বে ৫ হাত আট অঙ্গুল । ছত্রের আবরণ লোহিত বর্ণময় । তত্পরি
 স্বর্ণহস্ত ও মুক্তাজালের শোভা । আলোকের প্রভাবে ঐ সকল বস্ত্র
 হইতে নানা বর্ণের আভা বহির্গত হইরা মন্দির অপূর্ণ শোভা বিস্তার
 করিত । নূতন দিল্লী সংস্থাপক মাজেহাবের আজ্ঞা প্রমে অধিন ভি হোজা
 এই সিংহাসন প্রস্তুত করেন । বরাণসি জাহাঙ্গির টাকুরদিয়ার পরীক্ষা করিয়া

লিখিয়াছেন যে, মূল কপিপত্র ইহার মূল্য ৬ কোটি টাকা ছিল। নাজীরসাহ দিল্লী লুণ্ঠন কালে এই সিংহাসন, হুইরা বান, গৃহের সুবর্ণের চক্রাতপ ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে সম্রাটজীরদ্বারা লইয়া যায়, এবং গলাইয়া ফেলেন, তাহার মূল্য ৩৭ লক্ষ টাকা হইরাছিল। অস্ত্রপুর বেওয়ান খানের সহিত সংলগ্ন ছিল, এখন অতি অল্প অংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্য দিয়া হাওয়া বা স্বাভাবিকের পথ। স্বাভাবিক তিনটী প্রশস্ত গৃহ, তদুপরি মার্কেল গম্বুজ, সমস্ত মার্কেলের কাজ এবং তিন গৃহ মধ্যে তিনটী মার্কেল ফোরাম। তৎপরে বতিমসজিদ। স্কুত্র ও মার্কেলে স্থানান্তরিত, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংরেজেরা সত্ৰাটের আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। সমস্তই ভূমিসাৎ করিয়া সৈতদের গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন।

জমা মসজিদ। কেল্লায় অনতিদূরে সহর মধ্যে সংস্থিত, এই মসজিদ ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিখ্যাত। একটা পাহাড়ের চারি পার্শ্বে সিঁড়ি গাঁথিয়া একপা উঠিয়া ছইয়াছে যে পুর্বে যোঁতাহা পাহাড় ছিল ইহা বুঝিবার যো নাই। ক্রমশঃ উচ্চগামী এই বিস্তীর্ণ সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিলে এক প্রকাণ্ড দরজা, পূর্বদিকের এই দরজা দিয়া প্রবেশ মাত্র এক বিস্তীর্ণ প্রস্তরবণ্ডিত প্রাঙ্গন, এক এক দিকে তিন তিন শত হাত, মধ্যস্থলে এক মার্কেল চৌবাচ্চা, তিন দিকে খিলান সংযুক্ত স্তম্ভশ্রেণী, চারি কোণে চারিটী নগ্নবৎখানার মত অর্ধকোণ গৃহ, পশ্চিমদিকে মসজিদ, মসজিদগৃহ লম্বে ১৩৪ ও প্রস্থে ৮০ হাত, উপরে তিনটী উৎকৃষ্ট মার্কেল-নির্মিত গম্বুজোপরি নির্মিত করা তাম্রশীর্ষ, গৃহের সম্মুখভাগে কিয়দংশ খেত মার্কেলবণ্ডিত, কারবিস ১০ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ৬ হাত ১৬ অঙ্গুল লম্বা ও ১ হাত ৮ অঙ্গুল প্রশস্ত, তাহাতে কাল-মার্কেল বসান অক্ষরে লিখিত আছে যে, ১৬২০ খৃঃ অব্দে সাজেহান ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ বর্ষে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ খেত-মার্কেল টালিতে বস্তুত, প্রত্যেক টালি ২ হাত লম্বা ও ১ হাত চৌড়া, যুখে কাল-মার্কেলের পাড় থাকিতে অতি সুন্দর লাগিতেছে, ভিতরের ভিত্তির কতকটা শাদা-মার্কেলে আবৃত। কিবলা অর্থাৎ মক্কা প্রদর্শনকারী দিকে একটী সুন্দর তাক আছে, তাহার প্রস্তর শিলি এত সুন্দররূপে খোদিত ও সংযো-

জিত যেন বোণ হয় ৪ ফিট উচ্চ ও ৬ ফিট প্রশস্ত এক খণ্ড শাদা-মার্বেল কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। মসজীদের উত্তর পার্শ্বে খেত মার্বেল ও লোহিত-বালুকা প্রস্তর প্রাথিত ৮৬৯ হাত লম্বা দুই বিশাল স্তম্ভ আছে স্তম্ভের মাঝে ঠিক সম সম দূরে তিনটী খেত-মার্বেলের আবরণ দেওয়া বারান্দা, স্তম্ভের উষ্টিবার জন্ত সিঁড়ি স্তম্ভের মধ্য দিয়া আছে। ইহার উপর হইতে দূরে বহুবিধ সময়ের তয়াভয় হর্যাপূর্ণ দিল্লী দেখিতে যুগপৎ শোক ও আনন্দের উদয় হয়, প্রাতঃকালে সময়ে সময়ে বরকমণ্ডিত হিমালয়ের শীর্ষদেশের সামান্য আভাও দেখা যায়। মসজীদের সকল অংশেই লোকে গমনাগমন করে, কেবল উত্তর পশ্চিমাংশে সুন্দর মার্বেলের পর্দা দেওয়া কয়েকটী গৃহে মহম্মদের দাড়ির চুল প্রভৃতি ঐ প্রকারের কয়েকটী অর্ঘ্য থাকায় মুসলমানেরা যাইতে কিঞ্চিৎ আপত্তি করে।

কালামসজীদ। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ফেরোজ নির্মাণ করেন, গাঁধনি মোটা ও দস্তাল, নূতন দিল্লীর দেখিবার উপযুক্ত এই কয়েকটী বিষয় বর্ণিত হইল। এই নগর ৭ বার লুণ্ঠিত হয়। এবং সাতবার এই নগর ঘোর ঢাকার শব্দ করিতে করিতে জেতুগণের ভীষণ প্রবেশ দর্শন করিয়াছে। সাতবার শত্রুর সিংহনাদ, মহিলাগণের রোদনহানি ও বধ্যমান হতভাগ্যগণের চীৎকারে এই নগর অতিস্থানিত হইয়াছিল। পাহাড় ও ধমুনার মধ্যস্থলে নূতন দিল্লী। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে বিস্তীর্ণ খণ্ড-বের বন ছিল, যাহা অর্জুন ও ক্রুফ দ্বন্দ্ব করিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপর দিয়া এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। কাশ্মীর গেটের বাহিরে অনেক স্থান ইংরেজেরা পাহাড়ে তোপ রাখিয়া ভয় করিয়াছেন, তাহার পর পাহাড়ে উঠিতে বামদিকে দিল্লী দখলকারী সাহেবের কবর, তাহার পর লডলে ক্যাছল, যেখানে ২ মং ব্যাটারি বা কামান বসাইয়া ইংরেজেরা প্রাচীর তাজিয়া নগর প্রবেশের পথ করেন। আবু কিছু দূরে ডাইনদিকে মেটকা-কের ভয়পুরী, বামদিকে পাহাড়ের সর্বোচ্চ ভাগে ক্লাগ, কঁাকটীউর বা ইংরেজদিগের পতাকা মন্দির, এই স্থানে বিব্রোহকালে ইংরেজেরা অস্ত্র লইয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন মিরট হইতে সাহায্য পাইবেন। তাহার বিপরীত পাহাড়ের উপর মহারাজীর সেনাপতি হিন্দু-

রাজের উৎকর্ষ বাটী। ইহার বাটীর নিকটে একটা আশ্চর্য্য কূপ আছে, স্নিগ্ধি দিয়া তাহাতে নান্য বার। হিন্দুরাজার বাটীর নিকটে ছিরাট হইতে আনীত ২২ কুন্ত আশোক স্তম্ভ পাঁচ খণ্ড পড়িয়া আছে, বৃদ্ধকালে ইংরেজ-কেন্স ইনস্‌ট পাহাড়ের উত্তর ছাউনীতে ছিল, পাহাড়ের সমুখস্থ এই সকল বাঁটে দিল্লীর দরবার হইরাছিল, পাহাড়ের নানা স্থান খুজিয়া দেখিলে নান্য। বিবর দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁটে যে সমুদায় লহর দেখা যায়, ঐ লহর সমুদায় মধ্য দিয়া প্রবাহিত আছে।

অনন্তর প্রাচীন দিল্লী মহরের ভগ্নাবশেষ ও কুতব দেখিতে যাত্রা করিতে হইলে দিল্লী দরওয়াজা হইয়া দিল্লীভাগ সুবিধা। এক পথ দিল্লী হইতে দক্ষিণ পূর্ব মুখে হযাযুনের কবর ও তোগলকাবাদ হইয়া কুতব গিয়াছে। আর এক পথ দিল্লী হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে কুতব হইয়া তোগলকাবাদ গিয়াছে। কুতব হইতে তোগলকাবাদ ৫ মাইল পূর্ব। তাদা দিল্লী দরওয়াজা হইয়া দিল্লী ভাগ করিলে প্রথমে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর উপর একটা প্রস্তর-স্তম্ভ দেখা যায়। নাব ফেরোজ সার লাট, স্তম্ভটী লাল বাজুকা প্রস্তরের। পোর্টে লাভাইশ হাত উচ্চ ও গোড়ার বেড় প্রায় ৭ হাত ক্রমেকিছু সৰ্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। এটী প্রথমে দিল্লীর ৯ কোশ দূরে সমুদায় পশ্চিম তীরে পর্কতের নিকটে প্রায় বা বর্তমান পাওটী নামক স্থানে ছিল। ১৩৫৩ খৃঃ অব্দে ফেরোজ আনয়ন করেন। অশোক আপনার আজ্ঞা লিখিয়া এই সকল শিলাস্তম্ভ প্রোথিত করেন। শেষ হজে লিখিয়া-হেব। শিলাস্তম্ভে ও শিলাকলকে খোদিত আমার আজা ঘেন চির-স্থায় বিজ্ঞান থাকে। অকর ও তাহা পালি। অশোকের উপরে ও নিম্নে ১১৬৩ অব্দে চাহদাম হংশীর বিশালের জয় প্রকাশ আছে। নিম্নে নান্য সময়ের নান্য লোকের নাম। ১৫২৪ অব্দে নাগরীতে ইব্রাহিম লোদী নিজ বিবরণ লেখাইয়াছেন। স্তম্ভের পর দিল্লীর দুই মাইল দূরে প্রাচীন পার্শ্বকলিনের নির্মিত পুরাণ কেল্লা। প্রত্যেক কোশে এক এক গোষ্ঠাকার বুদ্ধক এবং প্রত্যেক দিকে এক এক দরওয়াজা। দরওয়াজার পার্শ্বে দুই দুই স্তম্ভ। তীর দিকের পের জন্ত তাহার মধ্যে মধ্যে ছিদ্র, ১৫৩৫ অব্দে হুমায়ুন ইহার সংস্কার করেন। এই স্থানের নাম ইক্সপ্রাস্ত, এখনও লোকে

পৰ্বাস্ত যমুনা তীরে ধর্মরাজের রাজধানী ছিল। কীৰ্ত্তক ষাণ্মাসিক্য পত্রিকার করিয়া স্বয়ং এই নগর পরিমাণ করেন। নূতন দিল্লীর কীৰ্ত্তক রেলওয়ে পুলের নিকট নিগমবেশ ঘাট। যেখানে ধর্মরাজ রাজহর বক্তকালে স্থান করিয়াছিলেন। এখন একটী মন্দির মাত্র আছে, সোম-বারে অমাবস্তা হইলে মেলা হইয়া থাকে। ফেরোজসাহ প্রাচীন ইল্ল-প্রশ্বে ফেরোজাবাদ নির্মাণ করেন এবং পাঠানের মুখির্ভিরের কেল্লার উপর কেল্লা নির্মাণ করে। তাহাই এই পুরাণ কেল্লা। যমুনা কালাঘরী হইতে হুমায়ূনের কালে পুরাণ কেল্লা ও ফেরোজের কোটিলার বিন্ন দিরা প্রবাহিত ছিল।

কেল্লা মধ্যে কিল্লাখানা মসজীদ ও সের মঞ্জিল। কিল্লাখানা মসজীদে গঠন ও খোদকারী চমৎকার। সের মঞ্জিল অতি উচ্চ অষ্টকোণ ও ত্রিভুজ বিশিষ্ট, আকবরের পিতা হুমায়ূনের পুস্তকালয় ছিল। এই স্থান হইতে পড়িয়া আঘাত পাওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার দেড় মাইল দক্ষিণে হুমায়ূনের কবর। কবর হুয়া এক উচ্চ প্রাঙ্গনের উপর নির্মিত। প্রাঙ্গন প্রতিদিকে ১৩৩ হাত লম্বা ও ১৬ হাত উচ্চ, প্রত্যেক পার্শ্বই খিলান বিশিষ্ট এবং উঠিবার জন্য চারিদিকে প্রস্তরের সিঁড়িতে শোভিত। কবর হুয়া ও বিলকণ প্রশস্ত প্রায় ৬৬ হস্ত সমচতুর্কোণ। ভিত্তি গাত্রে তিন প্রকাণ্ড খিলান, তন্মধ্যে মার্কেল লাল-প্রস্তরে সজ্জিত দ্বার ও জানালা। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর মার্কেল ও লাল-প্রস্তরের শোভা, উপরে এক প্রকাণ্ড মার্কেল-গম্বুজ, তন্নিম্নে গোলাকার গৃহ মধ্যে হুমায়ূনের শ্বেত-মার্কেল নির্মিত কবর। এই গর্ভ গৃহের পার্শ্বে চারিটী অষ্টকোণ গৃহ। এতন্মধ্যে সক্রাটের মন্ত্রীদ্বয় ও পরিবারগণের কবর আছে। ভিত্তির পার্শ্ব দিয়্য উপরে উঠিবার সিঁড়ি, উপর হইতে বহুদূর পৰ্বাস্ত নানাবিধ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহারই পার্শ্বে সের সার দিল্লী ছিল।

তদনন্তর আকবরকা সরাই নামক গ্রাম। প্রবেশ কালেই এমিদ ৬৪ খাঙ্গা নামক গৃহ, সমস্তই শ্বেত-মার্কেল নির্মিত। ৬৪টী উৎকৃষ্ট সমচতুর্কোণ খাঙ্গা আছে, তাহার মস্তক নানাবিধ খোদকারীতে পরিপূর্ণ, উপরে ২৫ খিলানা, তদুপরি উৎকৃষ্ট গম্বুজ, চারিদিকে মার্কেল ছিল এখন বিনষ্ট গ্রাম,

সুহৃদে মাৰ্কেলাস্‌স্মিৎ কতকগুলি কবর, ইহারই একটীর মধ্যে আক-
বরের শাসক-শিতা আত্মীয়াগণের পুত্র আজিত নিহিত আছে । কিছু দূর
পশ্চিমে আরও কতকগুলি কবর ও একটি ক্ষুদ্র পরিষ্কার মাৰ্কেল নির্মিত
মসজিদ, চারিদিকে স্তম্ভ জ্ঞেয়, খোদকারী-পূর্ণ খিলান, শীর্ষদেশে মাৰ্কেল
গম্বুজ । ইহার মধ্যে মাজীমউদ্দীন নিহিত, মাজীম চতুর্দশ শতাব্দীতে
একজন সিদ্ধ কবীর ছিলেন, এখানও মুসলমান যাত্রীরা কবর দর্শন করে ।
ইহারই নিকটে খেত-মাৰ্কেল নির্মিত আর একটি উৎকৃষ্ট কবর গৃহ, দ্বিতীয়
আকবর যথাসম্বল ব্যয় করিয়া অগুজ জেহাদিরের ১৮৩২ অব্দে এই কবর
নিৰ্মাণ করেন । বিরোধহুচনা করাতে ব্রিটিশগণেরমেষ্টে ইহাকে নির্বাসিত
করিয়াছিলেন । এই স্থানেই বাগবাহার লেখক থসকর কবর আছে । ১৩৫৩
অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, নিকটে মাৰ্কেল পর্দা বেষ্টিত আরও অনেক কবর,
একটীতে লিখিত আছে এই তুমি হুতিকাঈ জয়হুতখিনী, অনিত্যদেহা বীষ্টি-
শিখা সাজেহান কহা জেহানার উপযুক্ত কবরাবরণ । জেহানার উদ্দেশ্যে
খেই দিল্লীর জমামসজীদ হয়, এবং সাজেহান কারাকহ হইলে পিতার
শুশ্রূষা জহা জেহানারও অরং কারাগার গমন করে । শুনা যায় সাজে-
হানের মৃত্যুর পর হুতিকা আরজেব এ নিরীহাকেও বিবদান করে । এই
কবরস্থানের সন্নিকটে ৬০০ বর্ষ পূর্বের তোগলক নির্মিত মসজিদ, লোহিত
প্রস্তরময় উপরে এক গম্বুজ, তহুপরি আরবী লিখিত, ইহার নিকটে এক
প্রকাণ্ড বাউলী বা কূপ প্রায় ৪০ ফীট আয়ত, উপর হইতে জল পর্যন্ত
২২ হাত এবং জলের গভীরতা ২৬ হাত, চারিদিকে হর্যা থাকার ইহার জল
অত্যন্ত শীতল । পরসার লোভে বালকেরা ইহার মধ্যে বাস্প দেয় এবং
উপরে উঠিয়া বকসিস প্রার্থনা করে ।

আজমীর দরজা দিয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে বায়ে জয়পুররাজ জয়সিংহের
বজ্রমস্তক । ইনি কাশীর মানদন্দিরেরস্তায় এখানেও এই গ্রহবেধ প্রস্তুত
করিয়াছিলেন । সুহৃদ হর্যাতির নাম সত্কাট যন্ত্র । এটি একটি প্রকাণ্ড
করুণা হর্যাবলীক । ইহার সমকোণের সমুখস্থ বাহু বা ভিত্তির পরিমাণ
১১৮ ফীট ৫ ইঞ্চি, ভূজ ১০৪ ফীট ও লম্বা ৫৬ ফীট । একপাশে ইহার তম্বা-
বহা । অন্যতিদ্বারে এই দ্বারতীর আর একটি হর্যা । মধ্য দিয়া উপরি উঠি-

বার সিঁড়ি আছে। ইহার পার্শ্বের ভিত্তিগুলি সমকোণিক বৃত্তাক্ষর লম্ব-
হের লম্ব স্বরূপ। এতদ্বারা দিল্লীর যাম্যোত্তর রেখার সহিত অপর
স্থানের যাম্যোত্তর রেখার অন্তর জানা যায়। বাহিরের পূর্ব পশ্চিমে
বিস্তৃত ভিত্তি সকল অংশাদিতে বিভক্ত বৃত্তপাদের লম্বস্বরূপ হইয়াছে।
অপর এক ভিত্তি দ্বারা চারি লম্ব সংযোজিত আছে। ইহারই উত্তরে এই-
গণের প্রান্তরিক উচ্চতা জানিবার জন্য চারিভাগে বিভক্ত একটি বৃত্তাক্ষর।
সত্ৰাট যন্ত্রের দক্ষিণে একটি পূর্বভাগে ও একটি পশ্চিমভাগে দুইদিকে
দুইটি মাথা খোলা, গোলাকার গৃহ আছে, তাহার কেন্দ্র হইতে এক একটি
স্তম্ভ উঠিয়াছে, স্তম্ভের মূল হইতে ত্রিশটি প্রস্তরের ব্যাসার্দ্ধ ভূমির সমান্ত-
রাল ভাবে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাপ
৬ অংশ। ব্যাসার্দ্ধ সমূহের মধ্যবর্তী স্থান সকল যোজিত হইলে সাকল্যে
৩৬০ অংশ হইবে। ব্যাসার্দ্ধ ও তদন্তরের মধ্যবর্তী ভাগে ভিত্তি গাত্রে
পর্যবেক্ষণ কল পড়িয়া লইবার জন্য রীতিমত স্থানে, চতুর্কোণ ছিদ্র সমুহ
আছে। প্রত্যেক অন্তরে দুইটি করিয়া জানালা বা খোলা স্থান ছিল।
অন্তরে অত্রভাগে সূর্যের উচ্চতায় জ্যাপিও জানিবার চিহ্ন আছে।
স্তম্ভের ছায়া দ্বারা ১ হইতে ৪৫ অংশ পর্যন্ত জানিবার উপায় আছে,
তদপেক্ষা অধিক হইলে ব্যাসার্দ্ধের অঙ্ক গণনা করিয়া ৯০ হইতে উচ্চতার
বিরোধ কল জানা যায়। অংশ সকল কলার বিভক্ত আছে। ইহাতে
ছায়া পড়িলে দিল্লীর যাম্যোত্তর রেখা হইতে সূর্যের Azimuth প্রান্তরিক
অবস্থিতি স্থানের অন্তর জানা যায়। এই মন্ত্রেরও এইরূপ করিয়া দেখা
হইত।

চন্দ্রযন্ত্রের তিন মাইল দক্ষিণে ডাইনদিকে সফদরজাহের কবর। ইনি
১৭৪৮ অব্দে দিল্লীর সত্ৰাট আহমদ শাহ উজীর ছিলেন। ইনিই অযো-
ধ্যার সুবাদার বংশের আদি পুরুষ। ইহার পুত্র এই কবর নির্মাণ করেন।
প্রবেশদ্বার প্রশস্ত, ও উৎকৃষ্ট, প্রবেশ করিয়াই একটি বাগান, চারিদিকে
লালপাখরের প্রাচীর। এখন লোকে সরাই করিয়া বাগানের চুরচুর
করিয়াছে। এই উদ্যানের মধ্যে কবর ছাড়া, প্রতিদিকে প্রায় ৬৬ হাত লম্বা,
চারিকোণে শীর্ষশোভিত চারিস্তম্ভ, মধ্যস্থলে এক মার্বেল চবুতরা, তদুপরি

অতি উৎকৃষ্ট খেতমার্বেলের গম্বুজবিশিষ্ট কবর সমূহ । ভিত্তিগুলি লাল পাথরের, কিন্তু খিলান সমূহ মার্বেল দ্বারা গঠিত । জানালা দুই সারি আছে । চারিদিকে চারিটি খিলান করা প্রবেশদ্বার । মধ্যে একটি প্রশস্ত ও চারিটি ক্ষুদ্র দ্বার । প্রশস্ত গৃহ মধ্যে খোদকারীতে পূর্ণ মার্বেলের জবাব বা নকল কবর । বিরাটমানে বস্ত্র ও গুল্পশোভিত মৃত্তিকার যথার্থ কবর ।

কুতবের তিন মাইল দূরে রাস্তার বামদিকে খিরকীগ্রাম । ইহাতে কেন্দ্রা ও একটি মসজিদ আছে । কেন্দ্রাজের উজীর খান দেহান ১৩৮০ অব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেন । ইনি একজন তৈলঙ্গী হিন্দু । হিন্দুর ও কেন্দ্রাজ-সারের জলের জল যমুনা ও শতদ্রুর খাল ইনিই খনন করিয়াছেন । খিরকীর মসজিদ অতি প্রকাণ্ড এবং উচ্চ ভূমির উপর সংস্থিত । সমস্তভাগ কৃষ্ণবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত হইয়াছে । গৃহটি বিস্তল এবং চারিদিকে সমাব । কোণের স্তম্ভগুলি ৩০ হস্ত উচ্চ । উপরে ৯৯ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজ, বিশেষ খিলান করা ১০৪ টি প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ চারিদিকে ৬ হাত । দ্বারের ও চূড়ার নিম্নেও এক একটি প্রকোষ্ঠ আছে, সাকল্যে ১১২ প্রকোষ্ঠ । উপরে বাইতে তিনটি দ্বার আছে, উত্তরদিকেরটি কেবল এখন খোলা আছে ।

ইহার পর বিখ্যাত কুতব মিনার, কুতবভূমি ও তাম্বিকটস্থ হান সমস্ত ভগ্নশৃঙ্গ বিকলবন ও লতাঝিঁড়ান দ্বারা শোভিত । নূতন দিল্লী হইতে এই হান ১০ মাইল অন্তর । কুতবমিনার একটা প্রকাণ্ড উচ্চ স্তম্ভ, গোড়াটা ছোট্টা, ক্রমে কিছু সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে । গোড়ার বেড় ২৪ হাত ৮ আঙুল, মাঝার বেড় ১৮ হাত । গারে পাঁচতলার পাঁচটি বারান্দা লাগান । বারান্দাগুলি সমান দূরে নাই, যত উপরে উঠিয়াছে ততই ক্রমে কাছাকাছি । স্তম্ভের প্রথমকার তিনতলা লালপাথরে গাঁথা, তদুপরি দুইতলার মার্বেল দ্বারা গঠিত আছে । প্রথম তলার গায়ে বড় বড় পারসী অক্ষরে ছয় ছয় লেখা স্তম্ভকে বেষ্টিত করিয়াছে । ৬ষ্ঠ হস্ত কোরণ তম্বির পঞ্চম হস্ত দ্বারের ৯০ নান্দ তম্বিরে তদুর্ধ্ব হস্ত করিয়া উদ্দীন আবুল নিরজাকর মহম্মদ বেগশাহের প্রশংসা, তম্বিরে কোরণ, তম্বিরে এই বেগশাহের প্রশংসা, তম্বিরে প্রথম হস্তে আমীর উল ওমরা হই আর পড়া যায় না । স্তম্ভের দ্বিতীয় তলার উপর ২ হস্ত ও তৃতীয় তলের উপর এক হস্ত আছে, প্রত্যেক

তীত স্তম্ভের আবুলাঐ গাত্রী সমস্তই বিট কাটা । কুতবখানার পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্তম্ভ । ১৭৯৩ অব্দে ইহার উচ্চতা ১৬৭ হাত ৮ অঙ্কুল ছিল, এখন উপরিকার বর্ত্তন ভাঙ্গিয়া পড়াতে ১৫৮ হাত ১৬ অঙ্কুল উচ্চ আছে । কুতবে উঠিবার জন্ত ভিতরে ৩৭৯ টী সিঁড়ি আছে । কুতবের পতন ১১০ হাত তহুপরি প্রথমতলা প্রায় ৬৩ হাত দ্বিতীয়তলা ৩৪ হাত তৃতীয়তলা ২৭ হাত চতুর্থতলা ১৭ হাত পঞ্চমতলা ১৫ হাত ও তহুপরি ভগ্নভাগ ১১০ হাত উচ্চ । কুতবের উপর উঠিবার জন্ত ভিতর দিয়া ৩৭৯ সিঁড়ি আছে । স্তম্ভের প্রবেশ দ্বারে লেখা আছে যে সুলতান সমসউদ্দীন আলতামসের স্তম্ভ জখমী হইলে বেহলদ পুত্র সেকেন্দর সার রাজ্যকালে খামখার পুত্র কতা খাঁ ইহা হিজরী ৯০৯ অর্থাৎ ইংরেজি ১৫০৩ অব্দে সংস্কার করিলেন । দ্বিতীয় তলের দ্বারে লিখিত আছে আলতামস এই স্তম্ভ সম্পূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিলেন । তদ্বিন্ন ছত্রে আলতামসের প্রশংসা, তদ্বিন্নে শুক্রবারে ভজনাভ্যাস কোরাণের আদেশ, তৃতীয়তলের দ্বারে আলতামসের প্রশংসা । চতুর্থতলের দ্বারে আছে আলতামসের রাজ্যকালে স্তম্ভ নির্মাণ করিতে আদেশ করা হইয়াছিল, পঞ্চমতলের দ্বারে আছে এই স্তম্ভ বজ্রাহত হইলে সম্রাট ফেরোজ সাহ ৭৭০ হিজরী অর্থাৎ ১৩৬৮ খৃঃ অব্দে সংস্কার করান । ইংরেজদের সময়ে ১৮০৩ অব্দের ১লা আগষ্টে ভরানক ভূমিকম্পে কুতবের মাথা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং স্তম্ভ জখম হয় । পরে ১৮২৮ অব্দে ইনজিনিয়ার রবার্ট স্মিথ সাহেব ১৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার সংস্কার করেন । চারিদিকের ভাঙ্গা ইমারত পরিষ্কার করিতে অপরও পাঁচ হাজার টাকা লাগিয়াছিল । কুতব কে নির্মাণ করিয়াছিল তদ্বিন্নে নানা মতামত আছে, কেহ বলেন, কোন ককীর আলতামসের সম্মান হইবে বলেন, তাঁহার মাতার্থে আলতামস ৪০ বর্ষে ইহা নির্মাণ করিয়াছেন । কেহ বলেন পৃথ্বী-রাজকতা উপরে উঠিয়া প্রতাপ যমুনা-দর্শন ও ইহার উপাসনার জন্ত ইহা নির্মিত হয় । কেহ বলেন, সুলতান সমসউদ্দীন খীর জয়ের স্মরণার্থ এক মসজিদ নির্মাণ বন্দ করিলেন, তাহারই সরজার একটা স্তম্ভ, অপরটা নির্মিত হইতেছিল, কিন্তু অপরটা ইহার যোড়া হইতেছিল কি করিয়া বন্ধা যাইবে । কুতবের

২৮০ হাত উত্তরে এইটী আছে। ইহার বেড় কুতবের বিগুন এবং এখন ২৬ হাত উচ্চ। মুসলমানেরা যোড়া এত মিলাইয়া করে যে চেনা ভার। যাহা হউক কুতব হিন্দু কি মুসলমানের নির্মিত ভবিষ্যে অনেক মতামত আছে। এখনও জীবন্ত কনিংহাম ও জীবন্ত বেগলার সাহেব বিবাদ ভঞ্জন হয় নাই।

কুতবদিনার পার্শ্বেই কুতব উকীনের জমা মসজীদ। ১১৯৩ অব্দে প্রথমে জয় করিয়া ২৭টী হিন্দু মন্দির ভগ্ন করিয়া কুতবউদ্দীন তিন বৎসরে এই মসজীদ নির্মাণ করেন। মসজীদের সম্মুখের ভিত্তির বেধ ৫১০ হাত। তাহার ৭টী খিলানবিশিষ্ট দরজা। মধ্যকার দরজাটী পোনে পনের হাত বিস্তৃত ও ৩৫১০ হাত উচ্চ। পার্শ্বের দরজাগুলি ৬১০ হাত বিস্তৃত ও ১৬ হাত উচ্চ। এই দ্বার দিয়া প্রথমে দিল্লীর মুসলমানেরা ভারতবর্ষের সর্ব প্রথম মসজীদে প্রবেশ করে। মসজীদ ঘর ৯০ হাত লম্বা ২০৬০ হাত বিস্তৃত ও দেখিতে জম্‌কাল। ঘরে পাঁচটী অতি রমণীয় উচ্চ স্তম্ভ আছে। সমস্ত গুলিই হিন্দু মন্দিরের স্তম্ভ। প্রাঙ্গণ চারিদিকে ঘেরা, পূর্ব পশ্চিমে ২৬ হাত ও উত্তর দক্ষিণে ৬৪ হাত প্রশস্ত। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমার্ধে বিখ্যাত লোহস্তম্ভ ১৪৪০ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভটী কৃষ্ণবর্ণ, বোধ হয় অকুণ্ডল নির্মিত, ইহার বেড় পোনে তিন হাত। ৪২ হাত খুঁড়িয়াও ইহার তলা পাওয়া যায় নাই। ইংরাজেরা আশ্চর্য্য হইরাছেন যে, এত বড় ধাম কিরূপে নির্মাণ করিল এবং কি রূপেই বা স্থিতিকা মধ্যে প্রোথিত করিল। নদীর সাহা এই স্তম্ভটী ভগ্ন করিবার জন্ত কয়েকটী গোলা ফারিয়াছিলেন অত্যাগি তাহার দাগ আছে। লোকে বলে রাজা চিত্র-দ্বারী করিবার জন্ত বেলাঘরের বজ্র করিয়া বাহুকা মস্তক পর্যান্ত এই বৃক্ষ সংস্থাপন করেন। পরে মস্তকপর্যন্ত যায় নাই সন্দেশ করিয়া পুনরায় উৎখাত করিয়া দেখিলেন, বাহুকা মস্তকের রক্ত রহিয়াছে। তাহার পর আর সম্পূর্ণরূপে বসিল না ১৪৪০ হস্ত উচ্চ হইয়া রহিল। পণ্ডারার ও ইতান লিখিয়াছেন যে, বিশাখানকরে কৃষ্ণাক্রোদনীতে ৭৯২ সন্থতে চন্দ্র অভিজিৎ গত হইলে ডোমহরাজ রাজ্য রক্ষার্থ ইহা প্রোথিত

করেন। স্তম্ভগায়ে ১১০৯ সম্বতে অনঙ্গপাল, ১৮৮০ সম্বতে গৃধীরাজের উন্নয়ন পুঙ্খ বোহন ছত্রসিংহ ইত্যাদির নাম খোদিত আছে।

লৌহস্তম্ভের নিকট প্রাঙ্গন মধ্যে হিন্দুদিগের আরও কতকগুলি প্রাচীর স্তম্ভ আছে। ইহাদের গঠন প্রণালী ও খোদকারী অতি চমৎকার। প্রাঙ্গন প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার আছে। পূর্বদিকের দ্বারই প্রধান, দক্ষিণের দ্বারটি বিনষ্ট হইয়াছে। কুতবজামাতা আলাউদ্দীন এই প্রাঙ্গনের উত্তর দক্ষিণ পার্শ্ব রুদ্ধ করেন, এবং প্রথম প্রাঙ্গন অপেক্ষা হয় ঞ্চন বিস্তৃত আর এক প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কুতবজামাতার উত্তর পশ্চিমে ১২৩৬ খৃঃ অব্দে হৃত সত্রাট আলাউদ্দীনের কবর গৃহ। গৃহের অভ্যন্তর ভাগ ২০ হাত প্রশস্ত ও উত্তমরূপ সজ্জিত। নিকটেই দক্ষিণ পশ্চিমে খিলিজীবংশীয় তৃতীয় সত্রাট আলাউদ্দীনের বাটী। ইনিই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠন করেন এবং আপনাকে গব্ব করিয়া বিতীর সেকেন্দর বলিতেন। বাটীর দরজাটি প্রকাণ্ড। আর-বীতে দুই তিন দরজায় সেকেন্দর ছানি পদবী সহ আলাউদ্দীনের নাম লেখা আছে। তারিখ হিজরী ৭১০ বা খৃঃ ১৩১০। প্রধান ইয়াতী সম-চতুষ্কোণ, অভ্যন্তরভাগ ২৩ হাত প্রশস্ত, বহির্ভাগ ৩৭।০ হাত ও তিষ্ঠির বেধ ৭।০ হাত। প্রতিপার্শ্বে এক এক উচ্চ খিলান দ্বার। খিলান ঘোড়া-ধুরে বাহিরের কিনারা ঘসা। অভ্যন্তরে পতর আঁটার দ্বার, কোণ, কোলদান দ্বার খাঁজকাটা প্রতি কোণে দুই জনালা, কিন্তু মার্কেলের জাকরীতে আরত। বাহিরের তিষ্ঠি মার্কেলের পতরবিশিষ্ট দেখিতে অতি সুন্দর। উপরে মার্কেলের অর্দ্ধরক্তাকার গম্বুজ, এই ইয়াতী খিলিজি পাঠানের আদর্শ স্বরূপ। ঘোড়াধুরে খিলানবিশিষ্ট এইরূপ ইয়া ১২৯০ অবদি ১৩২০ পর্য্যন্ত খিলিজীকালে নির্মিত হয়।

আলিদরজার নিকটে ইমামজামিনার কবর, কুতবের দক্ষিণ পশ্চিমে আকবরের পালক-পিতার বধকারী আজাম খাঁর কবর, কুতবের নিকট বেলে পাথরের গাঁধা কতকগুলি আশ্চর্য্য বকর কূপ আছে। মিরোলি আমের কূপ প্রায় ৫৫ হাত গভীর, বালকেরা সামান্য পুরস্কারের লোভে তাহাতে লাঞ্ দিয়া পড়ে। এই গ্রামে কতকগুলি মার্কেল-প্রকৃতিযুক্ত সুন্দর কবর

আছে । নিকটে যেটাক হাউস, এটি আকবরের বালাকানের পালনকারী আভাগা মহম্মদ খাঁর কবর । দিল্লীর শেব সম্রাটের রেসিডেন্সে যেটাক নাহেব লইয়া আশনার কুঠী করেন । কুতব ভূমির উত্তর পশ্চিমে ১০৬০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল নির্মিত লালকট নামক দুর্গ, বেড় ২১০ মাইল, ভারতের শেব বিহু রাজা পৃথুরাজ ইহাতে বাস করিতেন । কেবল গৃহবিচ্ছেদে সেই বীর ১৬১০ অব্দে মহম্মদ বেগ শাম বা ঘোরা কর্তৃক পরাজিত হইয়া বিহত হইলেন । কুতবের নিকটে ইহার কুলদেবতা মারা দেবীর মন্দির । এখন একটী দিল্লীর দেওয়ান ভগটাকুর, দুর্গের ভিত্তিমূল অত্যন্ত দৃঢ় এবং ভগ্নাবস্থাতেও ভগ্নাবস্থ, ইহার বাহিরে ৪ মাইল আৱত করিয়া আর এক দুর্গের ভিত্তি ইহারই অভ্যন্তরে পৃথুরাজধানী প্রাচীন দিল্লী ছিল ।

কুতবের পাঁচ মাইল পূর্বে তোগলকাবাদ । তোগলক বংশের দ্বিতীয় রাজা অর্জুনাযত তোগলক এই নগর নির্মাণ করেন, সহরটী বটকোণ ক্ষেত্রের অর্দ্ধভাগের মত ছিল । তিন বাহু প্রত্যেকে প্রায় শোনে এক মাইল লম্বা । চতুর্কোণ দেড় মাইল । বেড় কিকিছুন চারি মাইল । কেন্দ্র পাছাড়ের উপর সংস্থিত, প্রাচীরের পাথর এত বড় যে বোধ হয় ঐ পাছাড় হইতে পাথর কাটিয়া ছিল । এক এক পাথর ৯ হাত লম্বা ১১০ হাত চৌড়। এক হাত ৫ অঙ্গুল পুরু ও প্রায় ১৮০ মণ ভারী । উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বে গভীর পরিখা । এবং প্রশস্ত দক্ষিণদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি । এই পাছাড়ের উপর দিকের প্রধান প্রাচীর ২৬ হাত উচ্চ, তাহার অগ্রভাগে ৫ হাত উচ্চ এবং তাহার পশ্চাতে ১০ হাত উচ্চ আর এক প্রাচীর । ভূমি হইতে প্রাচীরের অগ্রভাগ ৬০ হাত উচ্চ হইবে । এই দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মহরের মজ্জাগের ভাগ আৱত করিয়া রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ । দুর্গ প্রাচীরের পার্শ্ব রক্ষাকারী সৈন্যদের ছোট ছোট ঘর । ভিত্তির মধ্যে দিয়া আলো বাইবার এবং উপরিভাগ দিয়া তীর চলবার হিঙ্গ আছে । প্রাচীর অভ্যন্তরের দিকে কয়েকটা চৌকি হইয়াছে । তোগলক পাঠানদের নির্মিত প্রাচীন প্রাচীর যাহাই চালা । কেন্দ্রার ১৩ মরজা ও রাজবাটীর তিন মরজা দেখা যায় । প্রাচীন সহরের অবশেষের মধ্যে ৭টী পুষ্করিণী জমামসজীদ ও বীরীজ মন্দির প্রভৃতি করেকটী ভগ্ন (ব্যাধ) দেখা যায় ।

সৈয়দ আলী হুসাইন খানসহ ১০২৩, অর্থাৎ সৈয়দ হুসাইন এই দুই জনই
 এই বর্ষে মক্কা হইয়া, যোতায়াক একদিনে মিলি উঠিয়া সেরা এক জন চারিদিক
 জেলায় ঘুরে কোমতায়াকের কাজকালাই করে। আবার অনেক দিন পরে শহর হইয়া
 আসিয়া পুনরায় চিরিয়া আসে, তাহার কালাই কিছই নাই। মিলির একজন
 সৈয়দ তিনজন হাতে দিল্লী হইয়াছিল বলিয়া তাহার পরে দ্বি-ত্রি-৪০০
 জেলায় টানিয়া লইয়া আসিয়া হয়। আট্টারের দুই বাহিরে দক্ষিণদিক দিয়া
 এক মতো এই দুই জনের কবর। কেরার সহিত ৪০০ হাত লম্বা ২৭ মিলান
 বিশিষ্ট সেতুবারা সংযোজিত আছে। চারিদিকের দুই আট্টারবিশিষ্ট ও
 বিভাজ্য কঠিন ও প্রশস্ত ভিত্তিযুক্ত তৈমিলকের তরকক করায়, সর্বোত্তম মতো
 দেখিলে বোধ হয় যেন যথার্থই কোন বীরপুরুষ নিহিত আছে। সৈয়দদের
 গুল্ল এই কবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। কবরগৃহ সমস্তভূকোণ ভিতরে ২৬
 হাত ও বাহিরে ৪১ হাত লম্বা। ভিত্তি ২৬ হাত উচ্চ কিন্তু প্রতি ফুটে ৯
 ইঞ্চি ঢাল হইয়াছে। মাথা হইতে গোড়া পর্যন্ত ৫ হাত ঢাল। এই ভিত্তি উপ-
 রের ভিত্তির ২৫০ হাত, নিম্নে ৭১০ হাত। উপরের ভিত্তি গুল্লের গুল্ল
 বিশাল স্থূল। গুল্লের অন্তর্ভুক্ত ২২৪০ হাত বাহিরের ২৪৮০ হাত
 ও উচ্চতা ১০১০ হাত। কবরমন্দির পীঠপাধ্যস্ত ৫০১০ হাত উচ্চ। গুল্লের
 চারিদিকে ঘোড়াঘুরে খিলানবিশিষ্ট ১৬ হাত উচ্চ চারি দরজা। দরজা
 মার্বেল কাফরীতে ঢাকা। প্রবেশের দ্বার ৪ হাত স্থান খোলা আছে।
 খিলানের মুখেও অনেক খেত-মার্বেল আছে। নিম্নে মহম্মদ তংশাদী ও তৎপ-
 ত্র জোনাথান কবর। নিম্নে মহম্মদ তোগলক বহলোকের প্রাণ বধ ও অধৈ-
 র্যের উপর অত্যাচার করেন। ইহাদের নিকট এই সকল শাহের মাদনাসী
 কবর অত্যাচারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গুল্ল শোভনের নিকট হইতে মাদনাসীর
 বেগাইয়া কবর ধরে নিহিত করা হইয়াছে, ইহাও ভুল করিলেই তিনি সেই
 একজন ব্যক্তি করিয়া মালায় হইলেন। 'মাদনাসী মুক্কাই খুত্ব' মহম্মদ
 'তোগলক তোগলক' মন্দির পুর্বে 'মাদনাসী' মালায় আর এক গুল্ল
 কেরা করেন। ইহার পর ইহা 'ইর' কবর করিয়া অধৈর্যের পীঠ করিয়া
 সেই পীঠের মালায় দেখিতে দেখিতে মিলি চিরিয়ে। কের কেই হুত্ব হই-
 তেই চিরিয়া ১ মিল পরে রাখেই নাজা করিয়া জীবনান ৩ দ্বি-দেখিয়া

কেন্দ্রোজপুরের মধ্য দিয়া কান্ধারের কেন্দ্রার দক্ষিণে গিয়া এখন দিনের শেষ
হয়ে।

দিল্লী একবেলা মুসলিমের রাজধানী ছিল। তাহার পর লৌহন্তরে মঘ
রাজ্যের নাম খোদিত দেখা যায়। বিজয়াদিত্যের পর হইতে প্রায় ৭০০ বর্ষ
স্থায়ী থাকে। ইহার পর কান্ধার হইতে পৃথ্বংশীরেয়া গিয়া রাজধানী
করেন। সম্রাটের মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। দিল্লী হইতে এক বেল
দক্ষিণমুখে ভরতপুরে গিয়া ভরতপুর রেলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

দিল্লীর আটার, কালাবতুর কাজ, স্বর্ণালকার, গজদন্তের দ্রব্য, মৃত্তিকা-
দ্রব্য, হুইকার দ্রব্য, শুকচড়ির মল উত্তম।

দিল্লী হইতে শেখোয়ার।

আমরা দিল্লী হইতে বিন্দাব গ্রহণ করিলাম। গাড়ীর বেগের সাজ সজে
গৃহের পর গৃহ অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে যে শেবাংশ লক্ষিত হইতে-
ছিল তাহাও দিকপ্রান্তে বিলীন হইয়া গেল। দিল্লীর আর কিছুই দৃষ্টিগোচর
হইল না। কেবল নিবিড় বৃক্ষ ও নীলবর্ণ আকাশ। কিয়ৎকাল পরে পুনরায়
গাঙ্গীনাথকে উপস্থিত। গাজিরান্দার পার হইয়া ট্রেন উত্তর মুখে বিরটের
দিকে চলিতে লাগিল। আমরাও ক্রমে অন্তর্বেদীর উচ্চ বিভাগে আরো-
হণ করিতে লাগিলাম। উত্তর পার্শ্বের ভূমি মিতান্ত উর্বরা। বর্ষাকালে
যে লক্ষ লক্ষ প্রচুর নীলপ্রসব করিয়াছিল তাহাই একগুণে গোমুখের হরিত-
শোভা বিস্তার করিয়াছে। স্থানের জল বায়ু একদা উৎকৃষ্ট যে, কি ঐশ্ব কি
সম উত্তর মণ্ডলের শস্তাদিই তুরি পরিধানে উৎপন্ন হয়। যেম ইংলও ও
ভারত একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। মধ্যযোরা সকলেই বলিষ্ঠ, সকলেই একুজ-
চিত্ত। এই পাটের মধ্য দিয়া হস্তিমা হইতে ইজ্রায়েলের বিস্তীর্ণ পথ ছিল।
কতবার শুকসেব এই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সকল স্মরণ করিতে
করিতে আমরা বিরট কেন্দ্র উপস্থিত হইলাম। বিরট নগরের চারিদিকে
জঙ্গলভরা। অভ্যন্তরে প্রায় ৪০ হাজার লোকের বাস। বিরটের পর

ইহার শোভা বিনষ্ট হইয়াছে। সহরের এক কোণ উত্তরে ছাউনী, আবার ছাউনী দেখিতে যাত্রা করিলাম। পূর্বে পবিত্র লক্ষণ সকল দেখিয়া বহির্দেশে আশ্রয় বোধ হইত। এক্ষণে উপরে ছিল শকুনি উড়িতেছে, নিম্নে বুদ্ধর শব্দ করিতেছে, চারিদিকে খামার হুগুগ উঠিতেছে, ভিত্তি ও ধানসামান্য নোড়া-নোড়ী করিতেছে, অসম্বিত বৃক্ষ আছে কিছু ভুলির তরে উৎকর্ষ পাকীয়ার নাই, এই সকল দেখিয়া বোধ হইল ইংরেজদের আবাসের সমীপবর্তী হইয়াছি। মিরট ছাউনী একাণ্ড সেনানিবেশ স্থান ও যুদ্ধসম্পর্কিত সরঞ্জামে পূর্ণ, রয়েল হরহ আরটিলারির চিহ্ন সকল চারিদিকে লক্ষিত হইতে লাগিল। এখানকার গির্জা অতি একাণ্ড। গঙ্গাখালের ইঞ্জিনিয়ার এই স্থানেই অবস্থিতি করেন। ১৮৫৭ আন্দের সিপাহী বিদ্রোহ সর্ব প্রথমে মিরটেই হইয়াছিল।

মিরটের ২৫ মাইল দূরান কোন্ গঙ্গার ডাইনতটে সুপ্রসিদ্ধ হস্তিনা-নগর। হস্তিনার মাঠ দৃষ্টিপথে পতিতমাত্র মহাতারতের সেই ধুমধাম স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। হায় রে কাল! আজ সে সকল কোথায় গেল! আজ কেন হস্তিনার সে কোলাহল কর্ণগোচর হয় না। আহা! এই স্থানে বসিয়া নিরীহ মুখিতিকে বচনা করিবার জন্য হুর্ধ্বোদ্যেনেরা কত যত্নপা করিয়াছিল। সেই প্রাচ্যপার ব্যাকুল হৃদয়ে এই স্থানে সজ্জিত কত উল্লোখ করিয়াছিলেন। বে নগরর জন্য এত তরফর কাণ্ড হইয়াছিল, আজ একটা শূণ্যলগ্ন সে স্থান প্রার্থনা করে না। আজ সে হস্তিনার ঐ মন্দির এই বন্দীক ও দূরে গঙ্গা ব্যতীত আর কি আছে? মুখিতিরের পক্ষ পুঙ্খ পায়েই গঙ্গা হস্তিনা গ্রাস করেন।

যাহা হউক মিরট ছাউনী পার হইয়া সহরেন ফৈসল। বোম সোমরের প্রপোজের কবর ও এক একাণ্ড গির্জা এই স্থান শোভিত করিয়াছে। বহু-সম বংশোদ্ভূত বেগম জহান সেনাপতি বিনহাউ বা সোমরাক বিবাহ করিয়া ধর্মশালী হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সরধনে রাজধানী করিয়া বহারাষ্ট্রর সঙ্গে যোগ দিয়া আত্মের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজদের সহ্য নহি করেন। রোমান কাথলিক বেগম একাণ্ড গির্জা করিয়া ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইটালীতে নির্মিত মসজিদ সন পঞ্চমুর্বি ওয়াফা স্থাপন করিয়া গিয়া-

শিবমূর্তি ও বাঁড় । তাহার পর দক্ষিণে মারাপুর । মারাপুরের দক্ষিণে
হইতে গঙ্গাবান দক্ষিণ পশ্চিমে কড়কী বিরাছে । গুলে ভতলা নামের
মুখ । এই স্থানে মারায়ণ শিলা মন্দির । মন্দিরের এক একখান ইট চারি
দিকে অর্ধ হস্ত ও তিন অঙ্গুল পুরু । নিম্নে ৫০০ হাত সমতলভূমি বর্ণ
কোরা । এসকল দেখিতে ইচ্ছা না হইলে মারাপুরের দক্ষিণে গুল আদ-
রের স্থানে গুল পার হইয়া কিছু দূর দক্ষিণে কাটবে । সেখানে পূর্বোক্ত
চরা বা বীণের শেষে পূর্বদিকের দ্বারা হইতে একদারা আসিয়া পশ্চিম
দ্বারার মিলিত হইয়াছে । বিলন স্থানে জলের বিস্তার দুই সহস্র হাত ।
ইহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ কনকল তীর্থ । এই স্থানে শিব দক্ষদেব বসতি
করিয়াছিলেন । এখানে সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব আছেন । প্রাচীন
মন্দির বটরূপে ভয় হওয়ার নূতন মন্দির ১৭৭০ শকে নির্মিত হইয়াছে ।
অত্যন্তের এক নেশাল প্রদত্ত ঘটা । বিষ্ণুপদ ঘাট হইতে কনকল পর্যন্ত
সেই জেলা পথ । হরিদ্বারস্থ হিমালয়ের নাম শিবালিক পর্বত, পুরাণে
ইহারই নাম কনকল জেদী । কনকল পর্বতের উপর দেখিবার অনেক
গুলি বিঘর আছে । দ্বাত্রীয়া সচরাচর যে পর্বতে উঠে তাহার পূর্ব
হরিদ্বারের দিকে ঢালু । কিন্তু আলাগা ঘাট ও প্রস্তরখণ্ড থাকার সাবধানে
উঠিতে হয় । পর্বতের উপর বেদী মধ্যে ১ হাত উন্নত এক প্রস্তর-বিষ্ণু
প্রতিষ্ঠিত আছে । শূলের উপর চন্দ্র স্বর্ঘ্যমূর্তি ও শূলদণ্ডে গলেশ । নিম্ন-
ভাগে পূর্বদিকে কালিকা দেবী ও পশ্চিমে হনুমান মূর্তি । শীতকালে
হরিদ্বারে বড় শীত ও বরফ পড়ে । এত শীত যে লোহার জিনিস কিছুকাল
স্পর্শ করিলে হাত জ্বালা করে । চৈত্রমংক্রান্তিতে স্থানের কাল । বাদশ
বর্ষান্তে বৃহস্পতি সুপ্রসিদ্ধ আবেশ করিলে বড় মেলা হয় । ১৭৮৮ ও
১৮০০ ইত্যাদি শকে মেলা হইরাছিল । বেলার বাগা সমসীয়ার বড় মেলা ।
গুরুদেবটো মৈত্রেয় মহাসতর্ক থাকেন । ভারতবর্ষীয় রাজসদ ও গুরু প্রভৃতি
জাহাজের সমসীয়ায় বিভক্ত হইয়া যান করে । যখন হুতী উপরে মন্দির
ও নিম্নে ভূমিভিত্তি দীর্ঘকাল বসন্ত জটাবলম্বারী, কতক উলহ, বাতী,
বাগদারী, মামোজী, বাগা আদি কারতের সময়ে সম্রাটবাবাণ্য করিয়া,
চান্দর ও পাতাকানি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গুরু পার্শ্ব দীক্ষার করিতে করিতে

হরিদ্বারের অগ্রশত্ৰু পথনির্দেশ বিষ্ণুপদ ঘাটে গমন করিতে থাকে ও যখন উভয় পার্শ্বে গর্গলমেটের সহিত রক্ষকগণ সাবধানের শব্দ করিতে থাকে তখন মনে কি অনির্কণীয় ভাবের উদয় হয়। কতকগুলি হরে হরে বধ বধ করিতে করিতে গিয়া জলে পড়িল। তাহার পর আর এক দল হরে নারায়ণ হরে নারায়ণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। আর এক দল জয় শিব শঙ্কো জয় শিব শঙ্কো করিয়া আসিতে লাগিল। প্রায় সন্ধ্যাপর্যন্ত এইরূপ ভীড় থাকে। হরিদ্বারের নিকট মাঠ ও পর্বত না থাকিলে এই সকল অসংখ্য ঈমানিক ও সন্ন্যাসীর বাসস্থান পাওয়া ভার হইত।

গঙ্গাবারে প্রায় ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন মধ্যবার নগর। পৃথু রাজের প্রস্তর নির্মিত দেবালয় ভগ্ন করিয়া একজন ঘোরী সুলতান বর্তমান জমিদারসজ্জীদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছে। এখনকর অর্জাইল বিস্তৃত পিরানি ভলাও বৌদ্ধদের বিঘনমিত্রের সরোবর ছিল। হোয়ানথসজ্জের সময়ে এখানে বৌদ্ধদের হাদিশ ও ব্রাহ্মণদের পঞ্চাশৎ মন্দির ছিল। মধ্যবারের দুই মাইল দূরে হুপ্রসিদ্ধ 'মালিনী' নদী। যাহার তীর কণ্ঠের আশ্রয় ছিল এবং যেখানে শকুন্তলা দুঃস্বস্তক পতিলাভ করেন। মালিনীর তীরে এখনও চক্রবাক ডাকে, কিন্তু আর সে শকুন্তলা নাই।

সারনপুর হইতে লোকে মসৌরি ও লাণ্ডর যায়। ৪৮ মাইল দূরে পর্বত প্রান্তে রাজপুর পর্যন্ত লোক প্রতি অমনিবস গাড়ীভাড়া এগার টাকা। পথে শাল জঙ্গলপূরিত দেশ মধ্যে ডেহার।। এখান হইতে গঙ্গা ও যমুনার লীলা দেখিতে বড় সুন্দর, উভয় পর্বতের মধ্যস্থ সমতল ক্ষেত্রের বাহু ছন বলিয়া লোকে এই ভাগকে দেহাছন কহে। ডেহার। শীকদের গুহদ্বার।। হিমালয়ের নিকট ২৪০০ ফীট উচ্চে সংস্থিত বলিয়া এখানে গ্রীষ্ম ও শীতপ্রধান উভয় দেশের লক্ষ্যাদি উৎপন্ন হয়। চাও জমিয়া থাকে। 'দেহারার ৬ মাইল পর রাজপুর। রাজপুর হইতে লাণ্ডর ১৭ মাইল। মসৌরি ও লাণ্ডর বরফমণ্ডিত হিমালয়ের সারিখে ৬ হাজার ফীট উচ্চ পর্বতগণি ইংরেজসৈন্তগণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। পাহাড়ের গভীর খাণ্ডের উপর পর্বতপ্রান্তে মসলা জমাট করিয়া ইছার

অনেক ভাগ নির্মিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে উন্নত ব্রিটিশ মৈত্র্য ও ঘোষনোদ্ধতা ব্রিটিশ কামিনীরা তথ্য অবলীলাক্রমে বঙ্গ রস করিয়া বেড়ায়।

এই সকল দেখিয়া সারনপুরে ফিরিবে। সারনপুর পার হইয়া সিরসা স্টেশন। পাঁচ মাইল দূরে ৭৩ হাত অন্তর ২৪ খণ্ড বিশিষ্ট যমুনার আর এক পুল। পুলের ইটকম্পত্ত সকল জল হইতে ৩০।৫২ হাত নিম্নে প্রোথিত। এখান হইতে হিমবানের রূপ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। দর্শক দূরবীক্ষণ ধারণ কর, আমি গিরি সকলের পরিচয় দিব। মুজফের নগর হইতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াহ এবং লুধিয়ানা পর্য্যন্ত দেখিবে। সম্মুখে ঐ যে গিরি দেখিতেহ, বাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে, উহাই মমোরি ও লাণ্ডরের পাহাড়। উহার ডাইনদিকে, পশ্চাতে যে সকল শিখর রহিয়াছে, ঐ গুলি সুমোও ডেরালিতে গঙ্গার ডাইনতটে অবস্থিত। ঐ সকল গিরি হইতে গঙ্গা স্ফদার দিয়া পতিত হইতেছে। ঐ গিরির নিকটেই ভাগীরথী ও জাকবীর ভয়াবহ সঙ্গম। প্রথমে শ্রীকট, তৎপার্শ্বে শিব-নৃক, তৎপার্শ্বে বঙ্গ হিমালয় ও তদনন্তর গঙ্গোত্রী শৃঙ্গ। গঙ্গোত্রীর ও ক্রোশ দূরে গোমুখাকৃতি বরকগুহা হইতে ভাগীরথী নির্গত হইতেছে। বানে কেন্দারক ও তৎপশ্চাতে যমুনোত্রী শিখর। তথ্য আশ্চর্য্য উচ্চ-প্রভাবণ দিবানিশি প্রধূমিত হইতেছে। উহার তাপে বিগলিত বরক যমুনাক্রমে উদ্ভূত হইতেছে। ঐ সকল শৃঙ্গ পঁচিশ হাজার ফীট উচ্চ। উহার উপরে প্রাণীর নাম মাত্র নাই। কেবল এক আকাশ ও ঐশীতাব বিরাজ করিতেছে। ২০ হাজার ফীটের উর্দ্ধে আর মনুষ্য উঠিতে পারে না। নিখাস আকর্ষণ অসাধ্য হয়। এদিকে পুলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমরা যমুনাপুল পার হইলাম। যমুনাপুল হইতে শতক্রপর্ধ্যন্ত হিমালয় নির্মিত নদী সকল পার হইতে বিস্তর সেতু নিৰ্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। তথ্যো ৮০ ফীট অন্তর ২ খণ্ডে একটা নামহীন নদী ও সরস্বতী, তিনখণ্ডে চিত্রি লুধিয়ানা ও সুসর, ৩ খণ্ডে তাহারি এবং ৮ খণ্ডে দূর্গতী বা বাগর ও ১১১ ফীট অন্তর একাদশ খণ্ডে নির্মিত মার্কণ্ড। এই করেকটী নদীর সেতু প্রধান। জল হইতে ২০।২৫ ফীট নিম্নপর্য্যন্ত স্তম্ভ প্রোথিত আছে। বাহ্যি ইউক আমরা যমুনা পার হইয়া করে

পরে পঞ্জাব মুখ্য সেনানিবেশ স্থান অম্বালায় পৌঁছিয়ায়। অম্বালায় মাঠ সকল সমগ্র ভূমিস্বামী, কিন্তু গ্রীষ্মকালের ঘোর গ্রীষ্মে জমি বিসর্জ হইতে থাকে। সহর জলশূন্য, প্রাচীর বেষ্টিত ও সংকীর্ণ পথশালা, কেরা সহরের উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। অম্বালা হইতে উত্তরে শিমলা পশ্চিমে কুঙ্কজের পথ।

‘‘ অম্বালা অম্বালা হইতে চর্র বস্টাব ডাকগাড়ীতে কুঙ্কজ বা থামেশ্বর পৌঁছিয়ায়। হাবুতীর্থ হইতে থামেশ্বর মাথ হইয়াছে। সাইতে স্থানে স্থানে আঁহের নিকুঞ্জ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে কাঁটাল গাছ নাই। আম্রও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। পানও দুখুলা। প্রাচীন থামেশ্বর নিগর সমুদ্র তট হইয়া গিয়াছে। তাহারই উপরে বর্তমান পল্লী নির্মিত। থামেশ্বর জের নিকটে কুঙ্কজের বিস্তীর্ণ মাঠ বৃদ্ধ করিতেছে। তন্মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সরোবর। তাহার চারিদিক বাধান ও সোপানবিশিষ্ট। সরোবরটি পূর্বে পশ্চিমে ২০৬৪ হাত দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ১২৬৬ হাত প্রশস্ত। মধ্যস্থলে ৬৬ হাত বিস্তীর্ণ একটি চকুফোণ দ্বীপ। উত্তর, দক্ষিণ হইতে ১৮ হাত বিস্তৃত দুই ভাগ সেতু ইহার দুইদিক স্পর্শ করিয়াছে। দ্বীপের চারিপাশ প্রাচীরাকৃত ও তন্মধ্যে পশ্চিম বিভাগে চন্দ্রকূপ, এই সরোবর মহাতীর্থ। স্বর্গপ্রাপ্তে নিস্তর বাত্মী স্বান ও তীরে স্নান করে’’। আকবরের কালে বীরবল ইহার চতুর্দিক প্রাধিক্ত করেন। আরংজেব ইহার অনেক বিনষ্ট করিয়াছে এবং দ্বীপ হইতে স্থানের যাত্রীগণকে গুলি করিতে আদেশ দিয়াছিল। সরোবর হইতে উত্তর ও পরে পশ্চমে গমন করিলে ত্রিমতী পথ দিলিত দেখা যায়। বামের পথ কৈথলে, মধ্যের পথ পৃথুমকে এবং ডাইনের পথ মরুভূমির আবুজস ঘাটে গিয়াছে। মরুভূমী শুকপ্রায় জল নিতান্ত অল্প। প্রতিজ্ঞোতা মরুভূমী অবলম্বন করিয়া গমন করিলে আবুজসের উত্তরে অহিপুর পৌঁছিয়া যায়। ৬০৪ মাইল আঁহে হোরানবসং এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অহি দেখিয়া গিয়াছেন। অহিপুরের উত্তরে পাণ্ডুদের সানার্ধ্য কীরবাস ঘাট, তৎপরে গঙ্গাতীর্থ ইত্যাদি আবুজস ঘাট হইতে থামেশ্বরের উত্তর পূর্বে রত্নমল্ল পর্যন্ত ৫ মাইল দূর্য্যে ১১ তীর্থ। চক্রতীর্থের মধ্যমাংশে কাও রহৎ বিষ্ণুভূক্তি গজদ্বী তট করিয়াছে। সরোবরের উত্তরে

অম্বালা রাস্তার পার্শ্বে দিলীপগড়ের সমস্ত হিন্দুকীর্তি নষ্ট করিয়া মুসলমানেরা মাস্রায়া প্রস্তর মসজীদ, মৈরদ জেলালী ও জমামসজীদ নির্মাণ করিয়াছে ।

সরোবরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে আমীন বা অভিমত্যা বধের স্থান । কিছুদূর দক্ষিণে পাণ্ডুরা স্মৃতি পঞ্চকের আর চারি হ্রদ দেখাইয়া দেয় । সরোবরের এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কর্ণগড় । ইহার ভিত্তি নিম্নে ৫৩ হাত ও উপরে ৩৩ হাত লম্বা । ভিত্তির উচ্চতা ২৬ হাত । মধ্যস্থলে ৩৬ হাত গভীর ও ২৬ হাত বেফন এক শুষ্ক কূপ । নিকটে কুরুধ্বজ তীর্থ ও ভগ্ন মন্দিরাদি । ইহার ইট অতি প্রশস্ত । কুরুক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করা সহজ নহে । মনুস্মৃতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত । দৃশদ্বতী বর্তমান ঘাগর । মহাভারতে লিখিত আছে যে, তরসুক, অরসুক, রামহ্রদ ও সমচক্রুক মধ্যে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ পিতামহের উত্তর বেদী । ঝিন্দের রাজা বলেন, রামহ্রদ এমত পবিত্র স্থান অবশ্যই আমার রাজ্য মধ্যে আছে । এইরূপে রাজা ও পাণ্ডুরা স্মৃত স্থাপন করিতে গিয়া সমস্তই গোল করিয়াছে । অরসুক একমতে উত্তর পশ্চিম কোণে পিছোর দুই ক্রোশ পশ্চিম । মতান্তরে ইহারই নাম বহর যক্ষ । ইহা সরস্বতী তটে পিছো হইতে ১১ ক্রোশ এবং রত্নযক্ষ হইতে ২০ ক্রোশ পশ্চিম । রামহ্রদ একমতে ঝিন্দের দুই ক্রোশ নিকট অপর মতে পুন্ড্রী বা পুণ্ডরীক তীর্থের সমীপস্থ । পাণ্ডুরা রত্নযক্ষ বহরযক্ষ ও তৃকযক্ষাদি দ্বারা সীমা নির্দেশ করে । দর্শক এখন পাণ্ডুর গোলাযোগ পরিত্যাগ করুন । কুরুক্ষেত্র এক বিস্তীর্ণ স্থান । পূর্বে এই স্থানে বহুদূর ব্যাপক কুরুজাঙ্গল নামে জঙ্গল ছিল । মহাভারতে লিখিত আছে, যমুনা কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত । ঐরুক্ষ যে হিরণ্যতী তীরে পাণ্ডবদের শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্তী । উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃশদ্বতী, ইহার মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত বিনশন প্রদেশ অর্থাৎ যেখানে সরস্বতী লুপ্ত হইয়াছে তাহার পূর্বস্থ কুরুক্ষেত্র মধ্য দেশের অন্তর্ভূত । এবং মৎস্ত ও পাঞ্চালের সহিত সংলিপ্ত যে কুরুক্ষেত্র তাহা ব্রহ্মর্ষি দেশ মধ্যে ধৃত হয় । স্থান ভেদে পূর্ণাতার ভেদ আছে । কৃষ্ণ ও ভীষ্ম সেনানিবেশ করিবার কালে ঋষি সেবিত তীর্থস্থান সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । যাহা

হটক খানেখর পানীপথ ও কর্ণাল আদি লইয়া এই বিস্তীর্ণ স্থান একটী মহাক্ষেত্র । ইহাতে কতশত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে । যজ্ঞের কোলাহল, যুদ্ধের ভীমরব ও গোমায়ুর চীৎকারে কতবার এই মাঠ কম্পিত হইয়াছে । ছয়জন ভারত আমার বলিয়া এই মাঠে উল্লাস করিয়াছে, ছয়জন ভারত আমার গেল বলিয়া রোদন করিয়াছে । এই মাঠে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ভারতের জ্ঞাত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন । আজ সেই বীরগণের অস্ত্র উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে মন চলে হইতেছে । আহম্মদ সা আবদালীর বিক্রেতা ও পাঁচ লক্ষ মহারাজার বীর একত্রিত হয় । এখনও যেন তব্রারির ঝঞ্ঝা ও সদাশিবের কঠোর শ্রবণ করিতেছি । এখনও যেন সদাশিব কহিতেছেন, অরে বীরগণ ! অনন্তকালের জ্ঞাত তোদের সম্মানদের দাসত্ব শৃঙ্খল শত্রুহস্তে অবলোকন কর । পরের কার্যের জ্ঞাত এ বাহুর সৃষ্টি হয় নাই, লোহভার বহন জ্ঞাত আমরা তরবারি ধারণ করি নাই । মৃতিকার নিম্ন হইতে ভীম ও দ্রোণের অস্ত্র উৎসাহিত করিতেছে । এ কুকর্ষের মাঠ । হয় জয়, নয় স্বর্গ করতলস্থ হইবে । আমরা মুগ্ধ হইয়া বহুদূর ভ্রমণ করিতে লাগিলাম । এই সরস্বতীর তীরে আর্যেরা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । এই নদী ইহার তীরে কতবার ঋষি মুখনিসৃত বেদ গান শ্রবণ করিয়াছে ও কতবার উৎসাহপূর্ণ বীরগণের মুখাস্তি দর্শন করিয়াছে । এই জলের গুণেই নিখিল বেদ অসংখ্য পুরাণ ও ভূরি দর্শন আবির্ভূত হইয়াছিল । এ জল পান করিলে কি আর সে ভাব উদয় হইবে, না সে তেজ আবির্ভূত হইবে । বীরপূজিতা সরস্বতী এখন ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে । বাহা হটক এই প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে হিসার বা হরিয়ানার জঙ্গলে সিংহ পাওয়া যায় । এখানকার গাভী বৃহৎ, সুন্দর ও দুগ্ধবতী । এক এক বাঁড় চারি হাত পর্যন্ত উচ্চ হয় । পানিপথের পিতলের বাসন মন্দ নহে ।

অস্থান হইতে উত্তর মুখে শিমলা পথ । কালকা পর্যন্ত ৩৮ মাইল ভাকগাড়ী ভাড়া চারি টাকা । পথে ২১ মাইল পরে ষাগর নদী । তদনন্তর কালকার নিকট উৎস ও নিকুঞ্জ শোভিত পতিয়ালা রাজের বিখ্যাত পিঞ্জর উদ্ভান । কালকার পর পাছাড়ের উপর নূতন পথে ৫৬ ও প্রাচীন

পথে ৪১ মাইল ঘোড়া ঝাঁপান ডাঙী বা টোঙ্গার যাওয়া যায় । ঝাঁপান ডাঙা নুতন পথে ১৭ ও প্রাচীনে ১৩ টাকা । গবর্ণমেন্টের হাওয়াদি শিমলার শোভা । এখানকার পার্কতীয় ও আরণ্য সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার । উত্তরে হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ সকল ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সুন্দর ভাবে সজ্জিত । দক্ষিণে অসিতবর্ণ গিরির মধ্যে মধ্যে গভীর খাত । দক্ষিণ পশ্চিমে সুবাতুর পাছাড় । দূরে শতক্র সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছে । নিকটে চারিদিকেই পর্বত । তরুণি অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল বিশাল শীর্ষ উন্নত করিয়া হরিত শোভা বিস্তার করিয়াছে । তাহার শাখায় অতি সুন্দর পক্ষী সকল গান করিতেছে । শিমলা প্রায় ৭ হাজার ফীট উচ্চ । এখানে গ্রীষ্মকালও শীত । এবং শীতকালের ষাঠাদি গ্রীষ্মে পাওয়া যায় । কিন্তু বাদ্যলীর ষাঠ অতি দুর্ঘূলা । পূর্বের জায় শিমলা আর স্বাস্থ্যপ্রদ নাই । এখানকার পার্কতীয় মধু অতি উৎকৃষ্ট । এখানকার পার্কতীয় স্ত্রীলোকেরা দেখিতে মন্দ নহে । পয়সা পাইলে পতি ও পিতা স্ত্রী কষ্টা ছাড়িয়া দেয় । বহু স্বামিও ইহাদের পক্ষে দোবাবহ নহে ।

অস্থলা হইতে কুকক্ষেত্রে বা শিমলা না গিয়া অগ্রসর হইলে রাজপুরা ফেনন । এখানে মোগোল সম্রাটদিগের প্রাসাদ চূড়া ও বুকজ বিশিষ্ট পাহাশালা ও জেলখানা আছে । এখান হইতে পতিয়ালা ২০ মাইল দূরে থাকে । তদনন্তর ভয় সহর সরহিন্দ । তাহার পর শাল ও পশমী কাপড়ের "প্রধান স্থান লুধিয়ানা । কাশ্মীরী কারিকর আছে কিন্তু, কাশ্মীরের তুলা শাল হয় না । নগরে বিস্তর লোদী মুসলমান থাকায় লোদীয়ানা নাম । লুধিয়ানা পার হইয়া নিম্ন ও সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে যাইতে কিলোর কেল্লার নিকট সমতলনের বিস্তৃত সেতু । গ্রীষ্মকালে শতক্র ৫০০ হাত বিস্তৃত ও ৫ হাত গভীর থাকে । বর্ষায় পুলের নিকট প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত হয় । ভয়ঙ্কর আহনজুল ভীমরূপ, পূর্বে এই নদের নাম হৈমবতী ছিল । প্রাণত্যাগার্থ বশিষ্ঠ নদীতে ঝাঁপ দিলে শত ধারায় দ্রুত হয় বলিয়া শতক্র নাম হইয়াছে । সেতুর কয়েক মাইল পশ্চিমে শীক ও ইংরেজদিগের ভয়াবহ যুদ্ধভূমি আলিওয়াল ও সোব্রায়ন । ষাদশ দিবস রক্তপ্রাণী যুদ্ধের পর শীকেরা সোব্রায়ন ভাগ করিয়া শতক্র পার

হয়। সেতুর কিছুদূর পরে সেনানিবেশ স্থান জলন্দর। জলন্দর নগরে লৌদীগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মসজিদ সকল তাহাদের পূর্ব রাজধানীর সাক্ষা প্রদান করিতেছে। এ প্রদেশের ভূমি উর্বরা ও যুক্তিকার নিম্নে দুই তিন হাত খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। জলন্দর হইতে হাশিয়ারপুর ২৫ ক্রোমিট ১৮ পরোয়েন ১৬ দেয়ারা ১৬ কান্দারা ২৫ ও ধর্মশালা ছাউনী ১৬ মাইল। একা ভাড়া সাড়ে সাতটাকা। কান্দারা বা নগরকোট দুর্গ এক ক্ষুদ্র পর্বতোপরি সংস্থাপিত। এখানে হিন্দুদিগের তীর্থ মহামায়ার মন্দির আছে। পূর্বে এই স্থানে বিস্তর অর্থ সঞ্চিত ছিল। মহম্মদ গজনবী আসিয়া সেই সকল অর্থ লুণ্ঠন ও তীর্থ মন্দির ভগ্ন করিয়া যান। এ প্রদেশ পর্বতময় সত্য কিন্তু নিম্ন স্থানে বিস্তর ধাতু জন্মে। কান্দারার ৭০ মাইল দিশান কোলে মনিকর্ণি তণ্ডকুণ্ড। ইহার জল এত উত্তম যে বস্ত্রে তওল বাঁধিয়া দিলে দেখিতে দেখিতে অন্ন হয়। কান্দারার ২৫ মাইল ও বড় ব্যাস নদীর ৭ মাইল দূরে জ্বালামুখী তীর্থ। পর্বতোপরি জ্বালামুখীর মন্দির, শিবালয়, নানাদেব মন্দির ও নির্ঝল সলিলপূর্ণ কুণ্ড। জ্বালামুখীর মন্দিরের গম্বুজ ও কলস স্তব্ধবর্ণে জাজ্বল্যমান। সভ্যমণ্ডপে নেপালরাজদত্ত প্রকাণ্ড যণ্টা ঝুলিতেছে। দ্বারটী রৌপ্যমণ্ডিত। অভ্যন্তরে ৩ হাত লম্বা ১১০ হাত প্রস্থ ও ২ হাত গভীর এক কুণ্ড। কুণ্ডের মধ্যে বায়ুকোণে ৪৫ অঙ্গুল ছিদ্র হইতে ১ হাত উচ্চ অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। কুণ্ডের আর কয়েকটি ছিদ্র হইতেও অগ্নিশিখা বাহির হয়। কুণ্ড ব্যতীত মন্দির ভিত্তির কোণ হইতেও একহাত অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তর ভিত্তির স্থানে স্থানে ছিদ্র দিয়া দীপশিখার ত্রায় কখন কখন অগ্নি জ্বলিয়া থাকে। মন্দিরের বায়ুকোণে শীতলজলপূর্ণ কুণ্ড। কুণ্ডের নাম গোরখড়িকি। সতীর জিহ্বা পতন স্থান, এই পীঠাদি দর্শন করিয়া জলন্দর ফিরিবে বা কুলু উপত্যকা দিয়া কোকসল দেখিতে যাইবে। জলন্দরের পর কপূরতলার নিকট কিরতারপুর ফৌজান। ইহার পর ১৪ মাইল দূরে ৬৬ হাত অন্তর ২৯ খণ্ড বোজিত বেরা বা বিপাশার সেতু। পাছে পুলের নিকট বাসুকা কাটিয়া বেগ পরিবর্তন করে এজন্ত শ্রোত ঠিক পথে রাখিবার নিমিত্ত বহুদূর হইতে বাঁধা হইয়াছে। জলের, নিম্নে ২৮ হাত পর্য্যন্ত স্তম্ভ প্রোথিত আছে।

পাশবদ্ধ বশিষ্ঠ এই জলে পতিত হইয়া। পাশহীন হন, এজন্ত নদীর নাম বিপাশা হইয়াছে ।

বিপাশার পর ২৭ মাইল সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া অমৃতসর । নগরের চারিদিকে প্রাচীর পঞ্চগুলি পরিষ্কৃত প্রশস্ত ও জমাকীর্ণ । বিলাতী কাপড় আশ্রা দিল্লীর জ্বা চিনি শস্ত ও পশ্বাদি বিক্রীত হইতেছে । শাল ও পশমী কাপড়ের কারখানায় সহর পূর্ণ । অমৃতসর শীকদিগের মহা-তীর্থ । পূর্বে ইহার নাম চক ছিল । পরে শীকগুরু রামদাস ১৫৮১ অব্দে অমৃতসর নামে প্রকাণ্ড তীর্থ পুষ্করিনী খাত করে । পুষ্করিনী চতুর্কোণ । এক এক দিকে প্রায় ১৩৫ কদমা । রঞ্জিতসিংহ ১৭ ক্রোশ এক খাত দ্বারা ইহার সহিত ইরাবতী নদীর যোগ করিয়া দিয়াছেন । পুষ্করিনী মধ্যে দ্বীপ । তন্মধ্যে ৩০ হাত সমচতুর্কোণ ২০ হাত উচ্চ ও স্বর্ণবর্ণে জাজ্বল্যমান গুরু গোবিন্দের মন্দির । মন্দির মধ্যে উৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ, নিম্নে গুরু নানকের ধর্ম পুস্তক । পাঠানরাজ নিষ্ঠুর হোসেন আবদালী এই মন্দির ভগ্ন ও ভুই বার গোরতে দূষিত করে । শীকেরা যবন রক্তে ধোঁত করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়াছে । মন্দিরের পার্শ্বস্থ স্তম্ভের উপর হইতে নগর শোভা দেখিতে অতি সুন্দর । পুষ্করিনীর অনতিদূরে একটা উৎকৃষ্ট ষটিকা-স্তম্ভ আছে । অমৃতসরের রামবাগ দেখিবার যোগ্য । নগরের ৩ মাইল দূরে রঞ্জিত সিংহের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দগড় । এখন পঞ্জাব মধ্যে অমৃতসর নগর উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় । অমৃতসর পার হইয়া লাহোরের ছাউনী মিরানমিয়ার । এক দিন সার চার্লস নেপিয়র বেড়াইতে গিয়া স্থায়ী নাম স্মরণার্থ জলহীন, বৃক্ষহীন, নীরস বালুকাময় এই কবর-ক্ষেত্রে সহর নির্মাণ মানস করিলেন । তদবধি ইহার উৎপত্তি হইল । ফেসন হইতে ৩ মাইল দূরে গির্জা, গবর্ণ-মেন্ট হাউস লরেন্স মণ্টগমরি হল ও পশ্বাদি পূরিত লরেন্স উদ্যান দেখিবার যোগ্য । তাহার পর উদ্যান ও হর্ম্যাদি শোভিত আনারকুলি । রাজপ্রিয়-তমা আনারকুলি দ্রষ্টা হওয়ার জীবিতাবস্থায় তাহাকে প্রোথিত করা হয় । ইংরাজেরা তাহার অস্থি, স্তম্ভ নিম্নে প্রোথিত করিয়া তদীয় কবর হর্ম্যে গির্জা করিয়াছেন ।

আমারকুলির পর রাভী নদীর ১ মাইল পূর্বে পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর। ফেঁসনটী সুরক্ষিত। বিপক্ষ আক্রমণ করিলে চতুর্দিক রোধ করিয়া তোপ সাজান যাইতে পারে। ফেঁসনের ৪০০ গজ পরেই লাহোরের দিল্লী দরজা। লাহোর অতি প্রকাণ্ড সহর, চারিদিকে সুরক্ষিত ভিত্তি প্রায় ২০ হাত উচ্চ। নগরের উত্তর পশ্চিমে ইরাবতীর দক্ষিণ ৭ মাইল বিস্তৃত কেল্লা। কেল্লা মধ্যে রঞ্জিতের উৎকৃষ্ট ভগ্ন গৃহ। পার্শ্বে তাঁহার মার্বেল শোভিত কবরালয়। তদনন্তর আরংজেব নির্মিত বাদসাহ মসজীদ। এক প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে লাল-প্রস্তর নির্মিত ও গম্বুজত্রয় ভূষিত এই মসজীদ নয়নগোচর হয়। মসজীদের স্তম্ভ হইতে লাহোর দেখিতে অতি সুন্দর। উজীর খাঁর কবর হুয়া শীকেরা শূকররক্তে দূষিত করিয়া অশ্বশালা করিয়াছে। লাহোরের সনারা মসজীদও মন্দ নহে। নৌকা সেতুতে ইরাবতী পার হইয়া লাহোরের ২ মাইল উত্তরে সাহাহরা বা জেহাদিরের কবর। প্রবেশ দ্বারের পর চারিদিকে ভিত্তি-বিশিষ্ট নারাজী ব্লকপূরিত একটা মনোহর উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে লালপ্রস্তরে প্রথিত, মার্বেল শোভায় শোভিত ও চারিকোণে ৪৬ হস্ত স্তম্ভবিশিষ্ট একটা সুন্দর হুয়া। শ্বেত-মার্বেলের উপর কাল অক্ষরে জেহাদিরের নাম ও নানাস্থানে ঈশ্বরের নাম লেখা আছে। কিন্তু অনেক প্রস্তর উৎখাত হওয়ায় সৌন্দর্যের হ্রাস হইয়াছে। অল্প দূরেই ইহার জবাব হুয়া। রাভী নদীর ধাকায় এখন উদ্যান প্রাচীর বিনষ্ট হইতেছে। লাহোরের ৩ মাইল উত্তর পূর্বে জয়ের বাটী, সাজেহানের সলিমাবাগ। উদ্যানটী-অর্দ্ধমাইল লম্বা। মধ্যে ৪৫০ ফোয়ারা ও তিন প্রশস্ত উচ্চ বেদী উপর্যুপরি উঠিয়াছে। রঞ্জিত সিংহ ইহার মার্বেল খুলিয়া অমৃতসর শোভিত করেন। মটগময়ি হল ও মিউজিয়ম দেখিবার যোগ্য। রণজিতের সময় লাহোর ত্রিবিংশতী ছিল। পরে তাঁহার বংশাবলীর গৃহ বিচ্ছেদে উপদ্রব আরম্ভ হইলে বহুলোক অমৃতসর ও জীনগরে পলায়ন করে। ১৮৪৬ অব্দে হার্ডিঞ্জ এই নগর অধিকার করেন। লাহোরে অমৃতসর বর্ণিত সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্জাব অতি নীরস ভূমি, গ্রীষ্মে তরকারি গ্রীষ্ম। জোয়ার বাজরা আদি

শস্য হয়। কিন্তু এখানকার গোধূম অতি উৎকৃষ্ট। মধ্য এশিয়ার অনেক দ্রব্য এই প্রদেশে বিক্রীত হয়। এখনও পঞ্জাবের আচার প্রাচীন মস্ত্র আচারের স্থায় নিন্দনীয়। কর্ণ মহাভারতের মস্ত্রদিগের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। প্রাতঃকালে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে ছাদের উপর উঠিয়া প্রকাশ্যভাবে মল মূত্র ত্যাগ করে। কেহ কেহ শুষ্ক হইলে সে গুলি বিক্রয়ও করেন। পাক পাত্রে উপরে কালি থাকুক ক্ষতি নাই, অভ্যস্তর পরিষ্কৃত হইলেই শুদ্ধ। এক জনের ঢুলা বা তন্দুরা থাকিলে পাড়ার লোকের কটি হয়। যদি লাঠির মস্তকে কটি বাঁধা থাকে পথ দিয়া যাও মুসলমানে স্পর্শ করিলে দোষ নাই। স্ত্রীলোকের স্নানপ্রথা অতি জঘন্য। ভিত্তীর জলে দোষ নাই, লোটার চর্ম চোকিলেই দোষ। এইরূপ অনেক প্রথা পঞ্জাব ও রাজপুতানায় দেখা যায়। শীকেরা নথ দাড়ি রাখিয়া থাকে। নাপিতের সহিত সম্বন্ধ নাই। এখানকার ভয়ঙ্কর চামচিকা জাতীয় জন্তু দেখিবার যোগ্য।

লাহোর হইতে এক রেল মুলতান ও অপর রেল পেশোয়ারের দিকে রেলম গিয়াছে। পশ্চিম দক্ষিণগামী বামরেলে ডাইনে ইরাবতীর ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে বহু স্টেশন পার হইয়া মুলতান। পৃথিবীতে এরূপ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া এত অধিক দূর রেল অতি অল্প গিয়াছে। ২১৯ মাইল প্রায়ই সরল রেখা। কেবল বর্ষায় প্রাবিত হয় বলিয়া উপযুক্ত স্থানে বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। মুলতান চন্দ্রভাগা ইরাবতী ও বিত্তস্তা মিশ্রিত ত্রিমারের ৩ মাইল পূর্বে অবস্থিত। কিন্তু বর্ষায় এই নদী দুই হাজার হস্ত বিস্তৃত হয় ও বহা হইলে মুলতানে জল প্রবেশ করে। মুলতানের চারিদিকে খাজুর গাছ ও উদ্ভান। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অতিশয় গ্রীষ্ম হয়। এখানকার দুর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। দুর্গের পরিধা বিস্তৃত ও গভীর, তৎপরে ২৬ হাত উচ্চ ভিত্তি, তদুপরি ৩৭ শৃঙ্গ ছিল। ২২০০ বর্ষ পূর্বে পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর আলেকজান্ডার এই নগর দখল করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ২৭ দিন অবরোধের পর ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে এই নগর ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। ৪ লাক পাউণ্ড বাকদ দ্বারা ইংরেজেরা ইহার ভিত্তি ভেদ করেন। কতক অংশ ভিত্তি বহায নষ্ট হইয়াছে। মুলতান নিকটে বহর মসজিদ

ও দেবালয়ের অনেক ভগ্নাংশেব আছে । উত্তরে সাম্ভাত্রোজির কবর ।
 কথিত আছে সাম্ভাত্রোজিকে বধ করিলে সূর্য্য তাঁহার ভক্তনায় মূলতানে
 অধিকতর তাপ দিতে আরম্ভ করেন । মূলতান ও সিন্ধুদেশে হিং উৎপন্ন
 হয় । পঞ্জাবের মধ্যে এই স্থানের আশ্রিত উৎকৃষ্ট এবং এই প্রদেশেই অনেক
 ফুল কল উৎপন্ন হয় । বণিক পুরিত মূলতানে রেশমী পশমী ও কার্পাসের
 বস্ত্রাদি বিস্তর উৎপন্ন হয় । মূলতানে গ্রীষ্মের সময় ভূরি গোলাপের পাক-
 ডীর উপর সূক্ষ্ম চাদর বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিতে বড় আরাম বোধ হয় ।
 লাহোর হইতে বামরোলে মূলতান গমন না করিলে ডাইনরোলে ইরাবতী ও
 চন্দ্রভাগা পার হইয়া গুজরাট ফৈমন । গুজরাটে নামিয়া কাশ্মীরের
 পথ । বৈশাখ অবধি কার্তিক পর্য্যন্ত পথ বরফশূন্য থাকে । গুজরাট
 হইতে ৩০ মাইল দূরে তিস্বরের সমগ্র গাড়ী ভাড়া ১১ টাকা । পরে
 সয়দাবাদ ১৫ মাইল, নোঁসিরা ১২০ চাঙ্গা সরাই ১৩০ রাজ্জোরি রামপুর ১৪
 থানামণ্ডি ১৪ বরমগালা ১০০ পোসিয়ানা ৮ আলাবাদ সরাই ১১ হিরপুর
 ১২ সাপিয়ন ৮ রায়ু ১১ ও জীনগর বা কাশ্মীর নগর ১৮ মাইল । সাকলো
 তিস্বর হইতে ১৪০০ মাইল । আড্ডা প্রতি কুলিভাড়া চারি আনা,
 বেহারা ছয় আনা, গাধা আট আনা ও ঘোড়া এক টাকা । কুলি ২৫ সের,
 ও গাধা দুই মন বোকাই মাত্র লইবে । চৈত্রের শেষে শীতপনজল পৰ্ব্বতে
 অধিক বরফ দেখিলে অনেকে থানামণ্ডি হইতে পঞ্চ ও হাজিপুর ও উন্নী-
 দিয়া যায় । কিন্তু এই পথে জীনগর ১৮৭ মাইল হইবে । কাশ্মীর প্রবে-
 শের কোটলি, পঞ্চ, উরি, বরমুলা দিয়া একপথ, আবতাবাদ, মুজঃকরাবাদ,
 বরমুলা দিয়া এক পথ ও মুরী, কোহালা, বরমুলা দিয়া একপথ ইত্যাদি
 ভারত হইতে সর্বশুদ্ধ ছয়পথ আছে । তিস্বত ও তাতার হইতে উত্তরে
 প্রবেশের আর ছয় পথ আছে । এখন আমরা গুজরাটে উপস্থিত । গুজ-
 রাটে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম । সকলেই জল জল করিয়া ব্যস্ত । কঠিন শরীর
 জ্ঞান, সর্বজ্ঞ দৃষ্টপ্রায় । সূর্য্যের কি নির্দয় তাপ, বায়ুর কি অগ্নিসম ঝঞ্ঝা,
 অনবরত আকাশে সৌরতেজ কম্পিত ও ভূমির উষ্ণতাস নির্গত হইতেছে ।
 জগৎ নীরব ! প্রকৃতি মৃতপ্রায় । কণে কণে সূর্য্যবায়ু ও অগ্নিফুল্লিঙ্গের
 জ্বালা কঁকর বর্ষণ । বিকট তেজে জগৎ পরিব্যাপ্ত । চক্ষু উন্মীলন করে

কাছার সাধা? যেন শত শত তেজ সৃষ্টিকার জ্বায় চক্ষে প্রবেশ করে।
 রসের লেশ নাই, ত্বণের সম্পর্ক নাই, হরিতের নাম নাই, শূন্য জগতের
 চারিদিকে যেন ততালন হু হু করিতেছে। নিদাক্ষণ দিবার সকলেই সমস্ত,
 সকলেই ব্রহ্ম, সকলেই যন যন স্বাস পড়িতেছে। সুতরাং রাত্রিকালে
 যাত্রা করিতে হইল। যাইতে যাইতে যামিনী শেষে নিবিড় নীরদখণ্ড দিক্
 প্রান্তে লম্বমান। বোধ হইল ঘোর রুষ্টি হইবে। বস্তুতঃ তাহা মেঘ
 নহে। হিমালয়ের রূপ আকাশে আবির্ভূত। অনতিকাল পরেই আমরা
 ভীষ্মের উপস্থিত। পর্বতক্রোড়ে ভীষ্মর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম। যর-
 খাল ছোট ছোট মাটি ও প্রস্তর নির্মিত। চটীর লোক যেরূপ দুর্ভ
 সে পক্ষে ভীষ্মরবাসীগণ কিঞ্চিৎ বেশী বই কম নহেন। ভীষ্মর পার
 হইয়া জঙ্গলশূণ্য পর্বতের পাকে পাকে পথ উঠিয়াছে। কিছু দূর পরেই
 আদাতক পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গ। শীতল সুখসেবা সমীরণ সেবিত এই
 পর্বতশৃঙ্গ হইতে অবরোহণ মাত্র সময়বাদ গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। আদা-
 তকের উচ্চ শৃঙ্গে দক্ষিণের ঝঞ্ঝা বারিত হওয়ায় এই স্থান হইতে গ্রীষ্ম-
 মণ্ডলের ভাব পরিবর্তিত প্রায়। বায়ু অপেক্ষাকৃত অমৃদ। পর্বত-
 গাত্রস্থ বনরাজির নিবিড়তা আর নাই। উচ্চতারও বিলক্ষণ ভিন্ন ভেদ।
 বনমধ্যস্থ একাণ্ড প্রস্তর সকল সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত। সময়বাদ ত্যাগ
 করিয়া পুনরায় আদাতকের জ্বায় আর এক শৃঙ্গ। ইহার গাত্রে কেলুস্ক
 সকল বায়ু ভরে উচ্চ শির কল্পিত করিয়া শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছে।
 এই গিরি পার হইয়া উপত্যকা মধ্যে নৌদিরা গ্রাম। নৌদিরা অতি
 মনোহর স্থান। চারিদিকে গিরি সকল বিরল পাদপ সমূহে ভূষিত।
 উপত্যকার মধ্যে মধ্যে হলকর্ষিত ক্ষেত্র। পল্লী পার্শ্বে পিচ, লেবু,
 নাশপতি প্রভৃতি বৃক্ষ ভূরি ভূরি ফলপ্রসব করিয়াছে। এবং নানা-
 বিধ পক্ষীগণ পত্রের অন্তরালে বসিয়া মধুর স্বরে কুজন করিতেছে।
 নৌদিরা হইতে উপত্যকা ভূমি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া নানা শোভার আধার
 হইয়াছে। কোন স্থলে শান্তপূর্ণ ধাতুকেন্দ্র, কোথাও বা পর্বত পার্শ্ব
 থাকে থাকে হরিত শোভায় মণ্ডিত। তাহার মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ
 মুক্তামালার জ্বায় ঝক ঝক করিতেছে। এই সুদীর্ঘ উপত্যকা ভূমি পার

হইবার কালেই চালা। সরাই ও রামপুর দুর্ভাগোচর হইবে । এখন সরাই-
 য়ের নিতান্ত মলিনাবস্থা । যোগোল সন্ধ্যাটেরা কাশ্মীর যাতায়াত কালে
 ৪৫ হাজার রক্ষক, ৪ লক্ষ সৈন্য, দেড় লক্ষ কর্মচারী ও এক লক্ষ উষ্ট্র গবাদি
 সহ এখানে কিস্তিকাল বিশ্রাম করিতেন । আমরা ক্রমাগত চলিতে লাগি-
 লাম, উপত্যকাও ভ্রূষ হইয়া নিবিড় পর্বতে অন্তর্হিত হইল । আমরাও
 রতনপীর পর্বতপ্রান্তে থানামুণ্ডী গ্রামে পৌঁছলাম । থানামুণ্ডীর পর
 পর্বত নিতান্ত উচ্চ ও তাহার প্রস্রদেশ বাননপূর্ণ । বহুক্ষেত্রে বনভাগ পার
 হইয়া ৮০০০ ফীট উচ্চে উপস্থিত । এখানকার দৃশ্য অতি চমৎকার । নয়ন
 বিক্ষারিত হয়, হৃদয় প্রসারিত হয় । পর্বতের শিখরদেশ অসিতবর্ণ উন্নত
 কায়লমালার ভূষিত । নিম্ন দেশে নিবিড় অরণ্যমি । সম্মুখে গভীর
 খাত ও দূর কুহিনরাশি । কক্ষে উত্তরঢাল দিয়া নামিবার সময় সতেজ
 বনরাজির সরল মস্তক, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কায়ল রক্ষ, দোহুলামান লতা
 ভুরি ভুরি বস্তকল ও ঝাঁকে ঝাঁকে বানর দেখিয়া মন পুলকিত হয় । নিম্নে
 গভীর খাতঘরা যেন পর্বতে বিধা হইয়াছে । তথায় বরষগালা গ্রাম ।
 বরষগালার পর একটা জ্যোতস্বতী বাতেরিতমালার জ্বায় বক্রভাবে পর্বত
 মধ্যে শিলাতটের পার্শ্ব দিয়া তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে । বারম্বার
 সেতুযোগে এই নদী পার হইয়া আমরা ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম,
 কিছুদূর পরে পর্বত গাত্রে পোন্সিয়ানা । পোন্সিয়ানার ক্ষুদ্র গৃহগুলি
 পর্বতগাত্রে এরূপ সংলগ্ন যে, ছাদের উপর স্বেচ্ছামত পর্বতে চরিতে
 চরিতে ছাগ সকল বিচরণ করিতেছে । পোন্সিয়ানা পার হইয়া পথের
 বিকটতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল । কিছু দূর পরে পর্বতগাত্র লম্বভাবে
 উন্নত । সহস্র কীট নিম্নে এক গর্জনকারী নদী ক্লেণরাশি উদ্যৌরন করি-
 তেছে । পদে পদে স্থলন সম্ভব ও মধ্যে মধ্যে বরফ রাশি, অতি সাবধানে
 নিতান্ত ভীতমনে আস্তে আস্তে এই ভাগে আরোহণ করিয়া আমরা পীর-
 পঞ্জলে উপস্থিত হইলাম । পীরপঞ্জল সাগর হইতে প্রায় সাড়ে এগার
 হাজার ফীট উচ্চ । ইহার দক্ষিণে পর্বত সকল ধাপে ধাপে নিম্ন হইয়া
 ক্ষেত্রের সহিত দূরে মিলিত । উত্তর ভাগ ক্রমে নিম্ন হইয়া কাশ্মীরের সমি-
 হিত হইয়াছে । পথের উত্তর পার্শ্বে বরফমণ্ডিত শিখর । পর্বতের স্থানে

স্থানে পুষ্পরক্ষ । ফুল গুলি এত সুন্দর যে, আমাদের সমতল ভূমিতে তাদৃশ উজ্জ্বল বর্ণ পাওয়া মিতান্ত্র দুর্লভ । পার্বত্যের উপরিস্থিত পুষ্প মাত্রেরই রং পৃথিবীর নিম্ন ও সমতল ভাগস্থ পুষ্পের অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল । গীরপঞ্জল পার হইয়া আল্লাবাদ সরাই । ইহার চারিদিকে উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ । এক একটা একবারে চৌদ্দ হাজার ফীট উচ্চ হইয়াছে । পার্বত্যের অধোভাগ কারলরুকে বেষ্টিত, তদুর্দ্ধে ভাগে ভূর্জতরুর বেড়ন, তদুর্দ্ধে দুই একটা সামান্য রক্ষ, তদুর্দ্ধে বরফমণ্ডিত শিখর ক্রমেই উজ্জগামী হইয়াছে । তথায় রক্ষ নাই, বীকথ নাই, তৃণ নাই, লতা নাই, প্রাণী নাই, কেবল বরফ ধক ধক করিতেছে । এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । প্রকাণ্ড দেবদারু ও ভূর্জবনের নিম্ন দিয়া যাইতে যাইতে পার্বত্য খাত ক্রমে বিস্তৃত হইয়া যে কাশ্মীর রূপে পরিণত হইবে তাহার পূর্ব লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল । কিছু দূর পরেই সাপিয়নে কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত । সাপিয়ন হইতে কাশ্মীরপর্যন্ত ১৫ কোশ সরল পথ । পাঁচ মাইল দূর থাকিতে পথের উত্তর পার্শ্বে মোগল সম্রাটদিগের রোপিত অতি সুন্দর রক্ষরাজি । বিস্তর লোক গমন করিতেছে । দেখিয়া বোধ হইল, আমরা কোন মহানগরের সমীপবর্তী হইতেছি । কাশ্মীর দেশের স্বভাব শোভা অতি মনোহর । কিবা নবদুর্জাদল, কিবা শ্রাম তরুতল, কিবা তটিনীর মনোহর রূপ, কাঁকে কাঁকে ফুল যে কত ফুটিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, কত গোলাপ, কত জাতি, কত যুধি, কত রজের কত ফুল কতরূপে কত দিক আকীর্ণ করিয়াছে । ফলভরে অবনত গাছ ভূরি ভূরি । পদে পদে পষ কুসুম কল্লার পুরিত সরোবর । নিকুঞ্জ লতাবিতান ও বিটপীর শেষ নাই । তাহারই মধ্য দিয়া কুলু কুলু রবে কল্লোলিনী সকল প্রবাহিত । ক্রমরের গুঞ্জন, পক্ষীকুলের কলরব ও পশুগণের সাক্ষাদ শব্দ নিরন্তর কর্ণগোচর হয় । শীত ব্যতীত ষড়ঋতুর ক্লেদদায়ক কোন ভাব নাই । যেন ঋতুরাজ সদা বিরাজ করিতেছেন । কি মাঠ, কি বন, কি আরাম যেখানে ইচ্ছা বিহার কর, শয়ন কর, ভোজন কর, গড়াগড়ি দেও, কি ব্যায়াম, কি সর্প, কোন হিংস্র জন্তুর ভয় নাই । বনে গাছতরা আছুর, যত ছেঁড় যত খাও, কাহারও কোন আপত্তি নাই ।

নদীতে পরম্পা নামক নৌকা যোগে লোক অধিক গমনাগমন করে। নৌকা গুলি ছোট ছোট ও সুন্দর। তাহাতে বসিয়া তীরের কল ছিঁড়িয়া খাইতে খাইতে গাছের ছায়ায় লোকে চলিয়া যায়। হিমালয় যেন কাশ্মীরকে ছদ্মবেশে ধারণ করিয়া অত্যাচ্ছন্ন শৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া আছেন। শৃঙ্গ সকল বরফাবৃত ও লম্বমান মেঘমালায় সুশোভিত। সূর্যের উদয় ও অস্ত সময়ে ইহার সৌন্দর্য্য বর্জিত হইবার নয়। স্থল শোভা, জল শোভা, পার্বত শোভা, বন শোভা, সর্ব্বশোভায় কাশ্মীর শোভাষিত। প্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্রিত করিয়া যেন কাশ্মীরে বিকসিত হইয়াছে। সামান্য কাষ্ঠে শস্ত্রাদি হয় ও বিনা ক্লেশে ফুল ফল জন্মে। আমরা দীর্ঘ ৫৫ ও প্রস্থ ৩০ ক্রোশ এই রূপ দেশের প্ররূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কাশ্মীর নগর পত্ত-
 ছিলাম। জীনগর বা কাশ্মীর নগর বিস্তার উভয় তীরে ৪ মাইল লম্বা। ভূকম্প ভয়ে গৃহের অধিকাংশ ভাগ কাষ্ঠ নির্মিত কিন্তু তিন চারিটল
 বিশিষ্ট। লোকে গুলরেজি মেলার জন্ত ছাদের উপর মৃত্তিকা দিয়া পুষ্প-
 বৃক্ষ রোপণ করে। গবাদি দ্বার সকল সুন্দর কাষ্ঠখচিত, শীতে শীতভয়ে
 সুক্ষ্ম কাগজে মণ্ডিত থাকে। পথ সকল সঙ্গীর্ণ ও জনাবৃত। নৌকার
 অধিক ব্যবহার জন্ত নদীও লোকান্তর। নদীতে ভদ্র জীলোকদের স্থানের
 জন্ত সিঁজুকের দ্বারা এক একটা কাষ্ঠের ঘর তাসিয়া থাকে। কুস্তীরাদির
 কোন উৎপাত নাই। নদীর উপর সাতটা কাষ্ঠের সেতু। গৃহ সকল নদীর
 এত নিকট যে, লোকে বারান্দা হইতে জল তুলিয়া লয়। নগরের উত্তরস্থ
 ২৫০ কীট উচ্চ হরি পার্বতের কেল্লার উপর উঠিলে জীনগর দেখিতে অতি
 সুন্দর বোধ হয়। দক্ষিণে সেরগড় প্রধানদের বাসস্থান। দিল্লীর মোগল
 সম্রাটদের সময় কাশ্মীর অধিকতর শোভাশালী ছিল। বর্জিয়ার সাহেব
 যে ভূখ্যাদির বর্ণন করিয়াছেন তাহা আর নাই। এখন জাহাঙ্গিরের
 সৌন্দর্য্যসম্রাধিকৃত হইয়াছে। নদীম বাগের নিত্যন্ত মলিনাবস্থা, কেবল
 রাজার খানেক চনার বৃক্ষ আছে মাত্র। যে নশাভ ও সালমার বাগে
 জাহাঙ্গিরের স্মরণার্থে গলদেশে ছত্ৰাৰ্পণ করিয়া বিহার করিতেন এবং
 বাহাকে অর্গের নমুনা বলিতেন, আজ সেখানে ডাঙ্গাবাড়ী, শূক ফোয়ারা
 মরাগাঁহ ও চাসের ক্ষেত্র। জীনগরের বহির্ভাগ সমস্তই মনোহর উদ্যান

পূর্ণ। বিস্তৃত পার্শ্বে বহুদূর পরম শোভা। বাদসাহের পূর্বোক্ত উজ্জানের নিকটই কাশ্মীরের সর্বাধোক্ষা মনোহর ডল নামে বিশাল সরোবর। প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। পার্শ্বের স্থানে স্থানে পর্বত। কোথাও কোথাও জলের উপর ঘাস ঝোপ জঙ্গল কাষ্ঠ ও তক্তা বাঁধিয়া তাহার উপর মাটি দিয়া চারি পাঁচ হাত বিস্তৃত সুদীর্ঘ কৃত্রিম দ্বীপ করতঃ লোকে ভরমুজ ও খরমুজাদি বুনিয়াছে। মধ্যে কলমীর দামের মত এক একটা কাষ্ঠী পোতা। জুমার দিন এই সরোবরে নৌকাযোগে, কখন বা পদ্মবনের মধ্য দিয়া, কখন বা আঙ্গুর ও বেদমজমু কুঞ্জের নিম্ন দিয়া বিলাসীরা আহার ও গান করিতে করিতে আচ্ছাদ করিয়া বেড়ায়। দেখিলে মন ও নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। নৌকাযোগে বিস্তৃত্যে বেড়াইতে হইলে নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইবে। তথায় একদিকে তুঁত ঝাউ চনার ও সাফেদ বৃক্ষ সকল জলের প্রান্তপর্যন্ত বিস্তৃত। অপরদিকে উন্নত পর্বতশৃঙ্গ সকল অর্দ্ধ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। মধ্যস্থলে বিস্তৃত সলিল প্রায় তিনশত হস্ত বিস্তৃত। নৌকায আরোহণ করিয়া ডাইনদিকে দৃষ্টিপাত কর। সাহেবদের জন্ত কয়েকখান স্থিতল গৃহ। নিকুঞ্জ নিম্নে ইংরেজদের বিস্তর তায়ু। কিয়ৎকাল পরে বামদিকে কয়েকখান উৎকৃষ্ট গৃহ। তদনন্তর প্রথম সেতু। সেতু কাষ্ঠ-নির্মিত জল হইতে যত উচ্চ হইয়াছে তত স্তম্ভের পরিবর্তে কাষ্ঠের থাকে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া। পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া সেতুরূপ হইয়াছে। প্রথমা-বধি চতুর্থ সেতু পর্যন্ত মৎস্যধরা নিষিদ্ধ। ইহার পর বামদিকে রাজবাটী। কতকগুলি উৎকৃষ্ট ঘর ও মধ্যস্থলে স্বর্ণবর্ণ গম্বুজ বাক-বাক করিতেছে। ষাটে প্রস্তরের সিঁড়ি। উপরে উঠিলে এক বিস্তীর্ণ গৃহ। ইহার প্রত্যেক ইঞ্চি কাককার্ঘ্যে শোভিত ও বিচিত্র স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। দেখিলে বোধ হয় যেন কাশ্মীরের শিল্পনৈপুণ্য এই স্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে। রাজবাটী পার হইয়া ক্রমশঃ উভয়তীরে ভূরি ভূরি গৃহ। তাহার কত শত অংশ নদীর দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা এই সকল অংশ সুর-কিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল কাককার্ঘ্যেরই ষটা। তদন-ন্তর বিস্তর ঘাট। স্থানে স্থানে খোদিত প্রস্তরখণ্ড। এই স্থানে নদী ত্যাগ করিয়া খালে প্রবেশ করিলে কতকগুলি ভগ্নবাটী ও এক প্রকাণ্ড জমামসজীদ,

লোকে বলে এককালে এই মসজীদে ৬০ হাজার লোক একত্রিত হইত । চারিবার দম্ভ হওয়ার পর আরংজেব সংস্কার করেন । এখান হইতে পুনরায় নদীতে আসিয়া কিছুদূর গমন করিলে মহারাজার বাজার, বাজারের সম্মুখভাগ নদীর দিকে অনাবৃত থাকায় অতি অপূৰ্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে । বাজারের পর কয়েকটা মন্দির ও সেতু পার হইয়া গমন করিতে করিতে নগর শেষ হইল । নগরের উত্তর পূর্ব ভাগ খালে খালে বিচ্ছিন্ন । কাখীর রাজ্যের চারিদিক হইতে পর্বত কন্দর বিস্তৃত হইয়া এই উপত্যকা উৎপাদন করিয়াছে । এই সকল দরৌকন্দরে উপবেশন করিলে বিজ্ঞান ও কিসরগণের ক্রীড়াভূমি স্মৃতিপথে উদিত হয় । কয়েক পদ উপরে উঠিয়া পৃথিবীর অতীত বিবরণ আলোচনা করাও প্রীতিপ্রদ । তথায় খাতের মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের বাঁধ দৃষ্টিগোচর হইবে । প্রস্তরগুলি খাতের উত্তর পার্শ্বের পর্বতগাত্রস্থ বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু কে আনিয়া রাশীকৃত করিল ? খাতের উত্তর পার্শ্বও যশা । অতুল হিমালয়ের এই সকল উন্নত বিভাগে কে আনিয়া খাত ঘর্ষণ করিল ! সমস্ত হিমগিরিতেই দেখা যায় যে, যেমন পর্বত হইতে নিম্ন স্থানে নদী নামিয়া থাকে, সেইরূপ নিম্নস্থান পাইয়া খালদিয়া রাশীকৃত বরফ ও নামিতে থাকে । এই বরফ নদী অপ্পে অপ্পে যাইবার কালে সম্মুখে যত প্রস্তর পায় চেলিয়া লইয়া বাইতে থাকে । পরে যখন কোন উচ্চদেশ প্রাপ্ত হয় তখন বরফ নদীর সম্মুখভাগ গলিয়া যায় । প্রস্তরগুলি বাঁধের ভায় পড়িয়া থাকে । বরফ নদীর গাত্র ঘর্ষণে খালের তীক্ষ্ণ অংশ সকল ক্ষয় পাইয়া সমান হয় । প্রথম বাঁধের কিছু দূর পশ্চাতে আর এক বাঁধ, পরে আর এক বাঁধ । এইরূপ বরফ নদীর উৎপাদক পর্বত পর্যন্ত স্থানে স্থানে বাঁধ দেখা যায় । এতদ্বারা বোধ হইবে যে, দেশ ক্রমে যত উচ্চ হইয়াছে তত বরফের নদী অল্পদূর আসিতেই গলিয়া গিয়াছে । এখন কাখীর পূর্ব-পেক্ষা এত উচ্চ, যে বরফ নদীর উৎপাদক ঐ পর্বতের মস্তকে পর্যন্তও বরফ পড়িলে গলিয়া যায় । এক স্থানে হুই জাতীয় প্রস্তর একত্রীভূত দেখিলে বোধ হইবে যে, উত্তর নদীর সন্নিহনের ভায় বরফ নদীর সন্নিহন হইয়াছিল । পূর্বে অনেক দূর নিম্ন পর্যন্ত হিমালয় চিরবরকে আচ্ছন্ন

ছিল। কি নেপাল, কি দারজিলিং সর্বত্র এইরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়। যাহা হউক এই প্রকারে চারিদিকের বরফগলাজলে কাশ্মীর এককালে সরোবর হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থেও আছে কাশ্মীর সতীশ্বর নামে সরোবর ছিল। কশ্যপ ঋষি জল নির্গত করিয়া দেশ স্থাপন করেন, পর্বতের আর এক অংশে যে খাতের পার্শ্ব তীক্ষ্ণ আছে এবং গর্ভে ক্ষয়-যুক্ত নামাজাতীয় প্রস্তর বিকিণ্ড এবং জলপ্রবাহের অপরাপর লক্ষণ দেখা যাইবে সেদিক দুদিয়া নদী ছিল। জলের বেগে গর্ভস্থ প্রস্তরগুলি বিলোড়নে ক্ষয় পাইয়াছে। আমাদের দেশে নদীর জল কমিয়া গেলে তীরস্থ কূটাকাটার প্রেলী দেখিয়া জানা যায় যে কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল। পর্বতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের সারি দেখিয়া জানা যাইবে যে ঐ নদীর জল কতদূর বিস্তৃত হইত। এইরূপ কতস্থানে কত পরিবর্তনের চিহ্ন রহিয়াছে। কোথাও বা বিদীর্ণ পর্বত খণ্ড, কোথাও বা ভূকম্পে চালিত প্রস্তর, কোথাও বা চূর্ণীকৃত শিখর, কোথাও বা প্রস্তরসহ প্রকাণ্ড তুহিনপাত, কোথাও বা প্রবল বাতায় পতিত রাশি রাশি উপলব্ধ ইত্যাদি নানাস্থানে নানা চিহ্ন যুগ যুগান্তরীয় অবস্থা সকল প্রকাশ করিতেছে। এ দেবালয় নয় যে মূল-মানেরা চূর্ণ করিবে, গ্রন্থও নয় যে ভস্মসাৎ করিবে। স্থির নেত্রে হিমালয়ের একখণ্ড শিলার উপর দৃষ্টিপাত করিলে মন চিন্তা করিতে করিতে অনাদি কালের গভীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্বয়ে ও মোহে অভিভূত হয়। নর-নারায়ণ আশ্রম, যুধিষ্ঠিরের ফছিল দর্শন, ভগীরথের গঙ্গানয়ন ইত্যাদি সহ হিমালয়ের পূর্ব অবস্থা তৃতীয়খণ্ডে হিমবৎস্বর্গনে প্রকাশিত হইবে।

কাশ্মীর রাজ্যের নানাস্থানে নানাতীর্থ আছে। ত্রীনগরের ৮ মজিলী উত্তরে কাশ্মীরের প্রধান তীর্থ অমরনাথ। বর্ষমধ্যে শ্রাবণীপূর্ণিমায় মেলা ও দর্শন হয়। পথ অতি দুর্গম। শেষ ৭৮ কোশ অত্যন্ত বরফ। এক মজিলি থাকিতে লোকে উলঙ্গ বা ভূজ্জপত্র কোঁপিগ লইয়া গমন করে। পর্বত হইতে শিবলিঙ্গের স্মারক বরফ পিণ্ডাকার হইয়া গহ্বরে পড়ে। শুনা যায় এই গহ্বর তিব্বতপর্বত বিস্তৃত আছে, শুক্রাঙ্গরোদশী হইতে বরফ জমিয়া ৭ দিন মধ্যে ঐরূপ মূর্তি হয়। এবং তাহার পর কৃষ্ণপক্ষে গলিয়া অদৃশ্য হয়। তাহার ভিতর হইতে কখন কখন পায়রা বাহির হয়।

গহ্বর নিকটে নদীর কর্দম খেঁতবর্ণ । জীনগর হইতে ৩৫ মাইল দূরে ইসলামাবাদ নগরের নিকট বিতস্তা তীরে মার্ত্তণ্ড স্থান বা মটন সাহের । এখানে যাত্রীরা কুণ্ডে প্রাণাদিকর । পাণ্ডব নির্মিত এই মার্ত্তণ্ড মন্দির মুসলমানেরা দখল করিয়াছিল । ইহার গভীর কুপটীকে বাবলকুপ বলে । ইহার নিকটে সরোবরের একাংশে, গভীর গহ্বর আছে । ইংরেজেরা বলেন, মার্ত্তণ্ডমঠ পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বাবলম্ব । ইয়োয়োরোপীয় মতে দূর হইতে এই হর্যা দেখিলে তুরকের বালবেক ও পালমিরা, নিকটের তত্ত্বাবলম্ব দেখিলে ইরানের পারসিপালিস এবং মধ্যস্থ ভাগ দেখিলে গ্রীকদিগের সর্বোৎকৃষ্ট পারসেনন স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় । ট্রিবেক বলিয়াছেন যে, ইজিপ্টের পিরামিড ও গঠনের গাঢ়তায় ইহার নিকট পরাভূত হইয়াছে । কনিংহাম মন্দিরে হিন্দুদেবমূর্তি খোদিত দেখিয়া বৌদ্ধদের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন । তাঁহার মতি জীনগরের ৩ মাইল দূরে সরোবর মধ্যস্থ হর্যা ও প্রাচীন হিন্দুমন্দির এবং কাশ্মীর নিকটস্থ তঞ্জি সলিমান ২২০ পুং ঋঃ মলেকরাজ নির্মিত । জীনগরের ৬০ মাইল দূরে বিতস্তার উৎপত্তি স্থান । স্থানটি বড় মনোরম, পর্বতের অন্তরে চারিদিকে ফল পুষ্পোপশোভিত ২৫০ হাত বিস্তৃত ও ১৬ হাত গভীর নির্মলজল ও মৎস্যাদি পূর্ণকুন্ত হইতে বিতস্তা নির্গত হইতেছে । নিকটে প্রাচীন দেবমন্দির সন্ন্যাসিদিগের বাটীর অবশেষ, আরও অনেক কুণ্ড । জীনগরের ১৮ কোশ পূর্বে বীরাজ নগরের নিকট পর্বতোপরি ১৬ হাত এক কুণ্ড আছে । শুনা যায় উহা ১১ মাস শুষ্ক থাকে । কেবল জ্যৈষ্ঠমাসে প্রত্যহ পূর্ণ হয় ও শুষ্ক হয় । উহার নিকটে ৬ মাস শুষ্ক থাকে আর এক কুণ্ড । লোকে বলে কুষকেরা জলের জন্য ঐ কুণ্ডের আরাধনা করিলে উহার প্রভবে যথেষ্ট জল হইয়া মাঠ প্রাণিত করে । আর এককুণ্ড কুন্দর নামে খ্যাত তন্নিকটে আর দুই কুণ্ড । জীনগরের বায়ুকোণে তিনদিনের পথে কসলু-গ্রামে এক কুণ্ড আছে । পর্বতের বরফ গলিয়া নীচে নীচে জল আসিয়া উহার মধ্যে এমত আবর্ত উপস্থিত করে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় । জীনগরের ৪০ মাইল বায়ুকোণে নিছীহমা গ্রামের নিকট সুহোয়ম নামে একখণ্ড ভূমি অত্যন্ত উত্তম । কাশ্মীরের পঞ্চবড়িয়া নগরে সপ্তদেব মন্দির

ও সুদৃশ্য নন্দীমার্গ প্রান্তর । কুঙ্কুমের উৎপত্তি স্থান পর্ণপুর নগর ও কেক-
নগরও পুণ্য তীর্থ । শুনা যায়, মাদোয়ার ধূনের নিকট সর্পগুরিত হজ্র-
কোট পর্য্যন্তে মধ্যে মধ্যে ঝটিক লিঙ্গ কখন দৃশ্য ও কখনও অদৃশ্য হয় ।
গুণর নগরের কুণ্ডের জল হ্রাস হইলে তথ্যধ্যে এক চন্দন কাষ্ঠের শিবলিঙ্গ
দৃষ্ট হয় । কাণ্ডা পাড়ার শস্যায়মান নিব্বার ও বাজোয়াল গ্রামে শালা-
মার নিব্বার দেখিবার যোগ্য । তিহাদ নগরে সপ্তসরিতের সঙ্গম আছে ।
ইহার জন প্রীষে শীতল ও শীতে অথোষ্ণ হয় । আশাবলারি স্থানে
সোরিগর নামে এক কুণ্ড ও প্রান্তর-মন্দির আছে । শুনা যায়, শুক্রবারে মাসের
নবম দিবস হইলে ঐ কুণ্ডে জল হয়, দেব সরোবর বালাস্থানে ফেলুনাগ কুণ্ড
এবং নিগম নগরে ৪০ বিঘা বিস্তীর্ণ নীলনাগ কুণ্ড । এই কুণ্ড হইতে কাশ্মী-
রের তীর্থ গ্রহ নীলমত পুরাণ উৎপন্ন হয় । কোঠার স্থানে এক কুণ্ড আছে ।
লোকে বলে যে, ১১ বর্ষ রারিশূত্র থাকিরা বৃহস্পতি সিংহরাশি গত হইলে
প্রতি শুক্রবারে ঐ কুণ্ডে জল দেখা যায় । মহামু স্থানের নিকট এক উপ-
দ্বীপ আছে । তাহার উপরিস্থিত বৃক্ষ বায়ুতে নড়িলে উপদ্বীপ নড়িতে
থাকে । কাশ্মীরে ফলের মধ্যে সেউ, নাশপাতী, বিহি, গিলাস, বাদাম,
পেস্তা, আঙ্গুর, আলুচা, আলুবাখারা, শাহাদানা, শকতালু, শহতুত,
জর্দালু ও আখরোট বড় উত্তম । হিমালয় প্রান্তে কমাযুন আদি স্থানেও
এ সকল ফল পাওয়া যায় । কিন্তু কাশ্মীরের গিলাস ও চম্বার শকতালু
অতি উৎকৃষ্ট । কাশ্মীরের পামপুর পরগণায় কেশর জন্মে । মূল পিঁয়া-
জের মত, পাতা কুশতুলা, বৃক্ষ লম্বে অর্দ্ধ হস্ত, পুষ্প ছয়দল তাহারই
কেশরে কেশর কুঙ্কম বা জাকরান হয় । প্রধানকার শাল, বাফত, পশমী
কাগড়, কাগজ, কলমদান, গিল্টি কুজা ও রূপার জিনিস উৎকৃষ্ট । কাশ্মীরের
১৬ হাজার শাল যন্ত্র হইতে বর্ষে ৬০ হাজার শাল জন্মে । সর্বোৎকৃষ্ট শাল
মূল্য ৭ সহস্র টাকা হইতে পারে । উৎকৃষ্ট শাল একবর্ষে, মধ্যম ৩৪ মাসে
ও অধম ২ মাসে হয় । তিব্বত দেশীয় ছাগলের পেটের বড় লোমের
গোড়ায় যে তুলার ছায় লোম থাকে তাহাই প্যাকাইয়া হস্ত করে । এক জন
স্বত্রের সৰু মোটা বাছে, একজন নির্ঘাতার হস্তে যোগাইয়া দেয়, একজন
বোনে ও একজন নীচ বসিয়া দেখে এজন্ত নিম্নতল পরিষ্কৃত হয় । কতক

শাল বাঁধে তোলা কতক স্থইকার। কতক খণ্ড খণ্ড বুনিয়া পরে যোগা দেয়। অপকৃষ্ট শালে ভেড়া, বিড়াল, কুকুরের লোম পর্যন্ত মিশ্রাল করে। এখন মহারাজা রেশমও মিশ্রাল দিতেছেন। শুনা যায় বর্ষে মোট ৭০।৮০ মণ উৎকৃষ্ট পশম তৈরী হইতে লভা হয়। কাশ্মীরে ও হিমালয়ের বরফ স্থানে মনাল, জীজুতানা, ঘুরী, বাঁধু, ঐকর প্রভৃতি অতি সুন্দর পক্ষী পাওয়া যায়। কাশ্মীরের অধিকাংশ লোক মুসলমান। কাশ্মীরের ব্রাহ্ম-গেরা মুসমানের প্রস্তুত করা কটী খান, মুসলমানের সঙ্গে আহার করেন, মুসলমানী সঙ্গে ব্যবহার করেন, কেবল সিজুতটহ দেশের ভায় হিন্দু মুসল-মানে বিবাহটা চলে না। আবার ইহঁরা কলিকাতার আদিয়া বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা জটীচর হইয়াছে। এখানকার অনেক স্ত্রীলোক সূত্রী সত্য কিছু মাজামোটা, দুশ্চরিত্রা, উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয়। পোশাক গলা হইতে একটা কুর্তি, মাথায় রুমাল বাঁধা, গলায় একটা আঙনের কাংড়ি ঝোলে। কাপড় এত ঢিল যে উহার মধ্যদিয়া আঙনের উত্তাপ সর্বত্র বাইতে পারে। স্ত্রীলোকের যেমন ব্যবহার পুরুষদেরও তদ্রূপ। বাজারে গেলে যেন ফেরীওয়ালারা ফেউ লাগে। এত সাবধানে স্রব্য বাহির করে যেন স্রব্যটা কত বহুমূল্য। কলিকাতার অনেক অপকৃষ্ট বেলোর তথায় রত্ন বলিয়া প্রচারিত। অতএব সাবধান হওয়া কর্তব্য। রাজার ভূমির আর ১২ লক্ষ, শালের আর ৮ লক্ষ, মাহুল আদিতে অবশিষ্ট টাকা হইয়া সর্বশুদ্ধ প্রায় কোটি টাকা আয় হয়। টাকার এত খাদ যে কাশ্মী-রের টাক প্রায় গবর্ণমেন্টের টাকার অর্দ্ধেক। রাজা বেশাৱত্তিরও মাহুল লন। কাশ্মীরের প্রতি কথাতে মাহুল।

পেশোয়ার চারিদিকে পর্বত বেষ্টিত। কিছু স্থান আশ্চর্য্য উর্বরা। এমন কি এখানকার ভূম্য উৎকৃষ্ট তুগুল পৃথিবীতে হয় না। পোলায়ের পক্ষে বড় উৎকৃষ্ট। একসের তুগুল একসের হুত শোষণ করিয়া ফুলিয়া চারিসের ভুল্ল হয়। পেশোয়ারের অধিবাসীগণ জুর ও পার্শ্বস্থ পার্শ্বতীয়-গণ নিতান্ত অবিদ্বান। অতএব একাকী যথায় তথায় গমন নিতান্ত নিবিদ্ধ। এখানে বড় শীত। আকবর এই নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। পেশোয়ারের পর পর্বত মধ্যস্থ সর্বাধিক ঋতুর পথ। এই পথ দিয়া ভারতের যত লক্ষ

প্রবেশ করিয়াছিল। খাইবার পার হইয়া কিছু দূর গারে কাবুল নগর। কাবুলের ৪০ মাইল উত্তরে ৪০০ ফীট উচ্চ এক পর্বত পার্শ্বে ২৫০ গজ উচ্চ ও ১০০ গজ বিস্তৃত এক আশ্চর্য্য বালুকা ক্ষেত্র আছে। উহার উপরে উঠিলে বা উঃতে প্রবল বায়ু লগিলে উহার অভ্যন্তরে বাহুধনি হইতে থাকে। নিশাকালে বা মধ্যাহ্ন সময়ে হঠাৎ শূন্য মাঠমধ্য বাগুধনি অরণ করিয়া পথিকেরা চকিত হইয়া উঠে। কাবুল রাজ্যে সেউ, নাশপাতি, খোবানি, আকুর, দাডিম, সর্দে, আঁজির, আখরোট প্রভৃতি অখ্যাত ফল, উৎকৃষ্ট জিরা, ৫৭ সের ভারি লাসুলবিশিষ্ট ভেড়া, দীর্ঘ লোমযুক্ত বিড়াল ও কুসুম প্রভৃতি জন্তু এবং পশুনি প্রভৃতি শীতবস্ত্র জন্মে। পূর্বে এই দেশকে কাবোজ ও গাকার রাজ্যাদি কহিত। এখন কোন কোন স্থানে হিন্দুতান্ত্রিক বাস ও কোথাও কোথাও হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ প্রদেশের রবাব বাজ অতি সুমিষ্ট।

বয়ে গমন।

দক্ষিণাপথ দেখিতে ইচ্ছা হইলে নৈনিতে আরোহণ করিবে। নৈনি কলিকাতা হইতে ৫৬০ মাইল ও এলাহাবাদ হইতে ৫ মাইল। মুগের নাড়ু প্রভৃতি কিছুকাল স্থায়ী খাদ্যাদি এই স্থানে সংগ্রহ করিবে। জব্বলপুর পর্যন্ত পথে খাদ্য প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। ভীষণ বিক্যাটবী পার হইতে হইবে। আর আর্ধ্যবর্তের সুখ প্রাপ্ত হইবে না। দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীর দিকে যাত্রা করিতে হইবে। যমুনা পার হইবার কালে নীতাসহ রঘুনাথও চঞ্চল হইয়াছিলেন। নৈনির পর স্থানে স্থানে বৃক্ষ-কুঞ্জ, কোথাও বা হলকর্ষিত ক্ষেত্র ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার পর জসরা কৈসন। জসরা পার হইয়া ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল, কঠিনপ্রস্তর, উচ্চাবচ ভূমি ও বৃক্ষাদি শূন্য অনাবৃত প্রদেশ। অনতিকাল মধ্যেই কঠোর পাহাড়ের খাত আসিয়া উপস্থিত। দূরে বিস্তার বিশাল প্রাণী। তদনন্তর মানিকপুরের নিকট করেকধান শস্তক্ষেত্র। তাহার

পরেই পুনরায় বামে ও সম্মুখে পর্বতমালা । কোন পর্বতের তৃণাচ্ছাদিত গাত্র হইতে হরিতশোভা নির্গত হইতেছে । কোনটা বা সৌর কিরণে উজ্জ্বল হইয়াছে ও কোনটা বা ছায়ার ঘোর হইয়া তমোময় মূর্তি ধারণ করিয়া আছে । ইহার পর মারকুণ্ডা ফ্রেসন । চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল, এক একটা পাহাড়ের গাত্রে একাণ্ড প্রস্তর খণ্ড শিথিল হইয়া রহিয়াছে । এই ফ্রেসন হইতেই ৬ ক্রোশ দূরে হামীরপুরে চিত্রকূট গমন করিতে হয় । চিত্রকূট পর্বতের বনশোভা অতি সুন্দর । এক দিকে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে । তত্বীরে তীর্থ মন্দির পর্বতোপরি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের পাষাণময় মূর্তি । এখানে লোকে রামঘাট, দেবঅঙ্গনা, হনুমানধরা, ফটিকশিলা, গুপ্ত গোদাবরী, পর্বতে অনস্বয় প্রতিমা, ভরতকুণ্ড, কামাখ্যানাথ পর্বত, পরোক্ষী নদী, দাগ হনুমানস্থান, বীর হনুমান স্থান, ও বালা-দিবাকর গক হনুমানস্থান আদি দর্শন করিয়া থাকে । মারকুণ্ডা পার হইয়া ঘোরদর্শন গিরিপ্রান্ত ও বনোপশোভিত পাদদেশ সকল দৃষ্টি গোচর হইতে থাকে । এই স্থানে এক পর্বতশ্রেণী উপশমিত হইয়াছে । কিন্তু বামদিকে অনতিদূরেই আর এক শ্রেণী । দেখিতে দেখিতে গাড়ী ঐ শ্রেণীর সন্নিহিত হইল । পাকে পাকে এই গিরি পার হইবার সময় বন শোভিত বিস্তাপৃষ্ঠ, কাননপূর্ণ উপত্যকা ভূমি সুদৃশ্য গিরিকন্দর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর্থা দৈখিয়া নয়ন আচ্ছাদে নৃত্য করিতে থাকে । কিয়ৎকাল পরে উচ্চস্থান মুজগ্রাম, চারিদিকে পাহাড়, অবতরণ কালে এক অনারত ক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে ঝোড় ও জঙ্গল, সম্মুখে কয়েকটা বিশাল শৃঙ্গ, তাহারই বাম দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে । ক্ষণকাল পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন ও হুই এক খান হলকর্ষিত ক্ষেত্র, তাহার পর জিতোয়ার গ্রাম । দূরে পুনরায় পর্বত শ্রেণী, ঐ শ্রেণীর বিকটাকার শৃঙ্গ কয়েকটা পার হইয়া রেওয়ার বাইবার সতনা ফ্রেসন । সতনার এক মাইল পরে সতনা নদীর তিন খণ্ড মুক্ত সেতু, বামে মোচার জায় একটা আশ্চর্য্য পাহাড়, উহার উপরিভাগে সমতল ও সম্মুখের শৃঙ্গসমূহদ্বারা কিঞ্চিৎ লুকায়িত । অনন্তর দাক্ষিণাত্যের প্রবেশ পথ মাহিরি, ডাইনদিকে পিরামিডের তুল্য এক অদ্ভুত পর্বত, অচুপরি একখানি গৃহ, ইহার পর হুই বিস্তীর্ণ পর্বত

শ্রেনীর মধ্যস্থিত এক সুন্দর উপত্যকা দিয়া ক্রমাগত ৩০ মাইল রেল চলি-
য়াছে। বামে কাইয়ুর শ্রেনীর শৃঙ্গ সকল সমোচ্চ ও উপত্যকার দিকে
ক্রমে ঢাল হইয়াছে। দক্ষিণে বুন্দিয়ার শ্রেনী যেন প্রকাণ্ড বৃক্ষজের শ্রায়
বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্তর জকাই ষ্টেশন। এখানে শৈলসমূহ অন্তর্হিত
প্রায়। কিছু তথাপিও বহুদূর উচ্চ ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। জকাই
হইতে কঠনি পর্য্যন্ত তিনটী পার্শ্বতীয় নদী, তদনন্তর সিলিমাবাদ পথ,
পথে জঙ্গল অতি সুন্দর, মধ্যে মধ্যে থাক ছাড়া পাহাড়, এক একটা বনরাজি
হইতে হটাৎ উচ্চ হইয়াছে। কিছু দূরে কঠনি গ্রানাইট চূর্ণ প্রস্তর ও
কর্দম প্রস্তর উৎখাত করিয়া রেল চলিয়াছে। এই সকল কাটিতে বড়
কষ্ট হইয়াছিল। প্রস্তর সকল বর্ষায় ভঙ্গপ্রবণ ও গ্রীষ্মে ভয়ঙ্কর কঠিন
হইয়া উঠে। এই সকল পার হইয়া জব্বলপুর ষ্টেশন।

জব্বলপুর এলাহাবাদ হইতে ২২৯ মাইল ও সাগর হইতে সহস্র ফীট
উচ্চ। ষ্টেশন নিকটে পথিকদের ধর্মশালা। ভূমি বালুকাময়। চারি-
দিকে শ্রেনীভঙ্গ পাহাড়। পাহাড়ের উপরিভাগ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পণ্ডিত-
দিগের নিতান্ত প্রীতিপ্রদ। কত জাতীয় গ্রানাইট নিইছ হরনলেড ও
ফিটোন পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও এসব ও রত্নজাতীয় লোহিতাদি
বর্ণের ভূরি ভূরি প্রস্তর, কোথাও পুরাকালিক হস্তীহাড় প্রস্তরে পরিণত ও
কোথাও বা আদিম অসভ্যদিগের চকমকীর প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র। জব্বল-
পুর একটা প্রকাণ্ড সহর। ইহার মহাজনপটী অতি প্রশস্ত। প্রকাণ্ড
ঘর দিয়া প্রবেশ মাত্র পরিষ্কৃত পথপ্রান্তে সম্বীভূত নানা দ্রব্য দেখিতে
অতি সুন্দর। নিকটে বিপণি মধ্যে অষ্টকোণ পর্দা বেষ্টিত উৎকৃষ্ট কূপ
কিয়দূরে গির্জা, তন্নিকটে শিশুবিদ্যালয়। তদনন্তর ঠগজাতীয় কয়েদী ও
তাহাদের পরস্পর বিবাহোৎসব মনুষ্যদিগের কার্পেট তাম্বু ও সত্তরঞ্চ
বুনিবার স্থান। তাহার পর লাংকার কারখানা। সুলমান সাহেবের
যত্নে এই নগর শোভাশালী হয়। তিনিই ইহার ময়দানে বংশবৃক্ষ
রোপিত করিয়া যান। সহরের বাহিরে দক্ষিণাত্যের রাস্তার দিকে কতক-
গুলি পাহাড় কাটিয়া উঠিয়াছে ও গলিতেছে। সমীপের উদ্ভিদান মন্দ
নহে। ছাউনী ও নাট্যশালার নিকট দিয়া নাগপুরের পথ। জব্বল-

পুরের ৪ মাইল দূরে নর্মদা । তথায় গো। যান বা অশ্ব যানে বাইতে পথের বামদিকে উচ্চ উচ্চ শরীতপুঞ্জ । ডাইনমিকের গ্রানাইট পর্বতোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দির । আরও কিছু দূর পরে আর কতকগুলি মন্দির, বৃক্ষ অতি সুন্দর । পথ পাকে পাকে পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে । তাহার পর গোয়ারিবাটে পর্বতপ্রান্তে নর্মদা নদী । তীর উচ্চ, জল পরিষ্কৃত ও স্রোত তীব্র । বিস্তার কাল বিশেষ ১০০ হইতে ৮০০ হস্ত হয় । বাটের পার্শ্বে মণ্ডলার বন হইতে আনীত কাষ্ঠ ও তীর্থ মন্দির । নর্মদার বিবোধজন পুণ্যক্ষেত্র । নর্মদার তীর পরীক্ষা করিলে বোধ হইবে যে এই প্রাচীনা নদী পূর্বে আগ্নেয় উৎপাতে বিনষ্ট হইয়াছিল । তাহার পর পাহাড় উপর দিয়া পুনরায় প্রবাহিত হইয়াছে । জজলপুরের পূর্বে অমরকটকে নর্মদা ও শোণের উৎপত্তি স্থান । ঐ স্থান হইতে শিব ত্রিপুর দম্ব করিয়াছিলেন । শিবের ত্রিপুর দম্ব করাই ঠিক হউক বা ইংরেজ-দিগের আগ্নেয় গিরির উপদ্রবই ঠিক হউক এখানে এক কালে ভীষণ আগ্নেয় উপদ্রব ঘটিয়াছিল । নর্মদার প্রত্যেক স্থানই মহাতীর্থ । অমর কটক হইতে সাগর পর্যন্ত দশকোটিতীর্থ আছে । নর্মদার তীরে যেখানে সেখানে বাণলিজ শিব প্রাপ্ত হওয়া যায় । (১) ।

জজলপুরের ১০ মাইল দক্ষিণে শ্বেতবর্ণ মার্কেল পাহাড় । গোয়ারি-বাট পার হইয়া নর্মদা চূর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া মর মর শব্দ করিতে করিতে ধূসরধারের নিকটবর্তী হইয়াছে । তথায় ইহার প্রপাত দেখিতে অতি আশ্চর্য্য । তদনন্তর ২০০ হস্ত হইতে একবারে ৪০ হাত হ্রস্ব হইয়া পর্বত বিনীর্ণ করত ১ কোশ অতি তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়াছে । তাহার পরই আশ্চর্য্য মার্কেল পাহাড় মধ্যে প্রবিষ্ট । মার্কেল পাহাড় নর্মদার দুই পার্শ্বে প্রাচীরের ন্যায় ৪০।৫০ হাত উচ্চ হইয়াছে । এখানে নদী বিস্তৃত

(১) নমঃ পুণ্যজলে হৃদ্যে নমঃ সাগরগামিনি । নমস্তে পাপশমনি নমো দেবি বরানমো । নমোস্ততে ঋষিগণ নিক সেবিতো । নমোস্ততে লঙ্কর দেহ নিসৃতো । নমোস্ততে ধর্মভূতাং বরপ্রদে । নমোস্ততে সর্ব পবিত্র পাবনে । ইতি স্মারকালে শুভ ।

অপ্রশস্ত ও অত্যন্ত গভীর । প্রস্তরের আঁটার জল কোথাও বা সবুজ, কোথাও বা নীলাভ ও কোথাও বা নিতান্ত শুভ্র । পর্বতের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে উর্দ্ধ ও অধোভাগে দুই পর্বত দৃষ্ট হইতেছে । নিকটের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পর্বতে হিন্দুদিগের দেব মন্দির ও আরাজের চূর্ণিত মূর্তি । পর্বত নিম্নে বেহরা যাটে রাসের সময় মেলা হইয়া থাকে । ডাইন তীরের অম্প দুই প্রানাইট পাছাড় ভূরিকূপে উদ্ভিত হইয়াছে । ৫ মাইল গমন করিলে পর পর্বতোপরি গোন্দরাজের বাটী, একটীর নাগ মদন মহল । মদন মহলের প্রাঙ্গণ হইতে সৌধমালা শোভিত জব্বলপুর দূরে লক্ষিত হয় । পর্বতের সান্নিধ্যে কয়েকটা পুষ্করিণী ও অসংখ্য আম্র বন । অনতিদূরে কুরুবেল নামক স্থান প্রাচীন ত্রিপুরপুর নগর । ইহার সমস্তই ভূমিমধ্যে প্রোথিত কেবল দুইটা স্তম্ভ বর্তমান আছে । কেহ বলে যে মুসলমানেরা রাণী দুর্গাবতীকে হরণ করিবার জন্ত নগর আক্রমণ করে । রাণী বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করেন । মুসলমানেরা নগরে অগ্নিপ্রদান ও অনেক দেবমূর্তি চূর্ণ করে । তাহারি যে সকল আম্র খাইয়া ফেলিয়াছিল তাহাতেই আম্র বন হইয়াছে । কিন্তু অনেকে কহেন যে, শতবর্ষ হইল নগর ভূমিকম্পে ভূমিগাৎ হইয়াছে । ৫০০ বর্ষ পূর্বে এখানে স্থপতি কার্যের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য ছিল । বৈতুল নামক স্থানে এক উচ্চ মন্দিরের ছাদ এত বড় বড় পাথর তুলিয়া গাঁথা হইয়াছে যে, বর্তমান কালে যজ্ঞ যোগেও তাহা তোলা অসম্ভব । এই স্থানের খোদিত প্রস্তর লইয়া এখন ২০ মাইল পর্য্যন্ত লোকের কার্য ও রেলওয়ের বিস্তার উপকার হইতেছে । কিছু দিন গত হইল এখানে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও উৎকৃষ্ট খোদা দরজা সকল উদ্ভিত হইয়াছে ।

জব্বলপুরের পর নর্থদার সেতু পার হইয়া দ্রুত দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিবে । পথে মীরগঞ্জ ফেসনে অবতরণ করিলে মার্কেট পাছাড় সমীপ-বর্তী হয় । নর্থদার নিকট বিস্তার ক্ষীত ভাব হইয়া অদৃশ্য হওয়াতে নর্থদা বিস্তার ক্রোড় দিয়া প্রবাহিত । কিন্তু নর্থদা পার হইয়া পুনরায় ভারত ক্ষীত হইয়াছে । জব্বলপুর হইতে থাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত রেল প্রায় নর্থদার সমীপবর্তী হইয়া চলিয়াছে । জব্বলপুর পার হইয়া বর্ষি দৃশ্য সকল আরণ্য সৌন্দর্য্যে শোভিত । অধিবাসীর সংখ্যা এ প্রদেশে নিতান্ত অম্প ।

ফেসন গুলি ক্ষুদ্র ও লতাজালে জড়িত । গাড়ী ও আর্থাবর্তের গাড়ী তুল্য সুখপ্রদ নহে । জি, আই, পি, রেলওয়ের ফেসনে জল পাওয়া ভার । ফেসন যাকার গুলি মহারাজীয় । মাথায় একটা গাড়ীর চাকার মত প্রকাণ্ড পাক । পরনে একখান ময়লা ধুতি । গায়ে একটা পাতলা শাদা চাপকান । পায়ে এক জোড়া চটীজুতা । কাণ দুটী মাকড়ী দেওয়া । কপালে একটা লালটিপ, বলে—“ টিকিট বিতাও „ । ফেসনের বাহিরে বাঘের উৎপাত । রেলওয়ের টাপাল গাড়ী অর্থাৎ মেল ট্রেন ব্যতীত বাইবার বড় অসুবিধা । অপর গাড়ীর রাত্রি হইলেই বিশ্রাম । এজ্ঞা অজ্ঞ পথিকের অজ্ঞানিত স্থানে অবতরণ করিয়া অপকৃষ্ট ধর্মশালায় বাস বা নিকৃষ্ট দোকানে রাত্রি যাপন মরণতুল্য । যদি দুই আনায়া এক খানা খাটিয়া পাওয়া যায় তবে মহা সৌভাগ্য । খাছের মধ্যে দক্ষিণদেশতারিণী লক্ষা, ছাত্ত, চুড়া, চুরমুরা পুরী, পেড়া ও দুর্গন্ধ জিলিপি দুই এক খান মিলিলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত । দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে পথিকের সময়মত খাওয়া ও জল সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য । তৃতীয়বার ভ্রমণে দেখিলাম ক্রমে কিছু কিছু উন্নতি হইতেছে ।

জব্বলপুর হইতে ৬২ মাইল দূরে কুলেরী । এখান হইতে লোকে সাগর নগর যায় । কুলেরীর পর শূকর নদী পার হইয়া গাড়াওয়ারা ফেসন । তাহার পর পাঁচমারীর ফেসন পাপারিয়া । তদনন্তর মোহাগপুরে অগন নদী পার । কিছু দূর পরে হুসঙ্গাবাদের ফেসন ইটারছি । নর্থদার বাম-তটে প্রাচীন হুসঙ্গাবাদ নগর । ইহার পর হর্দা । এই জেলার সিদ্ধিয়া ধার ও হোলকার রাজ্য মিলিত । অনন্তর জোয়ারা ফেসনে মালব দেশস্থ জোয়ারের নবাবের রাজ্যে প্রবেশ ও পিরিয়া নদী পার । তদনন্তর জব্বলপুরের ২৬৪ মাইল দূরে খণ্ডোয়া ফেসন । এই স্থান সাতপুর ও মহাদেব পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত । এখানে খাছাদি কতক কতক পাওয়া যায় । সময়ে সময়ে দেশীয় আসুর ও পাওয়া গিয়া থাকে । এই স্থান হইতে হোলকারের রাজধানী ইন্দোর উজ্জয়িনী ও গুঁকারেশ্বর আদি দেখিতে ইচ্ছা হইলে বম্বেগামী রেল ছাড়িয়া ডাইনদিকের হোলকার ফেট-রেল আয়োজন করিবে । এই পথে পার্শ্বতীয় দৃশ্য অতি সুন্দর ও দর্শকের

নিভান্ত প্রীতিপ্রদ । নর্যদার লীলাও চমৎকার । মরটাকা ফেসন শ্রেই নর্যদা পার । ভ্রমণকারীর ইচ্ছা হইলে নিকটে নর্যদার ডাইনতটে দ্বাদশ মহালিঙ্গের এক লিঙ্গ স্প্রসিঙ্গ, ঐক্যেরশ্বর শিবও নিকটবর্তী, স্বভাব শোভা দেখিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন । ঐক্যেরশ্বর মন্দির নিম্নে উৎকৃষ্ট ঘাট ও অঙ্গুর পর্বতোপরি মাকাতা ও মুচুকুন্দের কেল্লা । কেল্লা মধ্যে ও বাহিরে অনেক দূরপর্যন্ত ব্যাপিয়া বিস্তর খাসা চৌকাঠ ও দেবমূর্তি পড়িয়া রহিয়াছে । এই স্থানের অগ্নি দূর পশ্চিমে পণ্য-দ্রব্য-পূর্ণ মণ্ডলেশ্বর নগর । ইহার পাঁচ মাইল পশ্চিমে নর্যদার ডাইন তটে স্প্রসিঙ্গ মাহিম্বতী পুরী, চুলি মহেশ্বর বা সহস্রবাহুকা বসতি । এই স্থানে সহস্রবাহু কার্তব্যার্থাজ্ঞানের রাজধানী ছিল । ইহারই অনতি দূরে জমদগ্নির আশ্রম ছিল । ইহারই নিকটে চাবন, শর্যতির যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করেন । এখন মাহিম্বতী পুরীতে অহল্যাবাইয়ের কেল্লা, তন্মধ্যে তাঁহার বাসবাটী ও নর্যদার সূন্দের ঘাট দেখিবার যোগ্য । এসকল দেখিবার ইচ্ছা না হইলে মরটাকা হইতে সেনানিবেশ স্থানে মো ফেসনে চলিয়া বাইবে । মো পার হইয়া কিছু দূর পরে ঢালু ময়দান মধ্যে বৃক্ষ-বেষ্টিত হোলকারের রাজধানী ইন্দোর নগর । রাজার বাটী দেখিতে একরূপ মন্দ নহে, কিন্তু বৈরূপ নাম সেরূপ শোভা নাই । সহরে অধিকাংশই কাষ্ঠের কার্য । মহারাজার জমীর আয় ২২ লক্ষ টাকা । এখানে বিস্তর আকিম হয় । খিচুড়ির উপর থালিভরা হুত ও বাটী হইলে এখানকার ব্রাহ্মণেরা বড় খুসী হইয়া ভোজন করেন ।

ইন্দোর পার হইয়া কয়েক ফেসন পরেই আমরা সুবিখ্যাত উজ্জয়িনী নগর প্রবেশ করিলাম, এই স্থানে বিন্দ অম্ববিন্দের রাজধানী ছিল । বর্তমান উজ্জয়িনী নগর প্রান্তর প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে চূড়া, বেড় প্রায় ৬ মাইল । সহরে বিস্তর অধিবাসী, পঞ্চ সকল প্যাণময়, দরগুলি দ্বিতল, নিম্নতল প্রান্তর নির্মিত বিস্ত উপরতলে অধিকাংশই কাষ্ঠের কাজ । এখানে চারি মসজীদ ও বিস্তর মন্দির আছে । যখন বিন্দ মহাকালের মন্দির পুনরায় অহল্যাবাই কর্তৃক শোভিত হইয়াছে । সহরের বাহিরে অরুপাতে ব্রহ্মমন্দির । লোকে বলে এখানে ব্রহ্ম বলদেব প্রথম পাঠাভ্যাস করেন ।

নিকটে প্রস্তর সিঁড়িবিধিষ্ট একটা উত্তম পুকুরিনী । ইহার কিয়ৎভাগ
 আবৃত করিয়া প্রায় ৫৪ বর্ষ পূর্বে রজরায় আপা দুই মন্দির নির্মাণ করিয়া-
 ছেন । ডাইন দিকের মন্দিরে খেত-মার্কেল নির্মিত রাম সীতা ও লক্ষ্মণ
 বিরাজিত । বামের মন্দিরে কৃষ্ণ-প্রস্তরে কৃষ্ণ ও খেত-মার্কেলে রাধামূর্তি ।
 মূর্তিগুলি অতি সুশ্ৰুতি । এখানকার বহুবাণী বেষ্টিত সিঙ্কিয়ার প্রাসাদ
 সম্পূর্ণরূপে গাভীয়া ছীন । কেবল নিকটস্থ অতি প্রাচীন দুর্গদ্বারের গঠন
 প্রণালী দেখিবার যোগ্য । সহরের পূর্বদিকে এক উচ্চ পার্বত্যোপরি মহা-
 দেবের মন্দির ও যোগা সেহিদ ফকীরের কবর । ইহার উপরে উঠিয়া
 চারিদিক দেখিতে অতি সুন্দর । আমরা প্রথমে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত
 করিলাম । দুই ক্রোশ দূরে শিপ্রার দ্বীপ মধ্যে কালিয়দহ নামক এক
 প্রাচীন প্রাসাদ । স্পষ্টভাবে দুইটা সুন্দর সমচতুষ্কোণ বাটী দূরে লক্ষিত
 হয় । নিম্নভাগ অটরি ভাগে বিভক্ত ও উপরিভাগে গজমু শোভিত ।
 শিপ্রার এক শাখার উপর দিয়া বাইবার সেতু রহিয়াছে । সেতু নিম্নে
 কয়েকটা ঘরও দেখা যায় । এই স্থানে শিপ্রা স্থপতির কোশলে নানাদ্বীপ
 উৎপাদন করত আছে । কি সুন্দররূপে প্রস্তরের উপর দিয়া প্রবাহিত
 হইতেছে । পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, ফল পুষ্প শোভিত
 শিপ্রাতটে অর্দ্ধপোয়া বিস্তীর্ণ ভৈরোগড় মধ্যে এক প্রাচীন মন্দির ।
 কিয়দূরে অভ্যুত্থানবিশ ও রানার্থার উত্থান । একটীতে শিল্পের ও
 অপরাধীতে স্বভাবের সৌন্দর্য দেখা যায় । তিন মাইল দূরে গ্রানাইট
 পার্বত দ্বারা দৃষ্টি সংকর হইয়া পড়ে । তদনন্তর দক্ষিণ পশ্চিমে দৃষ্টি-
 পাত কর । দুই মাইল বিস্তীর্ণ মিকুঞ্জ শেষে চিন্তামণি নামক গণেশের
 মন্দির । নগরের দক্ষিণেও শিপ্রা । এই দিকে আকবরের কালীন উজ্জ-
 যিমীর সুবাদার জয়পুরের জয়সিংহ রাজার মানমন্দির । পূর্বদিকে শস্ত্র-
 পুরিত সম্রাটল ক্ষেত্র মধ্যে এক মোচাঞের জায় পার্বত । তন্মিকটে এক
 হ্রদ ও সিঙ্কিয়ার ছুরিণ পুরিত রমনা । এইরূপে নূতন উজ্জয়িনী দেখিয়া
 আমরা বিক্রমাদিত্যের প্রাচীন উজ্জয়িমীর দিকে অগ্রসর হইলাম । এই
 নগর কেন দৈবী উৎপাতে ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া ভূগর্ভমধ্যে নিহিত আছে ।
 ১০।১২ ছাত ভূমি খনন করিলে সম্পূর্ণ প্রাচীর, প্রস্তর, স্তম্ভ ও কঠিন

কাঠাদি পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্যের কালে উজ্জয়িনী যেরূপ ছিল এখনও তাহা দেখিলে দেখা যায়। এক স্থান খনন করাতে প্রস্তর স্তম্ভ, পচাগো-
ধুম ও কুম্ভকার দোকানের অবাদি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রোথিত নগ-
রের পার্শ্ব দিয়া এক প্রকাণ্ড খাত আছে। দৈবী উৎপাতের প্রভাবে শিপ্রা
ঐ খাত ত্যাগ করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে। শিপ্রার বর্তমান
বেগে প্রাচীন প্রোথিত উজ্জয়িনীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে নিম্নে একটা
প্রকাণ্ড বাটী বাহির হইয়াছে। দরজার সম্মুখে উত্তর হইতে দক্ষিণ ও
পূর্ব হইতে পশ্চিম দুই থাক স্তম্ভ। দক্ষিণমুখে প্রবেশ করিলে দুই বাটী
একটী সদর ও একটী অন্তঃপুর। অন্তঃপুরে প্রস্তর স্তম্ভ ও প্রস্তরের কড়ি
এবং পশ্চিমদিকে এক ত্রিকোণাকার গম্বুজ বা স্তূপ। বামে আর দুই
ঘর প্রায় ৬ হাত বিস্তৃত। দক্ষিণে মৃত্তিকাপূরিত আর এক দরজা।
সন্ন্যাসীরা বলে যে, কাশী ও হরিদ্বার যাঁবার এখান হইতে দুই স্তূপ ছিল।
লোকে গোলোকধন্দে পড়ে বলিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। এই ঘরকে কেহ
ভর্তৃহরির বাটী ও কেহ বা গন্ধর্বসেনের গুহা বলিয়া থাকে। কালিদাসের
বর্ণিত সেই উজ্জয়িনীর আজ এইরূপ দশা। আজও অবশ্যী পার্শ্বৈপিক
ডাকিয়া থাকে, আজও সেই বসন্ত, সেই বর্ষা উদ্ভিত হয়। কিন্তু মেঘভূতের
সে সরস লেখনী আজ কোথায়? যাহা হউক এখন বর্তমান উজ্জয়িনীতে
দাক্ষিণাত্যের অপরাপর মুসলমানের ভায় বোরা বা ইস্মাইল দলস্থ মুসল-
মান বাস করে। এখানকার সাধারণ লোকে বাজরা শস্তের কটী খায়।
উজ্জয়িনীর মৃত্তিকা বর্ষায় যেমন কর্দমাক্ত, ত্রীষ্মে তদ্রূপ কঠিন হয় ও বিস্তৃত
কাটাল কাটে। এখানে বুরহানপুরের আমদানী আকুর ও ফলসা উৎ-
কৃষ্ট। উজ্জয়িনী বা অবন্তি হিন্দুদিগের মহাতীর্থ ও মহাকালের আবাসস্থান।
পূণ্যক্ষেত্র ১ যোজন। এখানে ৮৪ সিদ্ধ লিঙ্গ, ৮ ভৈরব, ১১ কঙ্গ, ১২ আদিভা,
৬ বিনায়ক ও ২৪ মাতৃ আছেন। প্রায় ৬৬০ বর্ষ গত হইল এখানে দিল্লী-
রাজ আলতামস অনেক বিগ্রহ তপ্ত করেন। শিপ্রা, গন্ধবতী, মদমদী ও
নীলগঙ্গা সম্মে স্থান অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

মালবে প্রবেশ করিয়া এই সকল দেখিতে ইচ্ছা না হইলে খাণ্ডোরা
হইতে বহেগামী রেল চান্দানী স্টেশন যাইবে। অঙ্গা দূরে বায়দিকে

আশীরগড় কেল্লা । উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারত প্রবেশের মুখে সাতপুরার ৭৫০ ফীট উচ্চ শীর্ষোপরি এই সুদৃঢ় দুর্গ সংস্থাপিত । একে লম্বাভিত্তিঃ দুর্গম তাহাতে আবার প্রাচীরাদি বেষ্টিত । পর্বত গাত্র স্থান স্থানে ৫০ হইতে ৮০ হাত পর্য্যন্ত লম্বভাবে উন্নত হইয়াছে । এবং তাহাও এত চাঁচা যে, কোনদিকে কোন রূপে উঠিবার উপায় নাই । কেবল দুইটী মাত্র প্রবেশের পথ আছে । ঐ পথ সিঁহিয়ার প্রকাণ্ড কামান দ্বারা উত্তম-রূপে সুরক্ষিত । বুরহানপুরের বাজার ৭ ক্রোশ দূর হইলেও লোকে বলে একটার গোলা বুরহানপুর পর্য্যন্ত যায় । আশীর গড়কে কেহ কেহ অশ্বখামাগড় কহিয়া থাকে এবং লোকে বলে যে, সম্রাটকালে অশ্বখামা মন্তকের বেদনা নিবারণ জন্ত তৈলভিক্ষা করেন । চতুর্দশ শতাব্দীতে এই দুর্গের বড় প্রতাপ ছিল । ১৮১১ অব্দে জেনেরেল ডডটন কর্তৃক অধিকৃত হওনাবধি ইহা ইংরেজদিগের হস্তে আছে । দুর্গ হইতে চতুঃপার্শ্ব-বর্তী জঙ্গলাবৃত ভূমি দেখিতে বড় সুন্দর । পূর্বে খান্দেশে মহারাষ্ট্র সময়ে এত কেল্লা ছিল যে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এক দিনের পথে বিশ কেল্লা গণ্য হাইত । দস্যুর আশ্রয় হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সমস্ত ভগ্ন করিয়াছেন ।

এতদনন্তর খান্দেশের প্রাচীন রাজধানী বুরহানপুর । ১৪১৪ অব্দে এই নগর সংস্থাপিত হয়, এবং ১৫৯৯ অব্দে আকবর সম্রাটের অধীনস্থ হওয়ার পূর্বে ইহা অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল । এখন সিঁহিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভূত । ইহার চতুর্দিকে প্রাচীর মধ্যে প্রায় তিনহাজার বোরা মুসলমান বাস করে । তাঙ্গী বা তাগীর ডাইন তটে ৪৬ হাত উচ্চ আকবরের লালকেল্লা । এখানে আরংজেব নির্মিত মসজিদ ও আকবরকালীন ভগ্ন হাফিয়াদি দেখিবার যোগ্য । এখানকার স্বত্রবস্ত্র, রেশমী কুল ও জরীর কাজ খান্দেশ ও মালবে প্রসিদ্ধ ।

বুরহানপুর হাড়িয়া নিছোরার পর তাঙ্গীনদী পার । তদনন্তর প্রকাণ্ড তোছায়ল ফৈসন । এই স্থান হইতে বামরেলে লোক নাগপুর যায় । নাগপুর বা বিদর্ভরাজ্যে তাঙ্গীর প্রভাবণ, গোন্দাবাস ভয়ঙ্কক গিরিসমূহ, অমরা-

বতী, ইলিচপুর, নাগপুর, বস্ত্রেরস্থান, কামটী প্রভৃতি দর্শনযোগ্য। কিছু স্থান নীরস, কর্কশ ও দৃষ্টির অপ্রীতিকর, তাবাও অপকৃত।

নাগপুর দর্শনে অনিচ্ছা হইলে বস্ত্রগামী রেল পাচোরা ষ্টেশন যাইবে। এই স্থান হইতে অনেক আজাটের-গুহা আরাজাবাদ ও ইলোরার গুহা দর্শন করিয়া থাকে। পাচোরার মামলতদারের নিকট প্রাপ্ত গোমানে ৮ ঘণ্টায় ৩০ মাইল, পরে কর্দাপুর পাওয়া যায়। এখানে একজন দর্শক সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ আজাট বা অজন্তী পর্বত গুহা দর্শন করিবে। খাদেশের দক্ষিণ সীমায় চান্দর নামে এই পর্বত শ্রেণী তান্ত্রী ও গোদাবরীর ক্ষেত্র পৃথক করিতেছে। অজন্তী গ্রামের ৩ মাইল দূরস্থিত এই সকল গুহার খোদকারী এত চমৎকার যে এরূপ খোদকারীযুক্ত গুহা অতি দুর্লভ। ২৯ গুহার মধ্যে ১, ২, ৬, ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৯, ও ২০ নম্বরের গুহার প্রাচীন চিত্রের কিছু কিছু অবশেষ দেখা যায়। যৎকালে ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, এই সকল চিত্রে তৎকালীন লোকের পরিস্ফুট কার্য ও অবস্থাাদি চিত্রিত দেখিয়া মন গভীর কালের মধ্যে নিমগ্ন হয়। আহা! হুই সহস্রবর্ষ পূর্বে ভারতের যে ভাব ছিল, আজ তাহাই দর্শন করিতেছি।

কর্দাপুর হইতে সিল্লদ পল্লী ও কুলমারী পার হইয়া আরাজাবাদ নগর। পূর্বে আরাজাবাদ এ প্রদেশের রাজধানী ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবস্থা। নগরের জলের জন্ত পাহাড় কাটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পয়ঃপ্রণালী ও কোয়ারা সকল এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে প্রশস্ত বাজার ও সম্রাট আরংজেবের ভগ্ন গৃহ। অনতিদূরে আরংজেব কস্তা রাবিয়া হুমানীর মার্কেল কবর। এটি তাজমহলের অপকৃত অমুকরণ মাত্র। এখান হইতে ৭ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ দেবগিরি বা দোলআবাদের কেল্লা। ৫০০ ফীট উচ্চ এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের অধোভাগ ১২০ ফীট পর্যন্ত টাচিয়া চারিদিকে ঠিক প্রাচীরের মত সরল করা হইয়াছে। কোন দিকে কোনরূপে উঠিবার উপায় নাই। ইহারই চারিদিকে ভয়ঙ্কর গড়খাই তাহার পর প্রাচীর, তাহার পর পুনরায় গড়খাই, তাহার পর পুনরায় প্রাচীর। এই তিন প্রাচীর ও গড়খাই অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী হইবার অতি সঙ্কীর্ণ অথচ দৃঢ়রূপে রক্ষিত একটী মাত্র সেতু আছে। সেতু দিয়া গেলে

পর্বত মধ্যে একটা মাত্র লোকের প্রবেশ যোগ্য এক সুড়ঙ্গ আছে। পর্বতের অভ্যন্তরে খাত অঙ্কুরময়, এই সুড়ঙ্গ দিয়া ক্রমে অধিকতর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ৩ গজ চৌড়া ও ৩ গজ উচ্চ এক স্থান পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে পূর্ববর্ত ভিতরে ভিতরে পাহাড় কাটিয়া ধাপে ধাপে এক সিঁড়ি পাহাড়ের শীর্ষপর্যন্ত উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে জলআনিবার খাঁই পর্য্যন্ত এক সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গ মুখে প্রকাণ্ড লোহের কটাহ আছে। দৈর্ঘ্য এই পথে শত্রু আসিলে কটাহের নিম্নস্থ অগ্নির তাপে ভাজা হইত, বাহ্যহটক এইরূপ বিকটাকার পথ দিয়া উঠিলে পর্বতোপরিস্থ কেল্লায় উঠা যায়। কেল্লামধ্যে একটা জলের কুণ্ড আছে। নিকটে ১৬০ ফীট উচ্চ এক স্তম্ভ। যেখানে নবাবের নিশান খাড়া থাকে তথায় ১৮ ফীট লম্বা ও ১২ সের গোলায় উপযুক্ত এক পিতলের কামান আছে। এই ভয়ঙ্কর কেল্লা এই অচিন্তনীয় পরিশ্রম করিয়া যে কে নির্মাণ করিয়াছিল তাহার নির্ণয় নাই। অক্লান্ত সন্তাই মহম্মদ তোগলক একবার এই স্থানে কয়েকদিন রাজধানী করিয়াছিলেন। এই কেল্লা দেখিতে হইলে আরাকানবাদের আসিটান্ট এড-জুটেন্ট জেনেরেলের নিকট পাস লইতে হয়।

দৌলতাবাদের ৭ মাইল দূরে জগদ্বিখ্যাত ইলোরার গুহা। গোয়ানে মাইদার কালে উচ্চ পর্বতের উপরিস্থিত প্রশস্ত স্থান মধ্যে দিল্লীস্থ ফকীর রিজামউদ্দীন শিষ্যের কবর দেখিবার যোগ্য। অনতি দূরে রোজাগ্রাম মধ্যে টেমলদৈজুন্স আবদীনও খেত-মার্কেলারত ও কাঠ চন্দ্রাতপবিশিষ্ট সন্তাই আরঞ্জেবের শোভাযিত কবর। মহারাজারদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তিনি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। এই কবরের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মুসলমান কবর ও কবর প্রাপ্ত হইল।

যাহা হউক কিয়দূর গায়ে প্রাচীন ইকুঙ্ক, ইলোরা বা ভিকল নগরের নিকট দূর হইতে এক অর্ধ চন্দ্রাকার পাহাড়ের দেড় মাইল ব্যাপ্ত করিয়া কতকগুলি শক্তিমানিবুধী গুহা লক্ষিত হয়। নিকটে গেলে দেখা যায় এ গুলি প্রকাণ্ড সরজা। এই সরজা দিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে বিকটাকার পাহাড় কাটিয়া মন্দির ও হর্যাদির অবয়ব বাহির করা হইয়াছে। এই সবল মন্দিরের কি ভীষণ অবয়ব! আশ্চর্য্য খোদকারী! ও

কি অচিন্ত্যনীয় নির্মাণ কৌশল! দেখিলে বিস্ময় ও হর্ষ যুগ্মে উদয় হয়। আমরা উত্তর প্রান্তে হইতে দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কোন কোন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কোন কোন মূর্তি দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, এই ৩০ গুহার মধ্যে উত্তরদিকের প্রথম ৬ অর্দ্ধ জৈন, মধ্যে ১৪ হিন্দু ও দক্ষিণ প্রান্তস্থ শেষ ১০ বৌদ্ধ সম্বন্ধীয়।

উত্তর প্রান্তে প্রথমে জগন্নাথ সভা গুহায় প্রবেশ করিলাম। ইহার বামদিকে আদিনাথ সভার গুহা ও দক্ষিণে আর কতকগুলি ক্ষুদ্র গুহা। প্রবেশ মুখে ধ্যাননিমগ্ন ২৮ হাত এক মূর্তি, নাম জগন্নাথ, পার্শ্বে জয় ও বিজয়ের প্রতিকল্প। গুহার মধ্যে দুইটী প্রশস্ত ঘর, অভ্যন্তরের ঘরটী স্বাদশ স্তম্ভ যুক্ত। ডাইনদিকের কোণ দিয়া উপরে উঠিবার পথ। গুহা গৃহের সর্বভাগ উত্তমরূপে খোদিত ও চিত্রিত। এক দিকে কতকগুলি গায়ক ও নর্তকীর প্রতিকল্প। ইহাদের হস্তে বর্তমান কালীন বাজ্যস্ত্র দেখিয়া বোধ হয় গুহা নির্মাণের বহুপরে চিত্রিত হইয়াছে। কড়ির নিকটস্থ স্থান সকলে কোথাও চক্র, কোথাও পাগড়ী হীন মনুষ্য ও কোথাও জীবমূর্তি। জপ করিতেছে একপা সারি সারি মূর্তি বিস্তর আছে। হস্তীর উপর মনুষ্য মূর্তি তরুণের কড়ি। যাহা হউক এই গুহার ভাব বিলক্ষণ গভীর। ইহার প্রবেশ দ্বার ৩৫ ফীট বিস্তৃত, অভ্যন্তর ৫৭ ফীট লম্বা ও ৪৭ ফীট ৭ ইঞ্চি বিস্তৃত। স্তম্ভ ১১ ফীট ৪ ইঞ্চি উচ্চ ও প্রায় ৯ ফীট ৭৪০ ইঞ্চি স্থূল। প্রস্তর কড়ি ২ ফীট মোটা। অভ্যন্তরের গৃহ ৩৪ ফীট লম্বা ও ২০ ফীট বিস্তৃত।

অনন্তর আমরা আদিনাথ সভা গুহায় প্রবেশ করিলাম। এই গুহার প্রবেশ দ্বারের কার্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। উপরে দুই পরিচারক সহ লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি। বাত রুদ্ধিতে কয় হইয়াছে। অভ্যন্তরে একোষ্ঠী মধ্যে ২৮ হাত আদিনাথ মূর্তি। বামে আর একটী ক্ষুদ্র গুহা মাটি পড়িয়া বুজিয়া আছে। স্তম্ভ মস্তক জগন্নাথ সভার স্তম্ভ মস্তকের জায় শোভাশালী। এই গুহার দৈর্ঘ্য ৩০ হাত, বিস্তার ১৯ হাত উচ্চতা ৬ হাত এবং চতুর্কোণ স্তম্ভের এক এক দিক দুই হাত।

অনন্তর ইন্দ্রসভা গুহা। ইন্দ্রসভা গুহাপুঞ্জ অতি চমৎকার। পূর্বত-
 গাত্রে বিবিধাকারে খোদিত এক রমণীয় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখি-
 লাম জামুনাও একটী পূর্বত মুন্দের মন্দির রূপে খোদিত হইয়াছে। তাহার
 শীর্ষভাগে বসার্বাহী প্রাশংসনীর। মধ্যস্থলে খোদিত সিংহাসনোপরি এক-
 ধারী মূর্তি বিরাজিত। মন্দিরের বামপার্শ্বে অগুঠিত স্তম্ভোপরি কয়েকটী
 মূর্তি উপবিষ্ট আছে। ডাইনদিকে আরোহীশূন্য এক প্রস্তরহস্তী।
 এই প্রাঙ্গণের বামে ধারীমূর্তিবিশিষ্ট ও উপরিভাগে চিত্রিত আর এক
 গুহা। এই গুলি অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রসভা নামক গুহার নিম্ন তলের প্রবেশ
 দ্বার। নিম্নতলে একধারী মূর্তি, ডাইনদিকে উপরে উঠিবার সোপান।
 উপরের গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রমূর্তি বসান হস্তীর উপর উপবিষ্ট। ইন্দ্রের
 মস্তকে মুকুট, গলে উপবীত, পশ্চাতে মস্তুর শোভিত বক্ষ ও পার্শ্বে চামর
 হস্তে দুই চর। অপর দিকে ৪ সহচরীযুতা ইন্দ্রাণী বালক ক্রোড়ে করিয়া
 আকৃতলে শয়ান সিংহোপরি উপবিষ্ট। গৃহটী দ্বাদশ স্তম্ভদ্বারা দুই
 চতুর্কে বিভক্ত হইয়াছে। অভ্যন্তরের চতুর্ক মধ্যে সমচতুর্কোণ বেদী।
 গৃহের প্রকোষ্ঠ মধ্যে ৩ হাত একধারী মূর্তি। গৃহের যে অংশ নিরীক্ষণ
 করা যায় কত মূর্তি, কতরূপে কি চমৎকারই খোদিত হইয়াছে। ইন্দ্রসভা
 গুহার প্রবেশ দ্বারের উচ্চতা ৫০ হাত বিস্তার ৪ হাত, প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্য
 ৩৬ হাত বিস্তার ৩০ হাত মন্দিরের প্রত্যেক পার্শ্ব ১২ হাত, উচ্চতা ১৮ হাত
 পার্শ্বের স্তম্ভ উপস্থিত মূর্তি সহ ১৬ হাত, তাহার বেটন ৮ হাত, ডাইনের
 হস্তী লম্বে ৯ হাত উচ্চতার ৬ হাত, বামদিকের গুহার গভীরতা ২১
 হাত বিস্তার ১৮ হাত উচ্চতা ৮ হাত, ঐ দিকে আর এক গুহার গভীরতা
 ১০ হাত, বিস্তার ৫ হাত উচ্চতা ৪১০ হাত। ইন্দ্র সভা গুহার নিম্নতলের
 গভীরতা ৫২ হাত বিস্তার ২৫১০ হাত উচ্চতা ৯১০ হাত সমকোণ স্তম্ভের
 প্রত্যেক পার্শ্ব ২১০ হাত উপরতলের গৃহের গভীরতা বারান্দাপার্শ্বান্ত ৫২
 হাত বিস্তার ৪৪ হাত উচ্চতা ৯১০ হাত।

অনন্তর প্রব্রুতরাম গুহা। ইন্দ্র সভার উচ্চতলের বামদিকে এই গুহা
 অবস্থিত। শিলাপট্টনপুণ্য প্রায় ইন্দ্র সভার তুল্য। এই গুহা হইতে জগ-
 ন্নাথ সভার উপর তলে ঘাইবার এক পথ আছে। গুহার গভীরতা ২৪ হাত

বিস্তার ১৭ হাত, উচ্চতা ৬ হাত, সম্মুখের প্রকোষ্ঠস্থ ধারী মূর্তি ২ হাত।

অনন্তর ডুমারলেনা গুহা। পরশুরাম গুহা হইতে আর আঁধোপায়া ছুর, কঠোর পার্শ্বভেদ মধ্য খাত এক গলি, গলির বামে ইন্দিকাপুরিত এক গহ্বর, গলির শেষে এক প্রশস্ত স্থান তাহার সম্মুখে এক ক্ষুদ্র গুহা। প্রশস্ত স্থানের ডাইন পার্শ্বে দুই দিকে সিংহযুক্ত এক প্রকাণ্ড গুহার প্রবেশ দ্বার, প্রবেশমুখে বারান্দা। বারান্দার বামে যক্তি হস্ত প্রকাণ্ড ধর্মের মূর্তি। ডাইনদিকে বিষ্ণেশ্বরের নন্দী ও প্রেতসহ তাণ্ডব নৃত্য। বারান্দার পর গুহা খণ্ডে খণ্ডে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে। চতুর্ধ্ব বা মধ্য খণ্ডের বামে একটী সমচতুর্কোণ মন্দিরের দ্বার। তাহার ডাইনদিকে চন্দ্র ও ভবানী এবং বামে পবন ও লক্ষ্মীর মূর্তি। এই মন্দিরের নানাদিকে নানান মূর্তি ও মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ।

অনন্তর জনবাস বা বিবাহ গুহা। গহাক্ষযুক্ত বারান্দা দ্বারা গুহার অভ্যন্তর আলোকিত। দ্বারের বামে মহাদেব বিষ্ণু ও ব্রহ্মা মূর্তি, ডাইনে লক্ষ্মীনারায়ণ। বামের প্রান্তভাগে বরাহ অবতারের দশনাথ্রে পৃথিবী উদ্ধার। দক্ষিণদিকের প্রান্তে নিদ্রিত কৃষ্ণকর্ণের উদরে একটী স্ত্রীলোক হাত বুলাইতেছে। বারান্দার দৈর্ঘ্য ৪২ হাত, বিস্তার ৫১ হাত, উচ্চতা ৮ হাত, দ্বারের বিস্তার ৩০ হাত, উচ্চতা ৫১ হাত, গৃহের দৈর্ঘ্য ৪৪ হাত, দুই পার্শ্বের প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৪ হাত, গৃহের বিস্তার ১৩ হাত, উচ্চতা ৭।০ হাত ও অভ্যন্তরস্থ গর্ভগৃহের গভীরতা ১৫ হাত, বিস্তার ৮ হাত এবং উচ্চতা ৫।০ হাত। এই গুহার কয়েক হস্ত দূরে আর এক জনাবাস। সম্মুখে ৮ হাত উচ্চ চারি স্তম্ভ ও দুই ভিত্তিসম্মুখ স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। তাহার পর দুই দিকে প্রকোষ্ঠ সমন্বিত ৭৪ হাত লম্বা, ১৪ হাত বিস্তৃত ও ১০ হাত উচ্চ এক গৃহ। তদনন্তর ২৬ হাত দীর্ঘ, ২৪ হাত প্রস্থ গর্ভগৃহ স্থান। গর্ভগৃহের সম্মুখে দুইটী স্তম্ভ ও দুইটী ভিত্তিসম্মুখ স্তম্ভ। স্তম্ভের সৌন্দর্য অতি চমৎকার। তিনটী ধারী মূর্তির উপর উপরিভাগে মূল্যবান পুষ্পের ভার খোদিত স্তম্ভ উদ্ভিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে স্তম্ভ সম উচ্চ দুইটী অর্ধ উল্লঙ্গ স্ত্রীলোক এক হাতে নৃত্যকারী দুইটী বালকের হস্ত ধারণ ও আর এক হস্তে চাখর

উদ্ধৃত করিয়া দণ্ডায়মান । গর্ভগৃহ স্থানে সমচতুর্কোণ গৃহ মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর শিবলিঙ্গ । দ্বারের পার্শ্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মূর্তি ।

অনন্তর কুমারবর গৃহ । চারি স্তম্ভদ্বারা এই গৃহ চারি ভাগে বিভক্ত । গর্ভগৃহের দ্বারের উত্তর পার্শ্বে সূর্য্যর প্রকাণ্ড মূর্তি । কিন্তু উপরকার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িতে প্রবেশদ্বার কষ্ট প্রায় ।

অনন্তর বানী বা তৈলযন্ত্র গৃহ । এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ দেখা গেল । মধ্যে গণেশ ও মহাদেবের মূর্তি আছে । নিকটে ঐরূপ আর কতকগুলি গৃহ ।

অনন্তর নীলকণ্ঠ মহাদেব গৃহ । প্রবেশমুখে বাঁড়ের মূর্তি । কাল করাইয়াছে । কয়েকটা সিঁড়ি উঠিয়া ভিত্তিশেষে দুই সৈনিকের প্রতি-
রূপ । অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠ মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ । গৃহের ভিত্তির দুই দিকে কার্তিক ও শগেশমূর্তি । গণেশ নিকটে সন্ন্যস্তী । প্রকোষ্ঠদ্বার পার্শ্বে লক্ষ্মীর নানারূপ । গৃহের গভীরতা ২৯ হাত, প্রবেশ মুখের দৈর্ঘ্য ৪৫ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত । প্রকোষ্ঠ ১৯ হাত লম্বা ও ১১ হাত প্রশস্ত । ইহাতে স্তম্ভ ও ভিত্তিলগ্ন স্তম্ভ ১৫ টি আছে ।

অনন্তর বামেধর গৃহ । প্রবেশ মুখে শয়ান বাঁড়ের মূর্তি । তাহার বামে চারিদিকে গাঁথান ও পরিষ্কৃত জলপূর্ণ একটা কুণ্ড । গৃহ প্রবেশের পূর্বে উত্তর প্রান্তে কামিনীর প্রতিরূপ, প্রবেশ দ্বার অতি উত্তমরূপ খোদিত চারি প্রস্থান স্তম্ভ ও অর্দ্ধ স্তম্ভে শোভিত । অর্দ্ধ স্তম্ভ অর্থাৎ ভিত্তিলগ্ন স্তম্ভোপরি খোদিত স্ত্রীলোকের মূর্তিটী বড় মনোহর । গৃহের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ । গৃহাটী প্রকোষ্ঠ সমাহৃত একটা প্রকাণ্ড গৃহ । প্রকোষ্ঠ গুলি খোদিত মূর্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে । নওছন্দা নামক প্রকোষ্ঠ ডাইনদিকে অবস্থিত । ইহার ডাইন ভাগে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট এক রূপণ আহারের জন্ত ক্রন্দন-
শীল স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ বলিয়া আছে এবং দুই জন চোর তাহার অর্থ চুরি করিতেছে । ইহার অপরদিকে কালভৈরব নৃত্য করিতেছে এবং ভূত প্রেত করতালি দিতেছে । প্রকোষ্ঠ হইতে পুনরায় গৃহে আসিয়া ডাইনদিকে গেলে দেখা যায় যে, হরপার্বতী ক্রীড়া করিতেছেন ও নারদ বিবাদ লাগাই-
বার জন্ত বধাঙ্গনে উৎসাহ দিতেছেন । নিম্নে বিবাদ লাগিয়াছে ও একটা

চিত্র পশ্চাৎ দেশ জুলিয়া বিবাদে রক্ষা করিতেছে। গৃহের প্রান্তে বাম-
দিকের প্রকোষ্ঠে ডাইনপার্শ্বে দেব দেবী সহ ভবানী ও বামপার্শ্বে মহুর
সহ কার্তিক। প্রকোষ্ঠের মধ্যে ভিত্তির উপর জনকের বাটিতে বিবাহ
উৎসব। এক জন একটা ফল ধরিয়া দণ্ডায়মান ও নিম্নে গণেশ ব্রহ্মাদি
দেবগণ বসিয়া আছেন। এখান হইতে বাহির হইয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ
করিলে বামদিকে এক মনোহর মূর্তি। কৈলাসে সিংহাসনোপরি চতুর্ভুজ
শিব অর্দ্ধ উলঙ্গ পার্শ্বতীকে ক্রোড়ে করিয়া উপবিষ্ট। এক হাত আপন
উকদেশে, আর এক হাত পার্শ্বতীর গলে ও তৃতীয় হস্ত দ্বারা পার্শ্বতীর গীন
স্তনের নিম্নভাগ ধরিয়া সহাস্তমুখে মর্দন করিতেছেন। দুই পার্শ্বের দুই
প্রমথ চামর হস্তে তাহা দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আছে। সিংহা-
সনের সিঁড়িতে বসিয়া দুইটা বানর বা ভূত হস্ত নাড়িয়া কাছাকে ডাকি-
তেছে। ভীষণ মূর্তি রাবণ বীরদর্পে উপবিষ্ট হইয়া কৈলাস সহ এই
সিংহাসন উত্তোলন করিতেছে। তাহার অবশিষ্ট দুই হাত সাহকার ভাবে
দুই উকতে সংস্থাপিত। এই গুহার কতদিকে কতরূপ কত মূর্তি। প্রকোষ্ঠ
সহ গৃহের দৈর্ঘ্যতা ৬০ হাত, গভীরতা ৪৮ হাত ও উচ্চতা ১০ হাত। কৈলাস
গুহা। এইটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে
এক প্রশস্ত স্থান। ৩২ হাত উচ্চ পাঁহাড় কাটিয়া ৯২ হাত দীর্ঘ ও ৫৮ হাত
বিস্তৃত এই স্থান করা হইয়াছে। প্রবেশ দ্বারের ডাইন পার্শ্বে একটা জল-
পূর্ণ কুণ্ড এবং উভয় পার্শ্বে উৎকৃষ্টরূপ খোদিত, শীর্ষ সমায়ুক্ত ও একতলা
সম উচ্চ দুইটা বিভাগ অগ্রসর হইয়া আছে। প্রবেশদ্বার অতি প্রশস্ত,
উচ্চতা ৯ হাত, বিস্তার ৯ হাত ও গভীরতা ২৮ হাত। দ্বারে প্রবেশ
করিয়া এই ২৮ হাত পার হইবার কালে দুই পার্শ্বে ১০ হাত দীর্ঘ ও ৬ হাত
বিস্তৃত দুই ঘর। দরজার উপর নগপত্থানা ৯ হাত লম্বা ৫ হাত চৌড়া
ও ৫ হাত উচ্চ। দরজার দোতলার গৃহের বাহিরে গ্রীকজাতীয় চমৎকার
স্তম্ভমালা। দরজার পথে অর্ধভূজা ভবানী ও গণেশের সুন্দর মূর্তি।
যাহা হউক দরজা পার হইয়া এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে পড়িতে হয়। ৬৬ হাত
উচ্চ পাঁহাড় কাটিয়া ১৬৪ হাত দীর্ঘ ও ১০০ হাত প্রস্থ এই বিশাল স্থান
প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাঙ্গনের চারিদিকে চকমিলান বাটীর ন্যায় সজ্জীকৃত

ঘর, এবং প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে এক বিশাল হর্য্য। প্রকাণ্ড পাঁচাড়া কাঠের বাহির করা এই মস্ত গৃহের অর্গঠিত শীর্ষ আশ্চর্য্য জবরব, নান্য-রূপ গঠক, স্বকল স্বকল প্রাদিকারী ও বিবিধ স্থানে বিবিধরূপ কণ্ঠানার বর্ণন করা করে প্রাক্ষর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক দৈত্যের করা! কি বায়বের কার্য্য! একজন ইউরোপীয় গণিত লিখিয়াছেন, পুরাকালে শত-শালিনী ভারতের প্রজাগণ সামান্য কষ্টে সকল বিষয় উপভোগ করিত। আহা! তাহাদের কোন কাজ ছিল না, এই জন্ত দেশের লোক এক-ত্রিত হইয়া ভূমণ্ডলের বিশ্বয়জনক এই সকল অদ্ভুত কীর্তি করিয়াছে। এই গুহা প্রস্তুত করিতে এক সঙ্গে যে কত লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না।

মহা হউক মধ্যস্থলের বিশাল হর্য্যের উপরতলে বাইবার জন্ত মধ্য-স্থলের হর্য্য ও ঘর এই উভয়ের মধ্যভাগে প্রাঙ্গণের উপর একটা ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ আছে। এই গৃহের এক পার্শ্ব ঘরের উপরতলার সহিত ও অপর পার্শ্ব মধ্যস্থ প্রাঙ্গণ হর্য্যের উপর তলের সহিত দুই খণ্ড সেতু দ্বারা সংযুক্ত। মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণ হর্য্যের ডাইন ও বামদিকে স্থানেস্থানে এক একটা বিভাগ বাহির হইয়াছে। প্রথমে ডাইনে ও বামে উভয় পার্শ্বে দুইটা ঘর ইহার গায়ে লগ্ন। কিছু দূর পরে উভয় পার্শ্বে প্রকৃপ আর দুইটা বিভাগ। অপর দূর পরে প্রকৃপ আর দুই গৃহ প্রাঙ্গণ হর্য্য সংযোজিত ও পশ্চাত দিকেও একটা ঘর সংলগ্ন আছে। ঘরের কাঁড়াইয়া সাধারণতঃ এইরূপ দুই নেত্রপথে পতিত হয়। এখন আমরা অগ্রে নিম্নতল দর্শন করিব। প্রথমে ঘর হইতে অবতরণ করিলাম। মস্তকের উপর পূর্ব বর্ণিত সেতু। দক্ষিণে ও বামে প্রাঙ্গণ মধ্যে দুইটা জীবিতাপেক্ষ বৃহৎ হস্তী দণ্ডায়মান। সম্মুখে স্তম্ভ ও নানা মূর্তিবৃত্ত পূর্ব বর্ণিত দ্বিতল গৃহের নিম্নভাগ। দ্বিতল গৃহের দুই পার্শ্বে ৭ হাত অন্তরে প্রাঙ্গণ মধ্যে স্বকল খোদিত দুইটা প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ। ইহার উচ্চতা ২০ ফুট ও নিম্নভাগ ৭ হাত সমচতুর্ভুজ। ঘর হর মস্তক সিংহ ছিল। দ্বিতল গৃহের নিম্নভাগ পার হইয়া দ্বিতীয় স্তরের নিম্নে উপস্থিত হইলাম। ইহার এক পার্শ্বে সভাসদসহ প্রকাণ্ড ভোজরাজ বসিয়া আছেন, আর এক পার্শ্বে দশহাত এক ভরকর মূর্তি।

সেতুর শেষে মধ্যস্থ বিশাল হর্যোর গাত্রদেশ । উপরে উঠিবার জঙ্গলারের দক্ষিণে ও বামে ৩৬ খাপে দুইটা সিঁড়ি । তদনন্তর আমরা মধ্যস্থ বিশাল হর্যোর ডাইনদিকের গাত্র সংলগ্ন প্রথম গৃহে প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ মাত্র সম্মুখে রাম রাবণের ভীষণ যুদ্ধের প্রতিরূপ । ইহার মধ্যে হনুমান মূর্তিটিই চমৎকার । আর এক পার্শ্বে সিংহ, হস্তী ও অপরাণব ভয়ঙ্কর জন্তুর মস্তক বহির্গত । যেন তাহারা স্বেচ্ছা করিয়া হর্য্য বহন করিতেছে । ইহার কিছু দূর পরে বিশাল হর্যোর গাত্রলগ্ন দ্বিতীয় গৃহ, পরে তৃতীয় ও পঞ্চাভের গৃহ । ইহাতে বিশেষ দেখিবার কিছুই নাই । বামদিকের প্রথম গৃহে কুকুকেত্রের যুদ্ধ । দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহে বিশেষ কিছু নাই ।

এখন আমরা প্রধান হর্যোর উপরিভাগ দর্শন করিব । পুনরায় প্রবেশ দ্বারে প্রত্যাগত হইয়া দ্বারের উপরতলে উঠিলাম । দ্বারের উপর সম্মুখে সারি সারি তিন ঘর, মধ্যকার গৃহের দুই পার্শ্বে আর দুই ঘর । সম্মুখের ঘর প্রত্যেকে দীর্ঘ প্রস্থ ও উচ্চতায় ৬ হাত । পার্শ্বের গৃহ প্রত্যেকে ১৫ হাত লম্বা ও ১০ হাত বিস্তৃত । সম্মুখের তিন ঘর পার হইয়া সেতু । সেতুর দৈর্ঘ্য ১৩ হাত, বিস্তার ১২ হাত ও উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর ২১০ উচ্চ । তাহার পর ৯টা খাপ উঠিয়া দ্বিতল গৃহে প্রবেশ । দ্বিতল গৃহ প্রত্যেকে দশহাত । ইহার মধ্যস্থলে নন্দী নামক প্রকাণ্ড ঘাঁড়ের মূর্তি । দ্বিতল গৃহ পার হইয়া দ্বিতীয় সেতু ২৫ হাত লম্বা ও ১৪ হাত বিস্তৃত । এই সেতু শেষে দুই পার্শ্বে দুই স্তম্ভ তাহার উপরে সিংহ ও নিম্নে সিংহবৎ মূর্তি, আর দুইটা অর্দ্ধ স্তম্ভ বিশাল হর্যোর গাত্র সংলগ্ন । বারান্দা লম্বা ১২ হাত বিস্তারে ১০ হাত ও ইহার পার্শ্বস্থ প্রাচীর ১১ হাত উচ্চ । বারান্দায় ২১০ হাত উচ্চ ও ২১০ হাত বিস্তৃত বসিবার প্রস্তরবেঞ্চ । পূর্ব বর্গিত নিম্নের দুই পার্শ্বের সিঁড়ি দিয়াও এক্ষানে উঠা যায় । বারান্দা হইতে চারিটা উৎকৃষ্ট খাপের পর বিশাল মন্দিরের দ্বারদেশ । দ্বারের উত্তরপার্শ্বে ভয়ঙ্কর মূর্তি । দ্বারটি ৮ হাত উচ্চ ও ৪ হাত বিস্তৃত । দ্বার পার হইয়া দ্বিতীর্ঘ মণ্ডপগৃহ ও তৎপরে অর্দ্ধমণ্ডপ ও তৎপরে ৫ খাপের উপর গর্ভ গৃহ, তন্মধ্যে লিঙ্গমূর্তি মহাদেব । দ্বার হইতে গর্ভগৃহের ভিত্তিপৰ্য্যন্ত মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৬২ হাত, বিস্তার ৪০ হাত ও কড়ির নিকট পর্য্যন্ত উচ্চতা ১২ হাত । মণ্ডপের মধ্যে চমৎকারিষা চম

থাকে ছত্রিশ স্তম্ভ আছে। ভিত্তির নিকটস্থ স্তম্ভসমূহ ভিত্তিতে সংলগ্ন।
 বড়ি অর্থাৎ কড়ির নিকটস্থ ভাগ চূর্ণে আবৃত ও নানা চিত্রে শোভিত। দ্বার
 দেশের উত্তর পার্শ্বে ভূরি ভূরি স্তম্ভ। তিন থাক স্তম্ভের পর এই মণ্ডপের
 দক্ষিণে ও বামে দুই বারান্দা। এই বারান্দায় নিম্নভাগের নাম রাখণ ও
 কুককেত্র যুদ্ধ গৃহের উপরে সংস্থিত। ডাইনদিকের বারান্দা হইতে প্রাঙ্গণের
 ডাইন প্রাস্তর গৃহে যাইবার সেতু ছিল। এখন ভাঙ্গিয়া পড়াতে যাত্রণা
 ভার। মহাদেবের দিকে মণ্ডপের দুই কোণের নিকট দুই দ্বার। দুই দিকের
 দুই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দুই প্রশস্ত স্থান। উত্তরদিকের প্রশস্ত স্থানের
 দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড মন্দির। মধ্যে শিব নাই। নিম্নতলের দুই দিকের
 ভিত্তি সংলগ্ন দ্বিতীয় বিভাগ দ্বয়ের উপর এই মন্দিরদ্বয় সংস্থিত। এই
 মন্দিরদ্বয়ের পার্শ্বে প্রধান মন্দিরের পশ্চাত ভাগস্থ প্রশস্ত স্থানে আর তিন
 মন্দির। দুইটী দুই পার্শ্বে ও একটী মধ্যস্থানে অবস্থিত। পার্শ্বের দুইটী নিম্নের
 দুই দিকের তৃতীয় ভাগদ্বয়ের উপর এবং মধ্যকারটী পশ্চাৎদিকের বহির্গত
 ভাগের উপর সংস্থাপিত আছে। ইহাদের মধ্যেও শিব নাই। শিব-
 মুক্ত প্রধান মন্দিরের পশ্চাৎ দেশ হইতে পশ্চাতস্থ মন্দিরের ভিত্তি পর্য্যন্ত
 ২৬ হাত। এই সকল মন্দিরের শীর্ষঘটা ও অভ্যন্তরস্থ চিত্র অতি চমৎ-
 কার। কিন্তু অভ্যন্তরের অনেক ভাগ ধূমে ধূসরিত, হইয়াছে। হরাস্থা
 আরংজিব কোনরূপে ইহার ক্ষতি করিতে সমর্থ না হইয়া অভ্যন্তর ভাগ
 ধড়পূর্ণ করিয়া অগ্নি প্রদান করে। তাহারই জন্ত কোন কোন স্থান ধূসরিত।
 স্বাস্থ্য হউক মধ্যস্থ এই বিশাল হর্ম্যের শীর্ষপর্য্যন্ত উচ্চতা ৬০ হাত, পার্শ্বস্থ
 অপর্যাপ্ত মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩৪ হস্ত।

এইরূপে মধ্যভাগের বিশাল হর্ম্য পরিদর্শন করিয়া আমরা প্রাঙ্গণ
 প্রাস্তর চতুর্দিকের চকমিলানের জায় গৃহাবলী দর্শন করিতে অগ্রসর হই-
 লাম। অগ্রে উত্তর বা বামদিকের নিম্নতল দর্শন করা যাউক। প্রথমে
 একটী গুহা, সম্মুখ প্রান্তে দুইটী স্তম্ভ ও তিনটী ত্রীমূর্তি চূর্ণিত প্রস্তরে অর্জ
 নিম্নয়। গুহার দৈর্ঘ্য ১৪ হাত, বিস্তার ৫ হাত ও উচ্চতা ৬ হাত। অন্তর
 আর এক গুহা। ইহার সম্মুখে ৫ স্তম্ভ। এই গুহার দৈর্ঘ্য ৩৮ হাত, বিস্তার
 ৪ হাত ও উচ্চতা ৭ হাত। এই স্থানে উপরতলে উঠিবার সিঁড়ি। তাহার

পর কিছুদূর গুহা নাই। তদনন্তর দুই রহৎ সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ ও অভ্যন্তরে
বেদীযুক্ত ৩৬ হাত লম্বা, ৮ হাত চোড়া ও ১০ হাত উচ্চ এক গুহা। তাহার
পরে ৪ হাত উচ্চ ও ১১০ হাত বিস্তৃত এক ঘর দিয়া প্রায় ২ হাত সম-
চতুষ্কোণ একাদশ স্তম্ভ শোভিত এক বারান্দা। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৮ হাত, বিস্তার
৮ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত। অনন্তর আমরা বিশাল হাফোর পঞ্চাশে পূর্ব-
দিকস্থ নিম্নতলের বারান্দার প্রবেশ করিলাম। এই বিস্তীর্ণ বারান্দা লম্বে
১২৪ হাত, বিস্তারে ৮ হাত এবং সারি সারি সপ্তদশ স্তম্ভে বিভূষিত। ইহার
পরে প্রাঙ্গণের ডাইন প্রান্তস্থ দক্ষিণদিকের গৃহ সমূহ। প্রথমে পূর্বদিকের
বারান্দার সহিত সংলগ্ন বারান্দা ১০ স্তম্ভে সজ্জিত। আরংজেব তিনটী ভগ্ন
করিয়াছে। বারান্দার প্রবেশদ্বার ৪ হাত উচ্চ ও ১১০ হাত প্রশস্ত। ইহার
দৈর্ঘ্য ৪০ হাত, বিস্তার ১১ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত। এই বারান্দার মধ্যে
৪০ হাত লম্বা, ১৪ হাত চোড়া ও ৮ হাত উচ্চ কতকখোদিত এক গৃহ।
নিকটে ১০ হাত দীর্ঘ, ৮ হাত বিস্তৃত ও ৪ হাত উচ্চ এক গৃহ কতকগুলি
উৎকৃষ্ট মূর্তিতে পূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া আছে। ৮ হাত উচ্চ স্থানোপরি
২৪ হাত লম্বা, ১০ হাত গভীর ও ৮ হাত উচ্চ এক গুহা। ইহার অভ্যন্তরে
ভিত্তি হইতে বিসৃষ্ট ভূরি মূর্তি। কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড মূর্তি।
আর একটা রহৎ মূর্তি শয়ান এক উলঙ্গ মূর্তির উপর পা দিয়া বসিয়া
আছে। ৪১০ হাত লম্বা, ৪ হাত বিস্তৃত ও ৫ হাত উচ্চ এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট
১৬ হাত লম্বা, ১২ হাত গভীর ও ৬ হাত উচ্চ এক গুহা। অনন্তর দক্ষিণ
দিকের শেষ প্রান্তে ১৬ হাত লম্বা, ৬ হাত বিস্তৃত ও ৮ হাত উচ্চ এক গুহা।
এইরূপে চতুঃপার্শ্বস্থ গৃহের নিম্নতল দর্শন করিয়া আমরা তত্পর তল দেখি-
বার জন্ত উপরে উঠিয়া পুনরায় বামদিক হইতে দর্শন আরম্ভ করি। প্রথম
গুহার উপর কতক খোদিত একটা গৃহ। দ্বিতীয় গুহার উপর পুর লক্ষ্য
নামক গৃহ। আমরা সিঁড়ির ২৫ ধাপ দিয়া উপরে উঠিলাম। ঘরের
উপর ষাঁড় এবং দুইদিকে গদার উপর দুইটী উত্তম মূর্তি। গৃহের প্রান্তে
গর্তগৃহে লিঙ্গ মূর্তি মহাদেব। মণ্ডপের স্তম্ভ সকল অভ্যন্তস্থূল। মণ্ডপটী
উত্তম খোদিত ও চিত্রিত ভূরি ভূরি দেব দেবীর মূর্তিতে পরিপূর্ণিত। ধূম্রভে
কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪৬ হাত, প্রস্থ ৪০ হাত এবং

উচ্চতা ৯০ হাত, আইনদিকের দ্বিতলের মধ্যে প্রথম দ্বিতল ৪০ হাত দীর্ঘ, ১৬ হাত উচ্চ ও ১২ হাত গভীর । ইহার সহিত সংযুক্ত আর এক অন্ধকার গৃহ । এই গৃহের গভীরতা ১৯ হাত, দৈর্ঘ্য ২৪ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত । দ্বিতীয় দ্বিতলটীতে উঠিবার সিঁড়ির ২৪ সোপা । ইহার পরিমাণ নিম্নতলের গৃহের সমান । এই গৃহের সংলগ্ন আর এক গৃহে পার্কত ধসিয়া পড়িতেছে ।

এখন আমরা বারান্দার গাভের মূর্তিগুলি ক্রমান্বয়ে বর্ণন করিয়া কৈলাস গুহা শেষ করিব । বারান্দার অভ্যন্তরীণ দেবদেবীর মূর্তিতে পূরিত । প্রথমে বিকটাকার মূর্তি রাবণ মহাদেবকে ধারণ করিয়া আছে । তদনন্তর পার্কতী । তৎপরে রাবণ বসিয়া কি লিখিতেছে । তাহার পর ঝাড়ের উপর মহাদেব ও পার্কতী, তদনন্তর আর এক ঐ মূর্তি, তাহার পর বিষ্ণু, তদনন্তর পার্কতী । তৎপরে বিষ্ণুভক্ত পদে শৃঙ্খলজড়িত করিয়া আছে । তাহার পর পুনরায় পার্কতী । পার্কতীর এই সকল মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন । তদনন্তর দুইবার বিষ্ণু ও লক্ষ্মী মূর্তি । তদনন্তর পিও হইতে বলভদ্র নির্গত হইতেছে । তৎপরে পূর্বদিকের বারান্দা আরম্ভ । ইহার প্রথমেই পার্কতী । তাহার পর ঠৈরব এক জনকে শূলে বিদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান । তাহার পর রথে এক দৈত্য ধম্ম আকর্ষণ করিতেছে । ইহার পর পার্কতী ও কালঠৈরব । তদনন্তর নরসিংহ অবতার স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইতেছে । তাহার পর আর দুই ঠৈরব । পরে বিষ্ণু, গোবিন্দ, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, মহাদেব, নারায়ণ ঠৈরব গোবিন্দ, কালঠৈরব গোবিন্দ, লক্ষ্মী ও কৃষ্ণমূর্তিতে পূর্ব বারান্দা শেষ । ইহার পর দক্ষিণের বারান্দায় মহাদেব ও ইতলদাস । তাহার পর ধর্মরাজ এক জনকে আলিঙ্গন করিতেছেন । তদনন্তর নরসিংহ অবতারের হিরণ্যকশিপু বধ, তাহার পর শেষনাগের উপর শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উপবিষ্ট । ইহার পর গোবর্দ্ধন, ছয়হস্তযুক্ত বলি, গন্ধড়ের উপর কৃষ্ণ, বরাহ অবতার, কালীর নাগোপরি চতুর্ভুজ কৃষ্ণ বলদেব ও অন্নপূর্ণা । প্রত্যেক মূর্তি পার্শ্বে তল্লীলা প্রকাশক নানা মূর্তি । ইতি কৈলাস গুহা ।

অনন্তর দক্ষ অবতার গুহা । পূর্ব প্রবেশ দ্বার সংকল্প । এ জন্য কর্কশ প্রস্তরের উপর দিয়া কষ্ট করিয়া উঠিতে হয় । প্রবেশ করিয়া এক প্রশস্ত স্থান । তদ্ব্যতীত এক সমচতুষ্কোণ গৃহ, বারান্দা তল্ল হইয়া পড়িয়াছে, এক

দিকে একটি শুষ্ক জলাশয় ও অপরদিকে জলপূর্ণ এক ক্ষুদ্র কুণ্ড । গৃহে প্রান্তরের জাকরী, জাকরীর দুই পার্শ্বে বৃহৎ মূর্তি এবং উপরিভাগে বহুমূর্তি । গৃহটী লম্বে ২০ হাত, বিস্তারে ১৭ হাত ও উচ্চতার ৬০ হাত । ইহার পর উপর ও নিম্নে ৬ সমচতুর্কোণ স্তম্ভ ও দুই অর্দ্ধস্তম্ভবিশিষ্ট এক দ্বিতল গৃহ । উপরে ঘাইবার রাস্তা বন্ধ । উপরিভাগের গৃহ মধ্যে ৮ খাণ চতুর্কোণ স্তম্ভ আছে । গৃহের প্রকোষ্ঠ মধ্যে মহাদেব এবং মহাদেবের দ্বারদেশে দশ অবতারাদির মূর্তি । নিম্নের গৃহ দৈর্ঘ্যে ৬৮ হাত, বিস্তারে ৩০ হাত, উচ্চতায় ৯ হাত এবং উপরের গৃহ দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত, গভীরতায় ৬৬ হাত, উচ্চতায় ৯ হাত । গৃহের অনেক ভাগ ভগ্নপ্রস্তরে আবৃত ।

অনন্তর ত্রিতলগৃহ । দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে প্রতিতলে দশটি চতুর্কোণ স্তম্ভ শোভিত এক ত্রিতল গৃহ । পার্শ্বের দুইটি স্তম্ভ ভিত্তি-লম্ব এবং নিম্নতলের মধ্যকার দুইটি খোদিত । প্রাঙ্গণের বাম কোণে একটি জলপূর্ণ কুণ্ড । নিম্ন তলের গৃহ ৬ স্তম্ভে তিনভাগে বিভক্ত । মধ্য ভাগের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে শেখ নাগের প্রকাণ্ড মূর্তি । চতুর্থ স্তম্ভ হইতে গৃহ ক্রমে স্বর্ণমণ্ডপে দুই পার্শ্বে আরও দুইটি প্রকোষ্ঠ জন্মিয়াছে । ইহার এক দিকে লক্ষ্মীচর্চা, অপর দিকে আদিনাথের মূর্তি । দ্বারের পার্শ্বেও বড় বড় মূর্তি । এই গৃহের গভীরতা ২৭ হাত, দৈর্ঘ্য ৭৮ হাত, উচ্চতা ৭ হাত, প্রকোষ্ঠের গভীরতা ২৯ হাত । মধ্যস্থ গৃহের গভীরতা ৮ হাত, বিস্তার ১২ হাত, উচ্চতা ৯ হাত । মূর্তির উচ্চতা ৭০ হাত । তদনন্তর ডাইনদিকের ২৪ খাপ দিয়া দ্বিতলে উঠিতে হয় । উঠিবার কালে দূরে পাহাড়ের গাত্রে মূর্তিবিশিষ্ট এক গুহা দর্শন হয় । দ্বিতলের প্রবেশমুখে একটি উৎকৃষ্ট বারান্দা । বারান্দার সম্মুখে যম বসিয়া আছে । বারান্দার প্রত্যেক পার্শ্বে এক দরজা । তদ্বাধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে পর্বত প্রান্তে চারিটি ঘর । মধ্যস্থ গৃহমধ্যে লক্ষ্মণ বসিয়া আছেন এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড মূর্তি । বারান্দার দৈর্ঘ্য ৭৬ হাত গভীরতা প্রকোষ্ঠ লম্ব ৪৪ হাত, উচ্চতা ৮ হাত এবং প্রকোষ্ঠ ১০ হাত । বারান্দার বিপরীত পার্শ্বের দরজা দিয়া ২৪ খাপ উঠিবার পর তৃতীয় তলের বারান্দা । ইহাতে প্রকাণ্ড সহদেব তৎপরে নকুল ভীম অর্জুন ও ধর্মরাজের মূর্তি । বিপরীত

দিকে উদ্ভব, মাথায় ও কীদামানির মূর্তি । বর্ত্ত স্তম্ভের পর হইতে বারান্দা ক্রমে দুই হস্তমুখে দুই পার্শ্বে দুইটা প্রকোষ্ঠ জন্মিয়াছে । ইহাতে সুকৃতি-কেশযুক্ত চতুর্দশ মূর্তি বসিয়া আছে । আর একটা স্থানে কতকগুলি মূর্তি, কতক বসিয়া ও কতক লগ্নায়মান আছে । ইহারই নিকট তিনটা সিঁড়ি দিয়া একটা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে গেলে গৃহ মধ্যে সিংহাসনোপরি আত্ম সহ প্রকাণ্ডরাম উপবিষ্ট । সীতার মূর্তি অপরদিকে আছে । এই বিস্তৃত গৃহের পারিপাট্য অতি চমৎকার । কড়ির নিকট চিত্রের দাগ পাওয়া যায় । ত্রিতলের বারান্দার দৈর্ঘ্য ৭৩ হাত, গভীরতা প্রকোষ্ঠ সহ ৪৪ হাত, প্রকোষ্ঠ গভীরতা ১১ হাত ও উচ্চতা ৮ হাত ।

অনন্তর ভরত শঙ্কর গৃহ । ইহার দুই তলা বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্টাংশ ভগ্নপ্রস্তরে পূরিত । নিম্নতলের দৈর্ঘ্য ৬৮ হাত, গভীরতা ১৬ হাত ও বারান্দার বিস্তার ৫ হাত । ১৬ খাপ দিয়া উপরে উঠিলে এক প্রকোষ্ঠ সম্বন্ধি বারান্দা । ইহার দৈর্ঘ্য ৬৮ হাত, গভীরতা ২৯ হাত ও উচ্চতা ৩ হাত ।

বিম্বকর্মা গৃহ । ইহার প্রবেশ দ্বার রাজবাটীর প্রবেশদ্বারের দ্বার অতি শোভাকর । প্রথমে সারি সারি স্তম্ভযুক্ত এক বিস্তীর্ণ বারান্দা দেখা যায় । উহার উপরিভাগে কার্ণিস স্থানে হস্তী পৃষ্ঠে, অশ্ব পৃষ্ঠে, নানা খোদিত মূর্তি । তাহার উপর কয়েকটা বিটকাটা । তাহার উপর শোভমান নানাচিত্রযুক্ত ত্রিকোণাকার দ্বারমণ্ডক, দ্বারমণ্ডকের মধ্যেভাগ নওপঞ্চ-খানার জন্ত খোদা হইতেছিল । মণ্ডকের দুই পার্শ্বে খোদকারীপুং ও মূর্তি সম্বায়ুক্ত দুইটা প্রকাণ্ড মন্দিরের অগ্রভাগ সংস্থাপিত । বারান্দার মধ্যস্থ দ্বার দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম । বিম্বকর্মার মন্দির এক বিস্তীর্ণ গৃহ, ইহার দক্ষিণ ও বামে দুই স্তম্ভশ্রেণীদ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । উপরিভাগ খিলান করার দ্বার কাটা, কার্ণিসের নিকটে সারি সারি মূর্তি উপবিষ্ট । গৃহের স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যভাগে প্রকোষ্ঠ । প্রকোষ্ঠ মধ্যে বিম্বকর্মা বৃদ্ধ অঙ্কুরি বসিয়া বসিয়া আছে । বিম্বকর্মার দুইপার্শ্বে মূর্ত্যবরের যন্ত্র অঙ্কুরি করিয়া দুই মূর্তি বর্ত্তমান । লোকে বলে বিম্বকর্মা হর-দ্বার দ্বািত্তে এই সকল গৃহা রামের জন্ম প্রস্তুত করিতেছিলেন । তাঁহার

কার্য শেষ হইতে না হইতে কুকুট ডাকাতে ভোর হইয়া গেল । তিনিও তাড়াতাড়ি রুম্ব অঞ্জুলি কাটিয়া ফেলিলেন । তাহাই ধরিয়া রক্ত খামাইতেছেন । ইধরেজেরা এই গুহার গাভীরা ও চমৎকারিতা দেখিয়া বলেন যে, এই প্রশস্ত স্থান মর্যোপাসনার মন্দিরের যোগ্য । এবং জগৎনির্ঘাতা ইধর যেন বিশ্বকর্মা রূপে বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়া আছেন । গুহাক্ষেত্র প্রত্যেক দিকে ৩২ হাত, ১৪ স্তম্ভযুক্ত বাহিরের বারান্দা ৯ হাত বিস্তৃত ও কড়ি পর্য্যন্ত ৭ হাত উচ্চ । দ্বার ৫ হাত উচ্চ ও ২।০ হাত প্রশস্ত । মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৫২ হাত বিস্তার ২৯ হাত ও খিলানের খাতমহ উচ্চতা ২৪ হাত, খাত তাগ করিয়া উচ্চতা ১০ হাত । এক এক পার্শ্বের ভিত্তি হইতে মধ্যস্থ স্তম্ভমালার অন্তর ৫ হাত । অর্দ্ধাবিশ্রুতি অর্দ্ধকোণ ও ২ চতুর্কোণ স্তম্ভের বেটন ৫ হাত । বেদীর উচ্চতা ১৬ হাত ।

পেরওয়ারা বা মেথরের গুহা । এই গুহা শেষ গুহা । ইহা জগন্নাথ সভা হইতে ১ মাইল দূর । নামের কারণে কেহ এ গুহার প্রবেশ করে না । এখান হইতে দূরের ইলুকনগর দেখিতে অতি সুন্দর । বোধ হয় এই গুহাতে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায় ।

ইলোরা গ্রামের এক মাইল দূরস্থিত এই সকল গুহা দর্শন করিয়া গোয়ানে দেওগাঁ হইয়া নাদগাঁও ফেসনে রেলগাড়ী প্রাপ্ত হইবে । ইলোরা দর্শনেচ্ছু বয়ের যাত্রিরা নাদগাঁ হইতে এই পথে ডাকগাড়ীতে ইলোরা ও আরাদাবাদ যায় । আরাদাবাদ পর্য্যন্ত জনপ্রতি ভাড়া দশটাকা ।

নাদগাঁ হইতে রেল ক্রমে সহযাটের দিকে দক্ষিণ পশ্চিমে গমন করিয়াছে । ডাইনদিকে পর্ব্বতোপরি চন্দহারির কেল্লা দেখা যায় । যাটের এই সকল শৃঙ্গ পূর্বে জালায়ুখী বা আয়েয় গিরি ছিল ।

নাদগাঁর পর কয়েক স্থান পার হইয়া মাসিকরোড । ফেসন হইতে মাসিক নগর উত্তর পশ্চিমে ৬ মাইল । নিকটেই চারিজনৈর বসিবার উপযুক্ত যাত্রীর ৭ মাইলগামী টোলা নামক আরও গাড়ী দৈনিক ২।০ টাকা ভাড়ার পাওয়া যায় । মাসিক নগর দেখিয়া কাশীর ভাব মনে হইল । বিস্তৃত অগভীর ও ধরজোতা গোদাবরী তটে আর অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ঘাট ও মন্দিরের শোভা । পুলিনদেশে কেহ স্থান করিতেছে,

কেহ জপ করিতেছে, কেহ প্রবাদি পরিষ্কার করিতেছে ও কেহ বা “ ত্রি-
মকং জটোদ্ধুতে গোতমজ্ঞানশিনিঃ, বলিয়া গোদাবরীর স্তব করিতেছে ।
উপরে কেহ মন্দিরে দাঁড়িতেছে, কেহ পূজা করিতেছে ও কেহ বা সৌর-
কিরণে সমুদ্ভাসিত বিপনি মধ্যে প্রবাদি কর করিতেছে । যৌবনোন্মত্তা
কামিনীকুলে নগর কম্পিত প্রায় । বিসপ্ হিবর আদি জননকারী কহিয়াছেন,
নারিকেল বর্ণা ভারত কামিনীরা শ্বেতবর্ণা ইউরোপীয় কামিনী অপেক্ষা
মনোরমা । এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে দশ হাজার
ব্রাহ্মণ । গোতমীর উত্তরতটস্থিত এই নগরে প্রবেশ করিয়া আমরা
পঞ্চবটীতে রত্ননাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । পঞ্চবটে পঞ্চবটী বিদ্যমান
এতদ্ভাতিত এখন আর কোন বন নাই । নাসিক হিন্দুদিগের মহাতীর্থ ।
এই স্থানে লক্ষ্মণ শূৰ্পনখার নাসিকা ছেদন করেন বলিয়া নাম নাসিক
হইয়াছে । এই স্থানে রাম সীতার জন্ম বিলাপ করিয়াছিলেন । এই
স্থানের বর্ণনে বাল্মীকী জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন । লোকে বলে এখান হইতে
বহুদূরে কিড়ি কালুতে যারীচ বগ হইয়াছিল । সত্য হউক বা মিথ্যা
হউক ঐ স্থানে ধাবমান হরিণের পদচিহ্ন প্রস্তরোপরি স্পষ্ট লক্ষিত হয় ।
যাহা হউক এখান হইতে ২০ মাইল দূরস্থিত গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান দর্শন
একান্ত প্রীতিপ্রদ । প্রতিজ্ঞাতা গোদাবরী অবলম্বন করিয়া ৮ মাইল
দূরে গঙ্গাপুরে একটী সুন্দর জলপ্রপাত ও নরটী মন্দির দেখা যায় । ৫
মাইল দূরে নদীতটে একটী ভগ্ন কেল্লা । ২০ মাইল দূরে উচ্চ পর্বতো-
পরি গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান জাঙ্কনাথ । স্থান অতি মনোরম ও সুক-
লভ্য কুঞ্জে শোভিত । শত শত লোক জাঙ্কনাথ মহাদেবের পূজা
করিতেছে । গোদাবরীর উৎকৃষ্টতম এই তীর্থে হরিবারের জায় স্বাদশ
বর্ষান্তে বিস্তর বাতী উপস্থিত হয় । গোতমের পাপনাশের জন্ম গঙ্গা
গোদাবরী হইয়া নাসিকাতে প্রবাহিত হইয়াছেন । নাসিকের ৫ মাইল
দক্ষিণ পশ্চিমে চতুর্ভুজ শতাকীর্তে শোভিত বুদ্ধদিগের পাণ্ডুলিনা নামক
সমৃদ্ধশ গুহা । নগরের ৮ মাইল উত্তর পূর্বে চামারলিনা গুহা । যোচার
জায় এক পর্বতোপরি কিরকুর কট করিয়া উঠিলে আর তিনশত প্রকাণ্ড
সিঁড়ির পর এই আশ্চর্য গুহা দেখা যায় । বাহা হউক নাসিকরোড ফৌসনে

গোদাবরী পার হইয়া ছায়াবান রাস্তা, উচ্চ পাহাড় ও হাল্কাকারী উপত্যকা শোভিত দৃশ্যকারণ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলাম।

অদনন্তর ইগটপুরা জৈসন। জব্বলপুর হইতে ৫৩১ মাইল ও নাসিক রোড হইতে ৩১ মাইল। সম্মুখে একাণ্ড ঘাট গিরিপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। শৃঙ্গের পশ্চাতে ভীষণ শৃঙ্গ সকল বহুদূর সন্মুখিত। বন, ঝোড়, জঙ্গল, মীরস, কর্কশ, উচ্চ ও প্রান্তরময় ভূমি। ধড়রে ব্রিটিশ কোশল! ইহার উপর দিয়া ট্রেন চলিবে। এনজিন হইতে বারবার ভাইসেল্ উঠিতে লাগিল। গার্ডগণ সতর্ক হইলেন। ড্রাম গিরিসঙ্কট উপস্থিত, গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ের কাকেকাক প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছু দূর প্রবেশ করিয়া কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, দক্ষিণে চূড়া, বামে চূড়া, সম্মুখে চূড়া, পশ্চাতে চূড়া, গহ্বর, দরীকন্দর ও শৃঙ্গ সমূহের মহাস্থ গভীর খাত, নদীগণের অস্কার শব্দ, গিরি পরম্পরায় সূর্যের মুখ সমাস্কন্ন, কোন স্থানে বিকটাকার শৃঙ্গছায়া, কোন স্থানে বা আলোকিত পর্বত পার্ব। এক একটা খাত এত ভয়ঙ্কর, এত গভীর যে দেখিলে হৃৎকম্প হয়। শৃঙ্গ সমূহের ঢাল পার্ব যেন তাহাতে ধমিয়া পড়িতেছে। এইরূপ খাতের উপরিভাগে ঐরূপ ঢাল অবলম্বন করিয়া পাকে পাকে পর্বতোপরি গাড়ী উঠিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে গগনভেদী শৃঙ্গ সমায়ুক্ত বিকটাকার পর্বত ভাগ বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই সকল শৃঙ্গ ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ হইয়াছে। দূর হইতে দেখিতে যেন পর্বত গাত্রে শৃঙ্গালের গহ্বর। কিছু নিকটে গেলে অতি প্রশস্ত গুহা। ঘোর অন্ধকারময় গুহার অভ্যন্তরে গাড়ী প্রবেশ করিয়া চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় খাত, পুনরায় গুহা, এইরূপে গুহার পর গুহা, খাতের পর খাত, ঢালের পর ঢাল, সেতুর পর সেতু দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে। দূরে কিছুই দৃষ্ট হয় না কেবল গগনভেদী শৃঙ্গ সকল যথেষ্ট উঠিয়া সমুদ্র তরঙ্গের স্তায় ক্রীড়া করিতে করিতে যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যের কোন দিকে দৈর্ঘ্য কোন দিকে বিস্তার, অত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিছুই বুঝিবার ঘো নাহি। এই সকল ভীষণ প্রদেশে রাবণের অমুচরগণ অবলীলাক্রমে পরিভ্রমণ করিত। ইহার উপর দিয়া যাইতে বোধ হয় রত্ননাথের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

যাহা হউক এইখানে কাছারা ভৈসনে পৌঁছাইলে সহশৈলের উপরিভাগ গমন শেষ হয় । যতীর খাতের নিম্নে রেল দেখিয়া বোধ হয় যে পাতাল-তলে কে রেল পাতিয়াছে । কিন্তু কে জানে যে অস্পন্দন পথে ঐরেল দিয়া গাড়ী চলিবে । কাছারা হইতে গাড়ী বন্দের দিকে ক্রমে অবতরণ করিতে থাকে । এই সময়ে সমুদ্রের দৃশ্য বড় সুন্দর । পর্বতের প্রদর্শন কানখে পরিপূর্ণ । চকুদিকে মেঘমালা লঘুমান । পলাশ, ভেলা, তাল, তমাল * ও উচ্চ শ্রেণীর বনভাগ আবৃত । পক্ষিগণ শাখায় বসিয়া গান করিতেছে । মধ্যে মধ্যে গুহা বিবরে জলপ্রপাতের প্রতিরব সমুখিত হইতেছে । পাদদেশে নিখরिণী সকল সঞ্চার করিতেছে । সুগমুখ ইতস্ততঃ ধাবমান । বস্ত্রপুষ্পের সৌন্দর্য চারিদিক আয়োদিত । কোন স্থানে বা তৃণাচ্ছাদিত পর্বত পৃষ্ঠের হরিত শোভা কোথাও বা লতাবৃত দরীমুখ । কোন স্থান বা রুহৎ রুহৎ উৎপলখণ্ডে মীলবর্ণ, কোন ভাগ নানাবিধ ধাতু-রাগে রঞ্জিত । কোথাও বা নিখরिণীর রমনীয় লীলা, কোথাও বা বারি-প্রবাহের কুলু কুলু ধনি । এই রূপে শোভমান গিরিদরী, বিভূষিত বিশাল পাদদেশ ও অতুলিত শৃঙ্গ সকল দর্শন করিতে করিতে আমরা সহশৈল পার হইয়া গেলাম । অনন্তর কলাণী জংসন । জব্বলপুর হইতে ৫০ মাইল । এখানকার পর্বতের উপর হইতে পশ্চিম সাগর দৃষ্টিগোচর হয় । দুই সহস্রবর্ষ পূর্বে গ্রীক ও ইজিপ্টের জাহাজ সকল বাণিজ্যার্থ কলাণীর বন্দরে আগমন করিত । কলাণী হইতে এক রেল বামে মালদ্রা-জের দিকে ও এক রেল ডাইম পার্শ্বে বঙ্গে গমন করিয়াছে । এখানকার দৃশ্য যক্ষমহে । কলাণীর পর কিছু দূর পরে সালসিট দ্বীপ । অদৃশ্য সেতু দ্বারা সাগর পার হইয়া গাড়ী বন উপবন ও পর্বত শোভিত স্থান অতিক্রম করিতে করিতে টানার উপস্থিত হইল । উপত্যকার স্থানেবরী নদীর পার্শ্বে পার্শ্বে কি সুন্দরই রেল চলিয়াছে । টানার বিস্তার পোর্তুগীজের বাস ছিল । এখনও তাহাদের বাটী ও গির্জাদি আছে । দ্বীপের মধ্যভাগে পর্বত মধ্যে বুদ্ধমূর্তি শোভিত গুহা ।

* এখন রেলওয়ে কোম্পানি অনেক দ্রব্য করিতেছে ।

টানা পার হইয়া ক্রমাগত নীচ সমতল ও উর্বরাভূমি । যাহা যাহা
বিবিধ আশ্রয়ন, বারিকেল ও তালের ঘটা । ভাল গাছ দেখিতে দেখিতে
গাড়ী কোলাহলপূর্ণ ভাইখালা ফেসমে অবশ্য করিল । চারিদিকে হোই
হাই শব্দ, ধূপ্ ধাপ্ মাল মামিতেছে । বড় বড় গুজরাটী পাগড়ীর ভিড়,
চুরটের হুগুগু ও পারসী গাড়োরানের চীৎকার শব্দ । এইরূপে আমরা
বঙ্গে বা মুম্বাই পহঁছিলাম । ভাইখালার পর মসজীদ ও তদনন্তর কেল্লার
উত্তরস্থ বড়ীবন্দর ফেসম । কেল্লা বঙ্গে দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে
অবস্থিত ছিল । বঙ্গে দ্বীপ দীর্ঘ ৮ মাইল ও প্রস্থ ৩ মাইল । এবং উত্তর পূর্ব
হইতে দক্ষিণ পশ্চিম পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া সংস্থিত আছে । এই দ্বীপের
অব্যবহিত দক্ষিণে ওল্ড ওমানছ নামে এক দ্বীপ ও তৎপরে কলাবা নামে
আর এক দ্বীপ আছে । বঙ্গের উত্তরে মলমিট দ্বীপ । এই দ্বীপসমূহ
পরস্পর বাঁধ ও সেতুদ্বারা সংযোজিত । বঙ্গে দ্বীপের পশ্চিমে মালদ্বার
ও পূর্বে চিলিপুল্লী নামে দুই দিকে দুই পর্য্যন্ত আছে । ইহার মধ্যস্থ ভূমি
নিতান্ত নিম্ন এবং কোন কোন স্থান এত নিম্ন যে বর্ষাকালে জলে প্রাণিত
হয় । এই সকল দ্বীপের পূর্বে ও তারাতর পশ্চিমে বঙ্গের রমণীয় বন্দর ।
প্রায় ৫০ বর্গ মাইল বিস্তীর্ণ, এই জলভাগের বক্ষস্থলে পর্য্যন্ত ভূমিত এলি-
কাটা কারাং ও দ্বিরবতী নামে দ্বীপত্রয় পরম শোভা বিস্তার করিয়াছে ।
যাহা ইউক কেল্লার স্থান বঙ্গে দ্বীপের প্রধান দৃশ্য । পূর্বে এই কেল্লা দুই
মাইল বিস্তৃত ও বিস্তর ক্ষুদ্র গৃহে জড়ীভূত ছিল । এখন কিয়ৎভাগ
পরিত্যক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছায়াদি নির্মাণ করাতে অতি শোভাশালী
হইয়াছে । ব্যাক্স বনিকদিগের বিপণি ও গবর্ণমেণ্ট গৃহাদি এই স্থানে
সংস্থাপিত । উত্তর পশ্চিমে সাগরকূলে এছপ্লানেডের শোভা । কিছু
দূর উত্তরে ব্যবসাদি পূরিত দেশীয় লোকের বিভাগ, বন্দর তীর আচ্ছন্ন
করিয়া আছে । ইহার কিছুদূর উত্তর পূর্বে মাজাগনে শি এণ্ড ও কোম্পা-
নির ক্ষিয়ার আপীস ও ডকইয়ার্ড । এখানে সাগরের যাত্রিরা আরোহণ ও
অবরোহণ করিতেছে ।

বঙ্গে নগরের সর্বত্র ইংরেজ ও দেশীয় লোকেরা সংমিশ্রিত হইয়া বাস
করে । মালদ্বার পাছাড় ও ভাইখালায় বিলাসী ইংরেজগণের বাস

স্থান । কেল্লার ৬ মাইল উত্তরে প্যারেল নামক স্থানে গবর্ণমেন্ট হাউস । কলিকাতার দ্বার বহু নগর গ্যাসের আলোতে আলোকিত এবং দুই ঘণ্টার পবনবিহারযুক্ত হইতে জল আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে । বহুর পথ-প্রদর্শন পত্রিকাত, আলোকিত ও বৃক্ষ ছায়ার অশীতল । এখানে মহারাজীয় অশেষ প্রজাপতি ভাষার অধিক ব্যবহার । বহু নগরে বিস্তার পারসী লোকের বাস । ইহারা পারস্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছে । পারসীরা দুর্বাণ্ড অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে । ইহাদের মৃত দেহের জন্ত বহু নগরে ৪৫ টী দখল অর্থাৎ চারিদিকে বাধান অতি গভীর কূপ আছে । বড়টার ঘের প্রায় ৫০ গজ হইবে । কূপের উপর মৃত দেহ রাখিয়া আসিলে উদ্ধাপনীতে তখন করে এবং উহার হাড় কূপে খসিয়া পড়িতে থাকে । মৃতের মুখে যে কটা দেওয়া হয়, যদি কুকুর অগ্রে গিয়া উহা খায় তবে পারসীদের মতে ঐ মৃতের নিশ্চয় স্বর্গ হইবে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে দৈবাৎ কঠাগত প্রাণ কোন ব্যক্তি বাচিয়া উঠিলে পারসীরা তাহাকে গৃহে না লইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে ।

বহু নগরে স্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্খল্য । এক টাকা ব্যয় করিলে ও মিষ্টান্নাদিতে উদর পূর্ণ হয় না । লুচি অতি দুলভ পদার্থ । কিন্তু এখানে বার মাল, আত্মপাওয়া ব্যয় এবং উহা অতি দুর্মিষ্ট । এখানে নানাবিধ ফল দেখা যায় । বহু নগরে সাড়ে ছয় লক্ষ লোকের বাস, সহর প্রকাণ্ড বটে কিন্তু কলিকাতার তুল্য শোভা ও গাভীৰ্য্য নাই । কেবল বাণিজ্যের কোলাহলে ও বণিকদের গৃহে পূর্ণ । বহু নগরের অভ্যন্তরে প্রতিঘণ্টার দুই ঘোড়ার শিশ্রাম ভাড়া এগার আনা, এক ঘোড়ার কাব ভাড়া সাত আনা, বগী ভাড়া পাঁচ আনা ও গোবান ভাড়া তিন আনা । এতদ্ব্যতীত সহরেক মধ্য দিয়া ট্রামওয়ে চলিতেছে । বহু নগরে সচরাচর লোকে নিজ লিখিত স্থান দেখিয়া থাকে । একজন মেম্বরের সাহায্যে টাউনহল মধ্যে মৃত প্রাণীদেহ ও পুস্তকাগার, মিষ্ট মাষ্টারের অধ্যমতিক্রমে টাউনহল সরিষানে টাকশাল, ডক ও কাকটরি এহল্লানেন্ডের পাবলিক ওয়ার্ক টেলি-

* মুসলমান ভয়ে ইহার ৭৮৫ খৃঃ অব্দে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে ।

এক, সেক্রেটারিওফিস পোষ্ট অফিস ও ক্রফোর্ড বাজার, এলফিনষ্টন সারকেল উদ্ভান, সাহু মিকানিক ইনস্টিটিউট, প্রিন্সিপাল ও সারজনের অমৃতজিও এন্ড মেডিকেল কলেজ ও জামসেটজি হাঁসপাতাল, প্যারেল রাস্তার আলবার্ট মিউজিয়াম ও ডিটোরিয়া উদ্ভান, কারুলে হত ব্যক্তিদের স্বর্ণপাথ কলাবা গির্জা, সেক্রেটারীর অমৃতজিও চুনাবাগীতে ডেভিড সাহুনের ইস্কুল, নসীরওয়ানজী মানকজীর মূর্তিসহ টারডিও প্যারেল ও গিন্নগাঁওর স্তম্ভ কল, ধোবিতলা ও মধ্যে ক্রামজি কাওরাসজি ইনস্টিটিউট ভোলেম্বরের পিঞ্জরা পৌল, এছলানেডে মহারাজীর মূর্তি এবং গ্রাউরোডে নর্থক্রক উদ্ভান । এলিফেণ্টা বা গোরাপুরী দ্বীপ বয়ে হইতে ৬ মাইল । মাজাগন পাইর হইতে স্রবাতাসে ২ ঘণ্টায় পহুছান যায় । বন্দর বোটে ৪।৫ ঘণ্টা বিলম্ব হয় । ষ্টিমার ও আপলো বন্দরের জলীবোট সুবিধাকর । এলিফেণ্টা যাইতে ১ অক্টোবর হইতে ৩১ মে পর্য্যন্ত স্রবাতাসে ১৩ জন আরোহীর যোগ্য নৌকাভাড়া ছয় টাকা ও ১ জুন হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কুবাতাসে ভাড়া আট টাকা । সাত জনের যোগ্য নৌকাভাড়া স্রবাতাসে ৩ টাকা ও কুবাতাসে ৫ টাকা । ডিঙ্গিভাড়া প্রতিদিন স্রবাতাসে ২ টাকা ও কুবাতাসে ৩ টাকা । টনিতে অর্ধেক । ৫ জনের যোগ্য জলীবোটে স্রবাতাসে ২ ঘণ্টার ভাড়া বার আনা, ততোধিক সময়ে ঘণ্টা প্রতি তিন আনা । কুবাতাসে দুই ঘণ্টায় এক টাকা, ততোধিক সময়ে ঘণ্টা প্রতি চারি আনা । যাহাউক এলিফেণ্টা দ্বীপে ব্লক শোভিত দুইটা লম্বা পাছাড় আছে তন্মধ্যে এক সক্রীণ উপত্যকা । ঘাট হইতে ২৫০ মাইল ডাইনমিকে একটা প্রকাণ্ড বিকটাকার হলুদ পাছাড় হইতে খুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে । ঘাট হইতে অর্ধমাইল দূরে এই দ্বীপস্থ বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত আছে । প্রবেশমুখে প্রস্তর সিঁড়ি আরম্ভ । দরজার দুই-ধারে দুই প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও দুই ভিত্তিলম্ব স্তম্ভ । মন্দির অতি প্রশস্ত ১৩৩ ফীট লম্বা ১৩০।০ ফীট প্রশস্ত ও ৭০ ফীট উচ্চ । মন্দিরে নানারূপে খোদিত মন্তকবিশিষ্ট অতি দীর্ঘাকার স্তম্ভরাজির উপর ছাদ বিস্ত্রমান । এই সমস্ত গুলি পাছাড় কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে । মন্দির মধ্যে ত্রি-

মস্তক মূর্তি কোটীদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত। নানাস্থানে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি খোদিত হইয়াছে।

বম্বে হইতেও বেসিন দেখিতে যাওয়া প্রীতিপ্রদ। টানা হইতে বেসিন পর্য্যন্ত মন্দির দিয়া যাইবার কালে তীরের শোভা দেখিয়া অটলগের ক্রাইড করিবার বর্ণন মনে পড়ে। পোর্তুগীজেরা ১৫৩১ অব্দে এই নগর স্থাপন করিয়াছিল। ইহার চারিদিক গড়বদ্ধ। ১৭৫৫ অব্দে মহারাজারাজা এই স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখন বেসিন পরিভ্রম্য ভূমি। মাতটা প্রকাণ্ড গিরজা ও কতকগুলি ভগ্নাবশেষে ইতস্ততঃ দেখা যায়। লতাজাল বেষ্টিত সেণ্টপল ও সেণ্ট ক্রিস্টিস এই দুইটি গিরজা সর্বোৎকৃষ্ট।

বম্বে হইতে ষ্টিমার যোগে উত্তর পশ্চিম মুখে লোকে সোমনাথ ও স্বাক্ষর গমন করে। জুনাগড়ের অন্তর্ভূত সোমনাথ বা প্রভাসক্ষেত্র এখন অহল্যাবাই নির্মিত মন্দির ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সোমনাথ আছেন। ১০২৫ অব্দে মহম্মদ গজনবী যে প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করেন তাহা এখন পড়িয়া আছে। ঐ মন্দিরে রত্নজড়িত ৫৬ স্তম্ভ, স্বর্ণনির্মিত দীপদান স্বর্ণশৃঙ্খল ও স্বর্নবিধ রত্নপ্রভৃতি দশ কোটি টাকার প্রব্য ছিল। (১) সোমনাথের আদূরে সেই মাঠ রহিয়াছে, যে স্থানে যাদবগণ মুসলযুগে প্রাণত্যাগ করিয়া ছিলেন। সরস্বতী তীরে যেখানে অশ্বখ গাছ দেখা যায়, লোকে বলে যে ঐ স্থানে ভগবান ত্রিকূট অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। সোমনাথের ৪০ মাইল উত্তরে গিরনার বা টৈবতাচল পর্বত। তথায় হিন্দু ও জৈনেরা ভীর্ণ করিয়া থাকে। সোমনাথ বা প্রভাসক্ষেত্র হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। এই ক্ষেত্রের উত্তরে রবি পুত্রী, দক্ষিণে সাগর, পূর্বে কল্লিনী ও পশ্চিমে তপ্ত তোরণ। ইহার গর্তগৃহ গব্যুতিমাত্র, কেন্দ্রীশীট পঞ্চ যোজন ও প্রথম কেন্দ্র দ্বাদশ যোজন। বাড়বানল সংযুক্ত অগ্নিতীর্থ, পদ্মক, সমুদ্র, কপর্দি, সোম-

(১) কেন্দ্রস্তার ইতিহাস অনুসারে ইংরেজি ইতিহাসে প্রকাশ আছে যে, মহম্মদ সোমনাথের প্রকাণ্ড নরাকৃতি মূর্তি ভগ্ন করেন। কিন্তু পুরাণে প্রকাণ্ড মূর্তির উল্লেখ নাই। সোমনাথ কুকুটাও সম জ্যোতির্নির্দ ছিলেন। “কুকুটাওকমানঃ তৎভূমি মধ্যে বাবস্থিতঃ”, ইতি স্বাক্ষে প্রভাসথও।

নাথ আদি প্রভাসের প্রধান স্থান। এই স্থানে সরস্বতী সাগর সঙ্গম ও সরস্বতী হরণ। কপলাসঙ্গম।

সোমনাথ দেখিয়া ভিন্মরে হারকা গমন করিবে। হারকার পাঁচটা প্রধান মন্দির আছে। যুদ্ধকালের গোঁলায় স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ মন্দির মধ্যে রণছোড়জীর ১৪০ ফুট উচ্চ জগৎখুঁট নামক মন্দির সর্ব প্রধান। কিছু বর্তমান নবযুক্তি আর ১৫০ বর্ষ হইল স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের দৌরায়ে পাণ্ডারা পূর্বযুক্তি লইয়া প্রথমে ভজোঁচের সন্ধি-
স্থানে বোফা বন্দরে লুকাইয়া রাখে। তাহার পর সমুদ্রস্থ শঙ্কু দ্বার দ্বীপে লইয়া যায়। হারকার গোমতীর সহিত সাগর সঙ্গম হইয়াছে। হারকার বারীগণ এখান হইতে ১৮ মাইল দূরে রামতাড়া নামক স্থানে শঙ্কু চক্রাদি উত্তপ্ত করিয়া গাত্রে চিহ্ন লয়। এই স্থানের এক পুষ্করিণী হইতে লোকে গোপীচন্দন নামক তিলকমৃত্তিকা গ্রহণ করে। হারকার গোমতী, চক্রতীর্থ, সাগর গোমতী সঙ্গম, মণ্ডকুণ্ড, নৃগকুণ্ড, গঙ্গা ও গোপ্রচারদি তীর্থ প্রধান। এখানে হারপাল ক্ষেত্রপাল ও যোগিহাদি বিস্তর আছে। উগ্রসেন, অর্জুন, দেবকী, রুক্মিণী, উজ্জব, সত্যভামা, জামদগ্ন্য আদি বিস্তর তীর্থসহ হার-
কার অধিকাংশ ভাগ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে। হারকা হইতে অনেকে কচ্ছ দেবোত্তম দেখিতে যায়। কচ্ছ এক বিস্তীর্ণ লবণ ক্ষেত্র। কোথাও বিল, কোথাও বিল, কোথাও জলা, কোথাও তৃণরিত ক্ষেত্র ও কোথাও লবণের ময়দান ধক ধক করিতেছে। তৃণ সকল আন্দোলিত হইলে দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ময়ূষ্যের চক্ষে লবণের উপর কখন কখন উৎকৃষ্ট হর্ষা, কখন বা মৈত্ৰাদল, কখন বা যুদ্ধ আদি মানারূপ অদ্রুত দর্শন নগ্ন গোচর হয়। লোকে ইহাকে গুরু নগর কহিয়া থাকে। কিছুদিন হইল ভয়ানক ভূমিকম্পে এই বিভাগের আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটয়াছে। কচ্ছ ও রণে আরণ্য গর্দভ বিচরণ করে। উৎকৃষ্ট আরব দেশীয় অশ্বও ইহার তুল্য বেগশালী নহে, কিন্তু পোষ মানে না। বেদব্যাগ কুকক্ষেত্র সমরে সিদ্ধ দেশীয় ঘোড়ক ও গর্দভের প্রশংসা করিয়াছেন। অীক্কেয় রথের অশ্ব তাঁদের দেশীয় ছিল।

উত্তর মুখে রেল পথে গুজরাট দর্শন ইচ্ছা হইলে বম্বে দ্বীপস্থ গ্রাণ্ট রোডে

আরোহণ করিবে । ঐন্টারোড হইতে সাগরের তীরে তীরে রেল বাহিম পর্য্যন্ত চলিয়াছে । বাহিমের সমীপবর্তী হইলে আরব সাগরের বিশাল বক্ষ-
 ছলনরননমোচন হইবে । বাঁধও ৬০ ফীট অন্তর ৩ খণ্ড সেতুতে বাহিম প্রাণালী
 পার হইয়া আমরা সলসিট বীশে উপনীত হইলাম । সলসিটের পশ্চিম পার্শ্ব
 দিয়া পশ্চিম সাগর দেখিতে দেখিতে বাহিন প্রাণালীতে উপস্থিত । বাহিনে
 সাগর জলের গভীরতা ১৬ ফীট এবং তাহার অভ্যন্তর ভাগ বায়ুকাপূর্ণ ।
 জোরায়ের কালেই তথায় কিঞ্চিৎ জ্যোত বহিয়া থাকে । ৬০ ফীট অন্তর ২০
 খণ্ডযুক্ত, প্রথম ৬৬ খণ্ডযুক্ত, দ্বিতীয় ২৩ খণ্ডযুক্ত, তৃতীয়ও ২০ খণ্ডযুক্ত,
 চতুর্থ সেতু পরস্পর বাঁধ দ্বারা সংযোজিত হওয়াতে আমরা দেড় মাইল
 বিস্তৃত এই সাগর ভাগ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিলাম । পশ্চিম বা
 আরব সাগরের তীর দিয়া গমন করিতে গাড়ী অসংখ্য সেতু পার হইতে
 লাগিল । বাহিন হইতে তাপীতীরপর্য্যন্ত এই সমস্ত সেতু একত্রিত করিলে
 প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত হইবে । এই সকল সেতুর মধ্যে দামায়নের ১৫ সেতু,
 সনজাদের ৯ সেতু, অম্বকা ও আধীনার ১৪ সেতু, পূর্ণার ১৩ সেতু ও মণ্ডলার
 সেতু ১২ খণ্ড বিশিষ্ট । এই সকল সেতু পার হইয়া সোঁরাষ্ট্র বা সুরট নগরে
 উপস্থিত হইলাম । সুরটের তিনদিকে প্রাচীর ও একদিকে তাপী প্রবাহিত,
 তাপী তীরে ক্ষুদ্র কেল্লা । দুইশত বর্ষ পূর্বে তাপী সাগর সমুদ্র এই
 নগর বেষ্টন তুল্য বন্দর ছিল । এখন সাগরের মুখ বায়ুকাপূর্ণ হইতেছে ।
 সুরটের পূর্বের মত আর সে গাঁয়ব নাই, এখন কার্পাস বস্ত্রের পরিবর্তে
 বস্ত্র তুলার পূর্ণ । এখানে পশু পক্ষী কীটাদির প্রতিপালন জন্ত জৈন-
 দিগের একটা শিখরা পৌল আছে । পরসার লোভে হুংখিরা ছারপোকা
 পূর্ণ শয্যা শয়ন করিয়া তাহাদের উদর পূর্ণ করিতেছে । সুরটে দেখিবার
 মধ্যে প্রাচীন * ইংরেজ ও ওলন্দাজদিগের কবরস্থান, কেল্লা ও নুতন হাঁস-
 পাতাল প্রধান । গুজরাটী ভাষা হুকৌধ্য নহে, কেবল ইথি ব্রিথি প্রভৃতি

* ইংরেজেরা আহাঁরের সময় যে কাটা চাষা ব্যবহার করেন ১৬১১
 অব্দে করিয়েট ইহারই সেই কাটা ইংলণ্ডে চলিত করেন । ইহার কবর
 সুরটে আছে ।

কতকগুলি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ রাখিতে হয় । এখানকার ময়দার জিনিস অপকৃষ্ট এবং লবণহীন নাউ ও চুরমুরা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নহে । গুজরাটীরা বাঙ্গালীদের হত পাতলা কণী এবং তৎসহ ভাত তরকারি আচার, দধি ও খিরনির চাটনী এবং গাণপত্যভাদি খাইয়া থাকে ।

হুইট ফেসন হইতে বাহির হইয়াই নগর পার্শ্বে তাপী বা জাম্বী নদী । যদিও গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে লোক পার হয় তথাপিও এখানে তাপীর বিস্তার হই সহজ কীট এবং বর্ষাকালে এই নদী অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে । এমন কি সময়ে সময়ে এক রাত্রিতে ৩০ ফীট জল বৃদ্ধি হয় । এবং প্রবল বেগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়া তীব্র জোতের সহিত ভয়ানক তেজে আসিতে থাকে, এদিকে জোয়ারের সময় প্রবল সাগরবেগে প্রতিকূলে উপস্থিত । একদিকে সাগর বেগ অপরদিকে নদীর জোত ও ভাসমান বৃক্ষের ধাক্কা দেখিয়া রেলওয়ে কোম্পানি অতীব সাবধানে পুল নির্মাণ আরম্ভ করেন । ৩০ খণ্ডে ১৮৯১ ফীট বিস্তৃত এই সেতু নির্মাণ করিতে এক বর্ষে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হইয়াছে ।

তাপী পার হইয়া গাড়ী কিন ও আমা নদী অতিক্রম করত নর্থদাসহ সাগর সন্দের নিকট উপস্থিত হইল । জলের গভীরতার জোতের তীব্রতার বলুকার আধিক্যে ও বর্ষার উপক্রমে নর্থদা তাপী অপেক্ষা সর্বাংশে ভয়ঙ্কর । জোত এত তীব্র যে ঘণ্টার দশ মাইল চলে । জলের গভীরতা ৪০ ফীট, তন্মধ্যে ৪৫ ফীট বালুকা ভেদ করিয়াও মৃত্তিকা পাওয়া হুলুভ । ৬০ ফীট বিস্তৃত ৬০ খণ্ডে এগার লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুল করিলেও তাহা হুইবার ভয় হয় । ১৮৮১ খঃ অব্দে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর মধ্যে এক সোঁহমর হুইট পুল প্রস্তুত হইয়াছে, নর্থদার অপর পারেই ভর্ডোচ নগর । পুলের অবতি চুর ভুণ্ডতীর্থ ঘাট । ভার্গবজ হইতে ভর্ডোচ নাম হইয়াছে । লোকের জ্ঞান কালে “ নর্থদে পাণনির্কোদে ” বলিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছে । ঘাটে জোয়ারের জলে যথেষ্ট কাদা । গ্রীলোকেরা হাঁড়ার জার হুইটা কলসী উপযুপরি দস্তকে করিয়া হাত ছাড়িয়া, দয়া স্বাক্ষর নর্থদার উচ্চ তীরে আরোহণ করিতেছে । ভর্ডোচ নগর দেখিতে পল্লীর ভায় । পথপ্রান্তে অসংখ্য তাঁতী স্বত্র পরিকার করিতেছে । নর্থদার তীরভাগ পতিত ভিটায়

পূর্ণ। এই সহস্র বর্ষ পূর্বে ভর্ডোচ নগর, বঙ্গের স্থায় পশ্চিম ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। ইহাই প্রাচীন রোমানদিগের বিখ্যাত বাইরগাজা বন্দর। রোমান ও গ্রীকেরা এই নগরে কাঁচ, মদিরা ও স্বদেশীয় সুত্তী কক্সা আনিয়া বিক্রয় করিত। ভর্ডোচ হইতে ১২ মাইল দূর জগদ্বিখ্যাত কবীর বট। ইহার তুল্য প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ পৃথিবীতে আর নাই। ঘের চৌদ্দশত হতি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নামান বা শাখা নির্গত কাণ্ড সংখ্যা তিনসহস্র। এত স্থান আশ্চর্য্যদিত যে নিম্নে ৭ হাজার লোক স্বস্বক্ষেত্রে থাকিতে পারে। বটতল হইতে সাড়ে-সাত-কোশ দূরে অকীক প্রান্তরের ধনি। কাষের বাজারে এই সকল রত্ন বিক্রীত হয়। ভর্ডোচেও জৈনদিগের একটি পিঞ্জ-রাশোল আছে।

ভর্ডোচ হইতে রেল সাগরতীর ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভারতের অভ্যন্তর-গামী হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক তিনশ ও বিশষ্ট সেতুতে তিন নদী পার হইয়া গাইকবাড়ের রাজধানী বড়োদা নগরে পহুছিলাম। যেমন মক-রাজ্যের নাম মকবার বা মাড়োরার, কাটি রাজ্যের নাম কাটিবার বা কাটি-রোয়ার, সেইরূপ বর্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ মহারাষ্ট্রপতির গাই চরাইতেন বলিয়া রাজ্যের নাম গাইকরার বা গাইকোয়াড় অর্থাৎ গৌরব-কের রাজ্য হইয়াছে। ইন্দোরের রাজার আদি পুরুষ মলহার রাও, ছোল-কার মহারাষ্ট্রপতির য়েবপালক ছিলেন। এখনও এক দিবসে রাজা চাস করিতে বান এবং রানী খাজ মন্তকে করিয়া পূর্ব বিবরণ শ্রবণ করেন। গৌরালিরের মহারাজার পূর্ব পুরুষ মহারাজীর রাজবংশের একজন নাপিত ছিলেন ও জুতা বন্ধ করিতেন। ইহারাই রাজা অধিকার করিয়া এক এক রাজবংশের সংস্থাপক হইয়াছে। যেমন অশ্বখ গাছে ধারো লতা জড়িয়া গাছকে নিস্তেজ করিয়া নিজে প্রবল হয়, সেইরূপ ইহার প্রবল হইয়া শিবা-জির সাতরার বংশ নিস্তেজ করিলেন। গাইকবাড়ের আয় ৭০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যের অধিকাংশ ভাগ পতনি বিলির স্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার হস্তগত আছে। গবর্ণমেণ্ট রাজ্যকে আদায় করিতে না দিয়া নিজে আদায় করিয়া রাজার অংশ ফেলিয়া দেন। বাহা ইউক বড়োদা নগর খুলার আকীর্ণ। সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা শিগ্রাম নামক গোষানে গমনাগমন করি-

তেছে । গুজরাটের গরু অতি বৃহৎ এবং অভ্যস্ত মবল । ঘোড়ার অসাধ্য উচ্চ স্থানে অনায়াসে গাড়ী টানিয়া তুলিতে পারে । এখানকার গভীর কূপ সকলই লোকের প্রধান অবলম্বন । সহরের নিম্নে সাধারণ খালের জায় বিশ্বামিত্র নদী প্রবাহিত হইতেছে । নদীর উপর প্রস্তরের পুল । বড়োদা দেগিতে যত্ন নহে কিন্তু অধিকাংশই কাঠের গৃহ । প্রাচীন বাণী ত্যাগ করিয়া মলহর রাও যে হুয়াদী প্রস্তর করিতেছিলেন, পদচ্যুত হওয়াতে সেটী সম্পূর্ণরূপে সমাধা হয় নাই । ইহার নিম্নতল মৃত্তিকার অভ্যস্তরে খোদিত । বড়োদার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম হইতে মুক্ত পাইবার আশায় রাজা এইরূপ করিতেছিলেন । দেবমন্দিরগুলির বন্দোবস্ত উত্তম বটে, কিন্তু নির্মাণ প্রথা উৎকৃষ্ট নহে । বয়ে প্রেসিডেন্সিতে ইট প্রস্তরের উপযুক্ত মৃত্তিকা প্রায়ই পাওয়া যায় না । এমন কি রেলওয়ে কোম্পানি পর্যন্ত ইটের অভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন । এই সকল কারণ বশতঃ কাঠ ও প্রস্তর দ্বারা লোকে গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে । কাঠের ভাগ বহুল হইলে তাহার উপর রং দিয়া চিত্র বিচিত্র করে । দশ অবতার, জীকৃষ্ণের লীলা, কাহা দেওয়া দুর্গা, রাম ও হনুমানের কাণ্ড, শিবদুর্গা এই সকলই অধিক চিত্রিত থাকে । মূলমানের উপগ্রহ কম এবং নির্মাণোপযোগী দ্রব্যের অধিষ্ঠিত জম্ম দক্ষিণাত্যের মধ্যে দ্রাবিড় দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির সকল নগর গোচর হয় । দক্ষিণ ভারতে জীকৃষ্ণের রাগিকাসহ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায়ুক্ত বৃন্দাবন রূপ বড় দেখা যায় না । কলিগী হরণকালে রণ ছাড়িয়া যান এজম্ব কলিগী সহ দ্বারকার রণছোড়জীর ভাবই অধিক । বড়োদায় জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোক অধিক, মিঠারের মধ্যে বরফি বা কালাকন্দ প্রধান । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ছানার সন্দেশ অশুদ্ধ মালিয়া হুণা করে, অথচ বদরিকাশ্রমের মেলায় হিমালয়ে সমস্তই ক্ষীরের পরিবর্তে ছানার সন্দেশ এবং দক্ষিণাত্যে ছানা খাইতে লোকের আপত্তি দেখিলাম না । বাহা হউক প্রাচীর ও গেট সমন্বিত এই নগর দেখিয়া আমরা রেনিডেন্সিতে গমন করিলাম । রেনিডেন্সির হুয়াদী অপেক্ষ । বিশ্বামিত্র নদীর উপস্থিতি স্থানের নিকট যথাক্রমে স্বর্গলোক অর্থাৎ হইয়াছিলেন, এজম্ব উহা যথাক্রমে পতন স্থান নামে প্রসিদ্ধ । এই স্থানের নিকট বৈষ্ণব পর্বত ।

বড়োদা নদীতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইয়া রেল কাষে বা খাষাত খাড়ীর মস্তক বেঁটেন করিয়া। সসীতীরে উপস্থিত হইয়াছে। তাণীর তুল্য ৬০ ফীট প্রস্থের ২০ গজের মস্তক নির্মিত। স্তম্ভ নদী নিম্নে ৩২ ফীট প্রোথিত আছে। নদীসাগরমধ্য বিশেষ তীর্থ বলিয়া পরিচিত। পূর্বে এই স্থান একটী প্রধান বন্দর ছিল। সাগরের জল ১৪০ মাইল অপসৃত হওয়ার ইহার আর সে গৌরব নাই। যাহা হউক নদী পার হইয়া কয়েক সেতু পরেই শান্তনুসতী নদী। এই নদীর তীরে কেশরহীন ভয়ঙ্কর সিংহ সকল বিচরণ করে। আমরা ইহার তীরস্থ আহমদাবাদ নগর পহুছিলাম। এখানে দেখিবার মধ্যে আহমদশাহ জামাৎসজীদ, সুজাতখান মসজীদ, গজদত্ত মসজীদ, কোকরিয়া সরোবর ও সাহাবাগ প্রধান। আহমদ শাহ জামাৎসজীদ অতি প্রকাণ্ড। সুজাতখান মসজীদ নানাবিধ পারিপাট্যে ভূষিত। কিন্তু গজদত্ত মসজীদ দেখিতে অতি সুন্দর। খেত-মার্কেলের আভাধক ধক করিতেছে, তছপরি স্থানে স্থানে গজদত্তের পাড় দেওয়া এবং গায়ে তাজের দ্বার রত্ন জড়িত হইয়া পুষ্পের প্রতিকল্প নির্মিত হইয়াছে। এই সকল পুষ্পের পত্র শুষ্ক ও রৌপ্য মণ্ডিত। কোকরিয়া সরোবরের পরিধির দ্বার ১ মাইল বিস্তৃত চতুর্দিক এস্তর সোপানে আচ্ছাদিত। বহাঙ্কলে সুরম্য চর্যা শোভিত একটী দ্বীপ। নগরের এককোশ দূরে শান্তনুসতী নদীতীরে রাজকীর উজ্জ্বল সাহাবাগ। চতুর্দশ শতাব্দীতে আহমদ শাহ এই নগর নির্মাণ করেন। এককালে ইহা গুজরাটের রাজধানী ছিল। এখন ভয়াবশেষে পূর্ব। পূর্বে এখানকার রেশমীবস্ত্র কার্পাসবস্ত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার, শুক্লনির্মিত জবা, কাগজ, কাঠের কার্য ও চিত্র কার্য প্রসিদ্ধ ছিল। গুজরাটের গুরুত্ব জাতি অপেক্ষা জীজাত্তিসম্বল ও সুজী। গুজরাটে ৮৪ প্রবীণ ব্রাহ্মণ আছে। গুজর বাসী হিন্দুরা তিস্তির জল পান করে। জল ঢালিবার সময় কলস স্পর্শ করিলে দোষ কিছু কলসের সুখাররণ কাষ্ঠিকা দ্বারা খুলিয়া নইলে দোষ নাই। কেহ কালআসে পতিত হইলে কাঁদিবার জন্ত জাক্রা করিয়া জীলোক আনে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে বিশেষতঃ বণিক জাতি মধ্যে ধনী বিশেষে পাঁচ সাত টাকার উপযুক্ত কাঁদাইয়া থাকে। কাঁদিবার সময় জীলোকেরা আলুলারিত কেশে

বুকে কাপড় বাঁধিয়া শির বুক ও হাঁটুতে আঘাত দ্বারা তাল দিয়া হার হার, হার হার, হার শব্দ শীঘ্র শীঘ্র উচ্চারণ করিয়া নানা সুরে কানিতে থাকে । ভর্তিনি যজ্ঞমানের বাটী আসিয়া দক্ষিণা অনুসারে নানা হাঁদে কানান ।

আহামদাবাদ হইতে রেল রাজপুতানার আবু পাহাড়ের মধ্য দিয়া অবশেষে আজমীরে গিয়া মিলিয়াছে । শিরোহিরাজ্যস্থ আবু ঘাইতে হইলে পথে প্রধান স্থান পালহানপুর ফেসন পওয়া ঘাইবে । পালহানপুরের পর ক্ষেত্র সমতল ও বালুকাময় । আনাজ্রা হইতে ভূমি ক্রমে উচ্চ হইয়া শেষে ৪ মাইল মধ্যে পর্বত ২৫০০ ফীট উচ্চ হইয়াছে । দিলওয়ারা নামক স্থানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত জৈনদিগের বিখ্যাত বিমলামা ও তেজপাল বংশপালজীর মন্দির দেখা যায় । মার্কেল শোভায় শোভিত ও বিবিধ খোদকারীতে পরিপূর্ণ, এই মন্দির শিম্পনৈপুণ্যের জন্ত বিশেষ বিখ্যাত । শুনা যায় এই মন্দিরের এক এক তাক সওয়ালক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এবং সর্বশুদ্ধ ইহাতে এক কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, এত প্রম ও ব্যয় বাহুল্যে মন্দির জগতে দুর্লভ । আবুজীর পাহাড়ের বেড় প্রায় ৫০ মাইল এবং সাগর হইতে উচ্চতা প্রায় ৪৫০০ ফীট । অর্বলী হইতে বিচ্ছিন্ন, এই পর্বতের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যপ্রদ । এজন্ত ইংরেজেরা এখানে বিস্তর আবাসস্থান নির্মাণ করিয়াছেন, এখানকার নাখীতলাও অত্যন্ত সুন্দর । আবুজী হিন্দুদিগের প্রাচীন অর্বুদাচল তীর্থ । এখনও অচলেশ্বর মহাদেব আছেন । অর্বুদাচল পৃথিবীর ছিঁড় ছিল । এই স্থানে মুর্কুণ্ডের লিঙ্গলিঙ্গ পতন স্থান হাটকেশ্বর মহাত্মা বর্ণন করেন । আনর্ত দেশস্থ হাটকেশ্বর মিকট চমৎকার পুর সংস্থিত ছিল ।

বসে হইতে সেতুবন্ধ গমন ।

বসে আদি দেখিয়া পুনরায় কল্যাণীতে ফিরিয়া আদিতে হইবে । কল্যাণী হইতে দক্ষিণ পূর্বমুখে মহারাত্রী ও কর্ণাট পার হইয়া মাদ্রাজের দিকে রেল চলিয়াছে । মহারাত্রীর ভাষা সংস্কৃতজাত বলিয়া বুঝা যায় এবং তাহারও হিন্দীর ভাব গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু ইকড়ে পাণ্ডু প্রভৃতি

যে সকল তৈলঙ্গ ভাষার কথা মিশ্রিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে না। আমরা যেখানে বাঘ, বাঘকে, বাঘবারা, বাঘহইতে, বাঘের, বাঘেতে কহিয়া থাকি, তথায় মহারাজীর বাঘাস, বাঘানে, বাঘাস, বাঘান বাঘাচ ও বাঘাৎ কহিয়া থাকে। আমি তুমি তিনি প্রভৃতি স্থানে বর্তমান কালে হওরা ধাতুতে বী অসতো, তু অসতোস, তো অসতো, আমি অসতো, তুমী অসতা, তে অসতাত, অতীত কালে হোতো, হোতাস, হোতা, হোতো, হোতেত, হোতে, ভবিষ্যৎকালে আসেন, অসশীল, অসেল, অসু, অসাল, অস-তীল হয়। করা ধাতু মি করবিতো ইত্যাদি। এইরূপ সংস্কৃত জাত কথার উপর বিভক্তি প্রয়োগের লক্ষ্য রাখিলেই বুঝা চলে। মহারাজীর ব্রাহ্মণ নাম গৌরবর্ণ। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য থাকে এবং কাছা দেয়। ভোজের সময় স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করে। স্ত্রীলোকে কেশ অত্যন্ত টানিয়া বাঁধার জন্ত ঘাড়ের উপর টাক পড়ামত বোধ হয়। দক্ষিণতোর মধ্যে মহারাজীর উন্নতিশীল। মহারাজীর ভাষা মহারাজী ভাষা করিয়াও বক্তৃতা রাখা এবং আদরনীয়। বাছা হউক এক্ষণে আমরা কল্যাণীর পর উলু-সার ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে অসংখ্য সেতু পার হইয়া নারেল ফেননে পহঁ-ছিলাম। নারেলের নিকট সম্বলৈপরি সুদৃশ্য মাথিরন নগর। দুই ঘণ্টার ছয় বেহারায় যাইতে পাল্কী ভাড়া দেড় টাকা। সুপারিটেণ্টে সাহেবের সহিত অগ্রে বন্দোবস্ত করিতে হয়। মাথিরন নগর ১৬৪০ হাত উচ্চ। এই পর্বত বিবিধ লতাকুঞ্জে ও নানারূপে বিভূষিত। বহু পুষ্পের অগন্ধে বায়ু আমোদিত হইয়াছে। ভ্রমর সকল চতুর্দিকে সমাকীর্ণ রহি-য়াছে। বৃক্ষ সকল মস্তক উন্নত করিয়া গেন জলদগণকে স্পর্শ করিতেছে। পক্ষী বলরবে গিরিবর নিরন্তর শব্দিত হইতেছে। গায়বট পইণ্টে গমন করিলে সহের বিশাল পাদদেশ ও অতুলিত শৃঙ্গ সকল দর্শন করিয়া মন বিন্ময়রসে নিমগ্ন হয়। প্যানোরামা পইণ্টে গমন করিয়া সূর্যের অন্ত গমন এবং দ্বীপবিভূষিত তরঙ্গমালা সকল পশ্চিম সাগর অবলোকন করিলে আশ্চর্যের সীমা থাকে না। সৌধমালা বিভূষিত বহু নগর তাহার বহু-দূরী বিস্তীর্ণ সাগরতীর মালাবারহিল, মাজাগণ মাহিম জাহাজ ভূষিত বন্দর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ এক কালে নেত্রপথে পতিত হইয়া কি অপূর্ণ

শোভাই বিস্তার করে। পর্বতের যে দিকে যাও সেই দিকেই শোভা, যে স্থানে দণ্ডায়মান হও সেই স্থানেই প্রীতি। নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয়। সুপারিটেণ্ডেণ্টের নিকট একখানি নক্সা লইয়া হার্ট, পরকুপাইন টুইস, একো, লাগুস্কেপ, বটল, মস্কি, গ্রেট ও লিটল চোর্ক ও আলেকজাণ্ডা পইন্ট দর্শন করা অতীব সুখকর। পূর্ব পার্শ্বে আলেকজাণ্ডা ও ফ্রু চোর্ক মধ্যে সুন্দর নিকুঞ্জ বন। ইহার নাম আমরেরি বা রামবাগ।

অনন্তর নারেল পার হইয়া লানোলির দিকে গাড়ী গমন করিতে থাকে। পুনরায় সন্দের শৃঙ্গ পরস্পর। শীত শীত আসিয়া উপস্থিত হয়। পুনরায় সেই কাননপূর্ণ প্রসূদেশ, বিশাল প্রস্তর মণ্ডিত বিস্তৃত পাদদেশ, সাহু মধ্যে শঙ্কায়মান নির্ঝরিনী সকল, শৈবাল শোভিত শিখরদেশ, বহুপুষ্প অশোভিত শাখীনিচয় তৃণাদিতে সমাপ্ত রক্তশূভ্র ভূমি, রমনীয় দরীকন্দর ধাবমান যুগযুগ ও পক্ষী কলরবে পরিপূরিত বিবিধ স্থান নেত্রপথে পতিত হয়। পুনরায় ব্রিটিশগণের আশ্চর্য্য শিপি কোশল। কি কোশলেই পুনরায় রেল সন্দের ভোরঘাট পার হইয়াছে। নারেলের পর কুরজত হইতে প্রতি পঞ্চাশে এক ফীট উচ্চে গাড়ী উঠিতে লাগিল। অতি কষ্টে শোণগিরির পার্শ্ব দিয়া ৬৬, ১০২, ১২১, ২৯, ১৩৬, ১৪৩, গজ সুড়ঙ্গ দ্বারা ছয় শৃঙ্গ ভেদ করিয়া বিপরীত দিকে বাহির হইল। তাহার পর উত্তর পার্শ্ব দিয়া মৌকীমূলি শৃঙ্গে উঠিবার উদ্ভম করিতে লাগিল। এই দুই মাইল বাইতে ২৮৬, ২৯১, ২৮২, ৪৯, ১৪০, ৫০, ৪৩৭, ও ১০৫ গজ দীর্ঘ আট সুড়ঙ্গে ৮ শৃঙ্গ ভেদ ও পাঁচ সেতুতে শৃঙ্গমধ্যস্থ পাঁচ ভয়ঙ্কর খাত পার হইয়া উঠিবারাত্র সম্মুখে গাঘানানথ শৃঙ্গ দণ্ডায়মান। দুই সেতুতে গাঘানানথের দুই ভয়ঙ্কর কন্দর পার হইবা মাত্র এক ক্রোশ মধ্যে শৃঙ্গের উপর ক্রমাগত শৃঙ্গ। ৮১, ১৯৮, ৫৫, ৬৩, ১২৬, ৭৯, ৭১, ২৮০ ও ১২১ গজ গভীর ৯ সুড়ঙ্গে এই ৯ গিরি অতিক্রম করিয়া নাথকাডুঙ্গর নামে ভীষণ শৃঙ্গ প্রাপ্তে উপস্থিত। এখন বিঘন সঙ্কট। পথ প্রায় প্রতি সাঁইত্রিশে এক ফীট উচ্চ। ধর রে! বার্কলে কি কোশলেই পথ করিয়াছে। ভূজগের ঝায় গতিতে গাড়ী পাকে পাকে পর্বতোপরি উঠিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! ইহার উপরও আর এক শৃঙ্গ। ৩৪৬ গজ সুড়ঙ্গ দ্বারা গাড়ী ইহাও অতিক্রম করিল। তদ-

নন্দর খাণ্ডালার নিকট গিরিপৃষ্ঠ উন্নতর ঢাল ও নিম্নে গাড়ীর খাত । অশ্বে অশ্বে এই স্থান পার হইয়া গাড়ী সহের মর্কোচ্চ শিখরে উঠিয়া যেন দস্ত সহকারে হুইসেল দিতে লাগিল । আমরাও লানোলি ভেসেনে পুঁহুছিলাম । এইরূপে কুরুরত হইতে কখন উঠে, কখন নিম্নে, কখন সমে, কখন বিষমে, কখন ঢালে, কখন পুলে, কখন ডাইনে, কখন বামে, পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে, কি চমৎকারে শীর্ষে উঠিলাম, এই সকল পর্বত নিতান্ত কঠোর এবং এককালে আগ্নেয় পর্বত ছিল । যোর পরিভ্রম করিয়া রেলযে রূপ বক্র ভাবে পতিত হইয়াছে তাহাতে অনেক চক্রের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১৫ চেন হইবে । আবার গিরি পৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ উপলব্ধ পথে পতিত হওয়ার সম্ভব হওয়ার তাহাও পরিষ্কার করিতে বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে । লানোলির ৪ মাইল দূরে বিখ্যাত কারলির গুহা । আমরা নিকুঞ্জধনের মধ্য দিয়া একটী শিব মন্দিরের সমীপস্থ হইলাম । প্রায় ৮০০ হাত লম্বাভাবে উচ্চ এক প্রকাণ্ড গিরির দুই তৃতীয়াংশ ভাগ পরিষ্কৃত করিয়া ৫২ ফীট প্রশস্ত এক দরজা নির্মিত হইয়াছে । ঐ দরজার চারিস্তম্ভ, তন্মধ্যে দুই স্তম্ভ ভিত্তি গাত্রে সংলগ্ন । দ্বারের উপরিভাগ পর্দার আবৃত এবং তদুপরিস্থ খিলান অতি প্রকাণ্ড । পর্দার খোদিত উল্লঙ্গ স্ত্রী পুরুষের মূর্তি জীবিত মনুষ্য-পেঁকাও বৃহৎ । ভিত্তি গাত্র হইতে তিনটা হাতের মুখ বাহির হইয়াছে, তাহাদের আকারই বা কি প্রকাণ্ড ! অভ্যন্তরের মন্দির ১২৬ ফীট লম্বা ও ৪৫ ফীট প্রশস্ত । হাদের খিলান গোলাকার এবং তাহা ৪১ স্তম্ভে স্থর-ক্ষিত । ঐ স্তম্ভের মধ্যভাগ অতি প্রকাণ্ড, তদুপরি অষ্টকোণ স্তম্ভ, তদুপরি অতি উৎকৃষ্টরূপে খোদিত স্তম্ভ মস্তক, তদুপরি দুই প্রকাণ্ড হস্তী উপবিষ্ট । হস্তীর উপর এক মনুষ্য ও এক স্ত্রীলোকের মূর্তি । কোন কোনটাতে দুই স্ত্রীলোক আছে । এই গুলি এত সুন্দররূপে খোদিত যে ইহার তুল্য সুগঠিত গুহা ভারতে আর নাই । মন্দিরের দেবস্থানের মধ্যে লিঙ্গ-মূর্তি মন্দিরদেব, তদুপরি একটী ছিন্ন দিয়া সমস্ত আলোক পতিত হওয়ার অতি সুন্দর দেখাইতেছে । এই প্রধান মন্দির ব্যতীত পার্শ্বে অতি উৎকৃষ্টরূপে খোদিত আরও অনেক গৃহ আছে । ইংরেজেরা স্থির করিয়াছেন যে, এই গুহা প্রথম শকাব্দার সালিবাঁহনের সময় খোদিত হইয়াছে ।

কারলির ৫ মাইল দূরে ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের বাদজা ও ৯ মাইল দূরে বেদহা গুহা ।

যাহা হউক আমরা লানোলি হইতে ক্রমে অবতরণ করিতে লাগিলাম । অভ্যস্তরে সমুদ্র তরঙ্গের জায় ঘন সহশ্রঙ্গের ঢেউ খেলিয়াছে । চারিদিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃঙ্গ । আমরা পর্বত খাত ও উচ্চাবচ ভূমি পার হইতে হইতে ইষ্টানী ভীরে উপস্থিত হইলাম । ইষ্টানীর পার্শ্বে পার্শ্বে কিয়দুর গমন করিয়া পুনা নগরে পহুছিলাম । এই জেলায় বুদ্ধের ভাগ অতি কম । নগরের পার্শ্বে পর্বত । নিম্ন দিয়া মৃতানদী প্রবাহিত হইতেছে । এই সকল পর্বতে শিবাজি গোচারণ করিতেন । এবং এই নদীর জল পান ও এই মৃতিকার শস্য ভোজন করিয়াই মহারাজীর দেহ সেই দুর্জয় তেজ আবির্ভূত হইয়াছিল । এই না সেই নদী ! এই না সেই মাঠ ! তবে মহারাজীরগণ ইহার অন্ন কিরূপে এভাবে জীর্ণ করিতেছে । প্রজাবংশল ইংরেজদের এত যত্নেও কিরূপে এরূপ হইল ! অসংখ্য ব্রিটিশ সৈন্য মধ্যে মহারাজীর ভাগ এত অল্প কেন ? ঐ যে স্ত্রীলোকেরা জল আহরণ করিতেছে । হা বীর প্রসম্মানীগণ ! এখন কেন সম্মানদের এরূপ দশা ! যে পর্বতের গহ্বর জয়োল্লাসে প্রতিবিনিত হইত, আজ তাহাই আমার বিলাপস্বর প্রতিবিনিত করিতেছে । এই প্রস্তরফলকে কত শত তরবারি শাণিত হইয়া থাকিবে, আজ ইহার উপর কিরূপে পাছুকা সহ ভ্রমণ করিব । যে নগরের জয়চকায় গগণ বিক্ষারিত হইত, আজ সেই নগর বারাজনাপূর্ণ ও তাহাদের হাশ্বে ও ইজিতে কলুষিত দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম ! এ কি দেখিতেছি ! একি সত্য সত্যই সেই বীরদের জন্মভূমি ! যাহারা দিল্লীর দাক্ষ প্রতাপ অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়াছিল । অরে মহারাজীরগণ ! রাইগরে শিবজির মৃত দেহ ভক্ষসাৎ হইয়াছিল । তাহার কি একটা পরমাণুও এখন বর্তমান নাই ? আমরা নিতান্ত হুঃখের সহিত পুনরায় কাষ্ঠনির্মিত গৃহ সকল দেখিতে লাগিলাম । এখানে দেখিবার মধ্যে বাঁধ তৎসমিকটে কোম্পানির বাগান, কিরকিশাথে মোসারি কেল্লা, গণেশধাও গাৰ্গমেণ্ট হাউল ও পার্ক-তীর মন্দির এই কয়েকটি প্রধান । পুনার বিস্তর ইংরেজ সৈন্য বাস করে ।

এখানকার এক জাতীয় ডুম্বর বা আঁজির উৎকৃষ্ট। গ্রাম পাউন্ডর ও অনেক জ্বরের আরক পাওয়া যায়। পুনায় সংস্কৃত বিজ্ঞান বিলকণ আলোচনা আছে। নিকটবর্তী পর্বতে এক জাতীয় সোমলতা জন্মিয়া থাকে।

আমরা রেল ভ্রমণ করিয়া পুনা হইতে ৬৯ মাইল দূরে সাতারা যাত্রা করিলাম। পথে কাড়বাজঘাট ও সুড়ঙ্গ পার হইয়া সিরোয়াল নগর। তথ্য হইতে কামাঠকি ঘাট অতিক্রম করিলে কিছু দূর গুরে দেখা যায় যে, সে স্থলে পথ বিভক্ত হইয়া একটী সেতারা ও আর একটী বাইপাহারনি ঘাট ও পঞ্চগনি হইয়া মহাবলেস্বর পহঁছিয়াছে। এই বিভাগে সহ বা ঘাট পর্বতের শৃঙ্গ সকল অত্যন্ত উচ্চ। সাতারা নগর পর্বতসমূহের মধ্যস্থিত এক নিম্ন স্থলে অবস্থিত। তিনদিকে পাহাড় ও অপর দিকে ইনা, কৃষ্ণা, ও উরমুরি নদী। কেল্লা প্রায় ৮০০ ফীট উচ্চ পর্বতের উপর সংস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১১০০ গজ ও প্রস্থ ৫০০ গজ। এই নগর কিছুকাল মহারাজার দিগের রাজধানী ছিল। এখানে রাজাগণের কীর্ত্তিগুলি দেখিবার যোগ্য। দেবমন্দির অতি বিশাল ও শোভাশালী। সাতারা হইতে ৬ মাইল দূরে আমরা মহাবলেস্বর পর্বতে গমন করিলাম। বহুর গবর্ণর ও প্রধান কর্মচারীগণ প্রায়ই এই স্থানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের গৃহাদি সাগর হইতে ৪৫০০ ফীট উচ্চে পর্বতগাত্রে অবস্থিত। এখানে হুঙ্কের বড় কক্কে কিন্তু এখানকার গোলআলু ভারতের মধ্যে উৎকৃষ্ট। প্রতি মনের মূল্য দেড় টাকা। চুরট ও পাঁচকটীর হুগন্ধ ভ্রমণ করিয়া আমরা আমাদের তীর্থ কৃষ্ণার উৎপত্তিস্থান দর্শন করিতে গমন করিলাম। একাকী প্রভ্রবণের পার্শ্বে বসিয়া দেখরের চিন্তা করা পরম শ্রীতিকর। একটী প্রস্তর প্রাচীরের মধ্যে পাঁচটী ফুকর আছে তাহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণা, বেণা, কুহনা, গায়ত্রী, ও সাবিত্রী এই পাঁচ নদী বহির্গত হইতেছে। একদিকে ব্রহ্মগিরি ও তদন্বকিণে বেসগিরি, পশ্চাতে আমলকী বন। কিছু দূরে কৃষ্ণা ও বেণার সম্মিলন স্থান সংগামবেণীয়া তীর্থ। এই স্থানে গায়ত্রী জপে মহাফল। নিকটে কজতীর্থ ও ব্রহ্মতীর্থাদি। কৃষ্ণার উত্তরতটে সাগরপর্বাঙ্গ এক যোজন পুণ্যক্ষেত্র। কত স্থানে কত লোক স্নান ও

জ্ঞান করিতেছে। কেহ বা “সহপাদোদ্বা দেবি জীর্নশ্চে তুঙ্গগামিনি।
কৃষ্ণবেণীতি বিখ্যাতা সর্বপাপ প্রণাশিনি,”। বলিয়া স্নানমন্ত্র বলাই-
তেছে।

যাহা হউক পুন্য পার হইয়া রেল দক্ষিণ পূর্বমুখে মুন্সী নদীর ক্ষেত্র দিয়া
চলিতে লাগিল। কিয়ৎকণ পরে মুন্সী ও ভীমা সম্মে উপস্থিত। পার্শ্বে
পুণ্ডরপুর তীর্থ পড়িয়া রহিল। তথায় ভীমশ্বেদ সমুদ্ভূতা ভৈরবী ভগবত-
প্রিয়া বলিয়া লোকে স্নান করিতেছে। ইচ্ছা হইলে পথিক ভীমায় স্নান
ও এখানকার বিষ্ণুমন্দির দর্শন করিতে পারে। আমরা প্রত্যেক ৪০ ফীট
বিস্তৃত অষ্টাবিংশতিখণ্ডযুক্ত সেতুতে ভীমা পার হইলাম। ইহার
এক এক স্তম্ভ ৬০ ফীট উচ্চ তথ্যে প্রায় ৪৬ ফীট সময়ে সময়ে জলমগ্ন
হয়। তদনন্তর দ্বাদশ খিলানযুক্ত সেতুতে সিনা নদী পার হইয়া সোলা-
পুর প্রবেশ করিলাম। সহরের চারিদিকে প্রাচীর। কেল্লা সুদৃঢ় ও
ছাউনী রহৎ। ইহার অধিকাংশ ভাবই পুনার ভায়। সোলাপুরে
রেল ত্যাগ করিয়া ৫৮ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ বীজাপুর নগর। দিল্লীর ভায়
ইহার চারিদিকে ভয়ঙ্কর ভূগর্ভাংশে সকল পড়িয়া আছে। ভূগর্ভস্থাতেও
বীজাপুর গান্ধীরাশালী। মহম্মদের কবর, জমামসজীদ, ইব্রাহিমের মসজীদ
ও কবর, সভাগৃহ, আসমমুবারক, মেথরমহল ও মক্কা মসজীদ যথার্থই এক
এক অদ্ভুত দৃশ্য। মহম্মদ সাহের মকবরার গম্বুজের ব্যাস ১২৪ ফীট এবং
ইহার প্রতিধ্বনি অবিকল স্বরের প্রতিক্রিয়া। ইব্রাহিম আদিল সাহের
মসজীদে সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এবং ইহার মকবরা অর্থাৎ
কবর হুয্যো কোরান অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত আছে। বাজারের অবশি-
ষ্টাংশ এখনও তিন মাইল লম্বা ও ৫০ ফুট চোড়া। কেল্লার মধ্যস্থ মলি-
কুল মৈদান নামক পিতলের তোপের বুল্য রহৎ তোপ পৃথিবীতে আছে
কিনা সন্দেহ। ইহাতে তেত্রিশ মোগ তিন সের ওজনের গোলা চলিয়া
থাকে। এই নগরের ঘের প্রায় ৮ মাইল এবং ইহার ৭ দরজা। ১৪৮৯
খৃঃ অব্দ অবধি ২০০ বর্ষ এই নগর স্বাধীন রাজাদের রাজধানী ছিল।
পরে দিল্লীশ্বর আরংজেব বিমুক্ত করেন।

সোলাপুর হইতে রেল ভীমা ও এক পার্বত্য শ্রেণী এই উভয়ের মধ্য

দিয়া গুলবর্গী পর্য্যন্ত চলিয়াছে। পর্বত হইতে ভীমভে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পতিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রত্যেকে ৩০ ফীট বিস্তৃত পঞ্চদশ খিলানের বারি নদীর সেতু ও দ্বাদশ খিলানে বিভক্ত মুরিগি ছল নদীর সেতুই প্রধান। স্থানে স্থানে পর্বতের অংশ সকল নদীপর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় কোথাও কোথাও পথ প্রতি পথে ১ ফীট উচ্চ হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন শৃঙ্গ অতিক্রমই কর্তব্য।

গুলবর্গীর ২৪ মাইল পরে প্রত্যেকে ৬০ ফীট বিস্তৃত ২৪ খিলাসে কাজনী নদী পার হইয়া সাহাবাদ, তদনন্তর ওয়াডি জঙ্গলন। এই স্থান হইতে বামদিকে এক শাখা রেল নীরস, কর্কশ প্রান্তরময় ও উচ্চাচ ভূমি দিয়া নিজামের রাজধানী হাইদরাবাদে গিয়াছে। স্থানে স্থানে স্টেটের প্রান্তরের খনিও দেখা যায়। হাইদরাবাদ নগর জলশূন্য মুসা নদীতে অবস্থিত। নগরের চতুর্দিকের প্রাচীর ভাঙ্গা। রাজবাটী ও মন্ত্রী বাটীর সম্মুখে বাজার, দেখিলে অশ্রদ্ধা জন্মে। কিন্তু বাটীর অভ্যন্তরে একে একে দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রশস্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গন দেখা যায়। মন্ত্রীর বাটীর মধ্যে আরনাখানা দেখিবার যোগা। কিন্তু প্রায় সমস্তই কাঠ নির্মিত, এই সকল কাঠ রং করা ও স্থানে স্থানে গিল্পি করা। সহরের স্থানে স্থানে পাহাড়ের প্রান্তর সমূহ উন্নত হইয়াছে এবং কয়েক হস্ত মৃত্তিকা উৎখাত করিলেই জমাট প্রস্তর বাহির হইয়া পড়ে। এই সকল প্রস্তর বাকদ ঘরা ক্রমে ক্রমে কাটাওয়া অতি কষ্টে কূপ খাত হইয়াছে। তাহার জল অতি হুল'ভ। এখানে বেথিবার মধ্যে চারমিনারের বাজার, দসজীদ, ফৌজদার নিকটে বাগান ও কৃষ্ণ মন্দির, নিজামদিগের কবর স্থান ও কয়েকটা ষাঠারিক সরোবর বা তালাও প্রধান। ইংরেজেরা হাইদরাবাদের নরিকটে ভূরি টেন্ডা রাখিয়া রাজ্যের বক্ষশূল স্বরূপ বসিয়া আছেন। এখানকার মৃত্তিকা প্রস্তরের গুঁড়া মাত্র, তাহাই বিষ্ঠা ক্রয় করিয়া ও জল সেচন করিয়া কৃষিক্ষেত্র উর্বরা করে। জিনিসের মধ্যে লোহার তাওরা সেতারের তার, ও কলী প্রধান। সময়ে সময়ে অতি উৎকৃষ্ট আমের আমদানী হয়। পোঁয়ারফলি, রামকিজা, পিরাজ, বেথির শাক, কটিকারি কল অপেক্ষা কিছু বৃহৎ বেগুন, হায়দরাবাদের বাজারে আমরের

সহিত বিক্রীত হয়। গরুতে ময়ূষ্যের বিষ্ঠা ও মহিষে ঘোড়ার বিষ্ঠা খায়। অতএব দুষ্কের স্বাদের কথা আর কি কহিব। নগরের অধিকাংশ স্থানে হনুমান বা মহাবীরের মন্দির বা স্থান আছে। ব্রাহ্মণ বাতীত জাতিরাও নারিকেল ভাঙ্গিয়া ও কপূরে আঁগুণ দিয়া পূজা সমাপন করে। এখামে মাংস এবং নানাবিধ ফলের আরক লোকে প্রস্তুত করে এবং অনেক মৈদী নামক খজ্জুররক্ষজাত মদ্য পান করিয়া থাকে। এখানকার রেসিডেন্টের কুঠী অনেকাংশে গবর্ণমেন্ট হাউসের মত শোভাশালী। এদেশীয় পীড়া মধ্যে নাড়ু অর্থাৎ গিনিওয়ারমই অধিক। জলের দোষ ইহার মূল কারণ, এজন্ত উষ্ণজলে স্নান বিধেয়। হাইদ্রাবাদ রাজা গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। জায়গীর বাদে নিজামের আয় প্রায় তিন কোটি টাকা। নিজামের টাকা গবর্ণমেন্টের টাকা অপেক্ষা আড়াই আনা কম। রোপোর দর অল্পসারে ইহার ভ্রাস রুদ্ধ হয়। হাইদ্রাবাদের মুসলমানেরা এক প্রকার হিন্দী ব্যবহার করে মত্য় কিন্তু এখানকার ভাষা তৈলঙ্গী। উত্তরে গঞ্জাম, দক্ষিণে মান্দ্রাজ ও পশ্চিমে হাইদ্রাবাদ বা অকুরাজোর কিয়দংশ লইয়া তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত। তৈলঙ্গী, কর্ণাটী, ড্রাবিড়ী, তুলবী ও মলয়ালম এক শ্রেণীর ভাষা বলিয়া একটা শিক্ষা করিলে অপরটা কষ্টে এক রূপ বুঝা চলে। কিন্তু সংস্কৃতের সহিত কিছুই ঐক্য নাই। পুরা কালের অসভ্য ভাষা হইতে এই ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। রাম হনুমানের সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করেন। তিনি কহেন, দেখ লক্ষ্মণ! হনুমান কেমন সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে। রাক্ষস ইল্ল বাতাপি সংস্কৃত কথা কহিয়া ব্রাহ্মণগণকে ঠকাইত। তৈলঙ্গীরা সমস্ত মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে হইলে অন্দর বাঙা কহিয়া থাকে। আমি যাই, তুমি যাও, আমরা যাই স্থানে, নান পোতাষ, হু পোতাষ, ওয়াডু পোতাডু ব্যবহার করে। ড্রাবিড়ীয়েয়া ইরগেল প্রভৃতি বিভক্তি প্রয়োগ করে। স্ততরাং বুঝা ভার। এজন্ত জলকে নীল্লু, এ দিকে আইসকে ইকড়ারা, এক পয়সাকে কল আনা, দুই পয়সাকে আরা আনা, তিন পয়সাকে মুকাল আনা, টাকাকে রুপেয়া, কোনদিকে পথকে এদোয়া, সরাইকে সময়, তগুলকে বিয়ম, দুষ্কে পালু, ফলকে পাণ্ডু, বেণুগকে ওকাইলু, তেঁতুলকে চিকীপাণ্ডু, তরমুজকে কনিংড়ি

করিবে। সংস্কৃতজ ব্যক্তিকে সংস্কৃতভাষে ও ইংরাজি ভাষাভিজ ব্যক্তিকে ইংরেজি করিয়া কার্য উদ্ধার করিব। গ্রাহকের জীলোকেরা তৈলক্ষে প্রত্যহ বটে পলাশাদির পাতা সেলাই করিয়া ভোজনপাত্র ও পানপাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। তৈলুল গোলায় উপর লকাচূর্ণ ঢালিয়া যে পাচিশূলসী তৈয়ার হয় তাহাই বাত্র দিয়া অনেকের আহার চলে। তৈলসী জীলোবেয়া প্রকাণ্ড খাক, কনিষ্ঠে জ্যেষ্ঠের জীকে তাগাম্য করিতে পারে না, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের জীকে তাগাম্য করিয়া থাকে। এদেশের অধিকাংশ লোক শৈব। যজ্ঞের বিছুতি কিন্তু বসন্তঃ পড়িয়াছিল দিয়া লোকে ত্রিপুর করে। হিন্দু চুণ কটকিলি ও লেবুর রস দিয়া যে কলী তৈয়ারী হয় তাহা দিয়াও অনেকে ত্রিপুর করিয়া থাকে। তৈলজের নীচ লোক মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। মোকামদারগণকে শেঠ বহিরা আহ্বান করিলে বড় খুশী। সদবা জীলোকে মাথায় কাপড় দেয় না। যাহা হউক হরদরাবাদের প্রায় অর্দ্ধাংশ ইংরেজেরা রেমিডেন্সির অন্তর্ভূত করিয়াছেন। সেকেন্দ্রাবাদে যদিও সৈন্য থাকে কিন্তু তথাকথিত ৫ মাইল দূরে বোলারম নামক স্থানেই প্রধান প্রধান অগ্নিস আছে। এই স্থান অপেক্ষাকৃত মনোরম শীতল ও ইহার জলও উৎকৃষ্ট। হাইদরাবাদের ৩ তিন কোশ দূরে প্রাচীন রাজধানী গোলকণ্ডা। কেরাব পার্শ্ব হৃদয় পর্কাতাপরি পূর্ব রাজগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঙ্গা সকল বিজয়ান। কেরার অভ্যন্তর হাইদরাবাদের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বন্দীগণ বদ্ধ থাকে। টাভরনিহারের বর্ণিত সে বিংশতি হীরক খনি আর নাই। সারা দুই একটা আছে তাহাও বদ্ধ। এই সকল খনির হীরকই জগদ্বিখ্যাত। গোলকণ্ডার তুলা উৎকৃষ্ট পাণিবিহীন হীরক অতি দুর্লভ। হাইদরাবাদ গমন ইচ্ছা না হইলে ভীমার ক্ষেত্র দিয়া গমন করিতে করিতে ইহার লক্ষ্য স্থানের কিছু দূর কুড়া তীরে উপস্থিত হইবে। প্রৌষ্ণকালে কুড়া বেণার জল অতি কম। নৌকার ব্যবহার অসম্ভব। বাঁশের চৌকদার চমুড়া জাবরণ দিয়া পারাপারের কার্য চলে। কুড়ার মোড় ৬৮ খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ড ৬০ ফীট বিস্তৃত। নিম্নে প্রান্তর থাকিল এক দেহু বিলম্বল দুটু ইচ্ছা হু। কুড়ার উত্তর তীরে নানাবিধ রত্নের খনি। এতদ্বারা ইহাকে স্বর্গভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক দেহু পার

হইয়া কিছু দূর গিয়া রাইচোর, রাইচোর কইতে কানাড়ি ভাষা আশ্রয়। এখন জনকে নীক, দুটকে ছায়ালা, এদিকে আইনকে ইমিবা, দুই পরমাণিকে অজ্ঞা, তিন পরমাকে মুকাল আনা, গাঁটরীকে গুয়া, কোন দিকে পথকে দাও ছাদারে, উপবেশন করকে কুচ, চটীকে সরেদ, তুলকে অক্ষা, জুকে হালু ও কলকে হারু কহিবে। ইংরেজেরা পশ্চিম সাগরের উপকূলবর্তী যে স্থানকে কানাড়ী বলেন বস্তুতঃ তাহা সেরা দেশ এবং তথায় কণাটী ভাষা বিস্তর প্রচার। ইংরেজেরা পূর্ব ও পশ্চিমকূলের দুই পর্বতকে ঘাট কহিয়াছেন বস্তুতঃ তৈলঙ্গ ও কানাড়ী ভাষায় ঘাট, গুটা, গুড়া পর্বতকে কহে। যেমন সহগুড়া, চন্দ্রগুড়া, মহেন্দ্রগুড়া ইত্যাদি। কণাটী ভাষাটী কেবল অধিতাকায় প্রচলিত। কণাটে কজী ও লিঙ্গায়তী বলিয়া যে শৈব মন্ত্রদায় আছে তাহার। ব্রাহ্মণ অগোষ্ঠা শ্রেষ্ঠ, ভাল করিয়া ব্রাহ্মণের স্পর্শ করা জল পরাস্ত ও খায় না। অথচ গন্ধবাণক তাহাদের জন্ম ও গুরুজাতি। ইহাদের গলায় বা কাপড়ের খুঁটে ঐদেগান হইতে আনীত এক একটা ক্ষুদ্র প্রস্তর শিবিলাজ থাকে। তৈলঙ্গ, কণাটী, ড্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র জ্রীলোকের। রেশমের পাড় দেওয়া ও নানা বর্ণের মাড়ী পরাতে অতি সুন্দর দেখায়। অযোধ্যার টিল পাজামা, লাছোরের সঙ্কীর্ণ পাজামা, পশ্চিমাকূলের ময়লা সাগরা ও কাশ্মীরের গলদেশ হইতে পা পরাস্ত দোহন্যমান কুরতা হইতে দাক্ষিণাত্যের জ্রীদিগের মাড়ী দেখিতে সুজী। * তাহাদের কাপড় প্রায় আঠার বিশ হাত। পুরুষের জার কাছাদের এবং কতকটা কোঁচা করিয়া কোঁচার অবশেষটা খুলিয়া গায়ে বেড় দেয়। বুক একটা কাঁচুলী থাকে। কিছু লজ্জার সম্পর্ক নাই, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। অনেক বলেন, দাক্ষিণাত্যের এই ব্যবহার প্রাচীন আর্যগণের ও আশ্যাদের ব্যবহার, মুসলমান প্রবাহমান প্রচারিত। কিছু

* আর ছবিন পারে সাহেব কহিয়াছেন ইংলণ্ডের ইতিহাস খুলিয়া দেখ ইংরেজেরা ব্যৱহার পৌরাসক পরিবর্তন করিতেছে তথাপি ও একটা ঘোণা বলিয়া ঠিক হইল না। জ্ঞানতে পরিচ্ছদ জল বায়ুর অহুতপ ও উৎকর্ষ, একত্র একত্রে আছে।

মন্তব্য: তাহা নহে। পূজবধূরা যন্ত্রকে পৰ্য্যন্ত যে লক্ষ্য করিত তাহা যথেষ্টের ঐতরের জাঙ্গে লিখিত আছে। যখন বিভীষণ সীতার লিবিকা-
হার কঙ্ক করিয়া বাজরাগিকে অপসারিত করেন তখন রায় কহিলেন,
বিভীষণ! বিপদ, শীড়া, সংগ্রাম, অরহর, যজ্ঞ ও বিবাহ এই কয়েক বিষয়ে
জীর্ণের দর্শন দুখীয় নহে। লক্ষ্য হুত্ৰীষের অন্তঃপুরে প্রবেশ না
করাতে তাহা আনিয়া কহিল, তুমি হুত্ৰীষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব হুত্ৰীষের
জীর্ণকে দেখিতে দোষ কি? রামায়ণ ও ভারতের নানা স্থানে অহুর্বা-
শ্যায়ণা বলিয়া বিশেষণ আছে। মুসলমানদের ভারতে আনা হুত্ৰে
খাক্ক মহম্মদ জন্মের ৮০০ বর্ষ পূর্বে ঐক হুত্ৰ মিগাহিমিস পাটনীপুজে
খাক্কিয়া হিদ্দ জীলোকগণের অন্তঃপুরে বাস ও ভরহর আবরণের বিষয়
লিখিয়াছেন। অন্তঃপুর বলিয়া একটা শব্দও অভিধানে আছে, কিছু
দাকিণাত্যে অনেকের সে অন্তঃপুর কোথায়? মহরার এক জী বাটীর
সকলের মনোরঞ্জন করে, একি আর্ঘ্যদের ব্যবহার? হিমালয় প্রদেশে
এক জীর বহুপতি আছে সত্য কিন্তু তাহা অসভ্য জাতি মধ্যে প্রচলিত।
বিদ্যা পায় হইয়া জীর্ণের কমতা পুষ্করের উপর ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে
অবশেষে কড়া কুহারীতে জীলোকেরাই সর্ক সর্ক হইরাছে। কানাড়ার
হুত্ৰ লোকে রাগী শস্তের যও খাইয়া দিনপাত করে।

বাহা হউক রাইচোর পার হইয়া আমরা কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ কার্পাসের
ভূমি সকল অতিক্রম করিতে করিতে ভীষণ তুঙ্গতন্ত্রা তীরে উপস্থিত হই-
লাম। এই নদীর বিস্তার প্রায় ৩২০০ ফীট। এবং সময়ে সময়ে ইহার
জল হটাৎ ১৭ ফীট কাঁপিয়া উঠে। তীরের অতি বিপুল ও ভরহর।
কিছু নিম্নে প্রস্তর খাঁকার রেলওয়ের স্তম্ভ সকল দৃঢ় হইরাছে। প্রত্যেকে
৬৪ ফীট, বিস্তৃত ৫৮ ফেটের সেতুতে আমরা নদী পার হইলাম। তুঙ্গতন্ত্রা
পার হইয়া গাড়ী দক্ষিণ মুখে শস্তপূর্ণ ও জলপূর্ণ কেত্ৰের মধ্য দিয়া
আদানী নগরে উপস্থিত হইল। আদানীর পর গুডাকল পৰ্য্যন্ত পুনরায়
পার্কভীর উঁচর ভূমি। গুডাকল হইতে ডাইন দিকে এক শাখা রেল
কুহারী গিরাছে। কিঙ্কিয়া দর্শন মানসে আমরা ঐ রেল আরোহণ
করিলাম। কিরদূর পরে হাগরী নদী। ইহার বিষম তীর অতি সামান্ত

মাত্র উচ্চ । বিস্তার ২২৭০ ফীট মাত্র । ৬৪ ফীট অন্তর ৩৪ খণ্ডে এই সেতু পার হইয়া বঙ্গারী নগরে পহঁছিলাম । নিকটস্থ উচ্চ ঐনাট্ট পর্বতোপরি ত্রিবেদীনযুক্ত কেলা ও পার্শ্বে ইংরেজদের সেনানিবেশ স্থান । এই জেলার স্থানে স্থানে তারের খনি আছে । বঙ্গারীর ৩০ কোশ দূরে হাম্পি ও আনিগড়িতে কিকিছাদি পর্বত । কিকিছার প্রায় ৪ কোশ দূরে ঋষাযুক । ঋষাযুকের পাদদেশে পম্পা সরোবর । পম্পা সরোবর এবধ নদী উভয়ই । সরোবরের জল ক্ষুদ্র নদীযোগে পার্শ্বস্থ তুলতজ্রাতে পতিত হইতেছে । মতঙ্গ সরোবর পম্পার অংশ মাত্র । পম্পার পশ্চিমে শবরীর আশ্রম । অদূরে ভ্রম সমুখস্থ গুহার স্ত্রীবাদি বানর চকুফর বাস করিত । কিকিছার অপরদিকে মাল্যবান পর্বত । এই স্থানে রাম বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ঈশাণদিকে সমুন্নত গুহার তাঁহার আবাস স্থান ছিল । নিম্নে জ্যোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে । এই সকল পর্বত এখনও অন্ডাব শোভার বিমণ্ডিত । সেই ভ্রমরের গুঞ্জন, সেই পুষ্পিত বিটপী লতা, সেই পক্ষিকুলের কলরব ও সেই জল প্রপাতের কল্লোলধ্বনি । আহা ! এখনও সেই নীরদনিকর গিরিবর আচ্ছন্ন করিয়া থাকে । এখনও সেই শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় । এখনও পরিভ্রান্ত পথিকের মুখে রাম রাম শব্দ কর্ণগোচর হয় । কিন্তু সে প্রত্যেকস্থলী আর নাই । এখন বাত্রীরা পম্পার স্থান করিয়া জীরাযের পূজা করিতেছে । কিকিছা দেখিতে আসিয়া প্রাচীন বিজয়নগরের আশ্চর্য্য ভগ্নাবশেষ দর্শন করা অতীব প্রীতিপ্রদ । এই পরিত্যক্ত নগরের বেটন প্রায় ৮ মাইল । ইহার স্থানে স্থানে ও পথপ্রান্তে এত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া আছে যে অসংখ্যে তাহার ছায়াতে গমনাগমন হয় । পথ পুঙ্করিণী কূপ সমস্তই প্রস্তর মধ্যে খোদিত । গৃহ ঘর মন্দির সমস্তই প্রস্তরে নির্মিত হইয়াছে । এক এক খান প্রস্তর এত বৃহৎ যে, কিরূপে যে সেই প্রস্তর অত দূর উত্তে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা বোধগম্য হয় না । এক এক খণ্ড দীর্ঘ প্রস্থে ও বেধে পঞ্চদশ হস্ত । বাজারের মধ্যস্থ দশ খণ্ডে বিভক্ত ১০ ফীট বিস্তৃত শিবালয় প্রায় ১৬০ হাতশুষ্ক । রামচন্দ্রের বিশাল মন্দির হু জন্মের খোদকারী নিভাসই চমৎকার । বিষ্ণুমন্দির প্রায় ৪০০ ফীট লম্বা ও ২০০ ফুট

প্রশস্ত। পার্শ্বে একখানি নিরেট পাথরের প্রকাণ্ড রথের আয়ুলাগ্র খোদকারীতে পূর্ণ। এই নগর প্রাচীন হিন্দুদিগের রাজধানী হৈল। এই স্থানেই সেই বিখ্যাত বুদ্ধরায় রাজধানী করিয়াছিলেন। এই স্থানেই সেই ভয়ঙ্কর পণ্ডিত মধ্যবাচ্য বা বেদের ঢাকা ও অশেষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রূত গ্রন্থ এত আছে যে, ভূমণ্ডলে এক ব্যক্তির হস্ত হইতে এত অধিক গ্রন্থ অগ্নি বাহির হইয়াছে। এখানকার নিকটস্থ দুই এক জন লোক কহে যে এই নগর পূর্বে তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরে ১২ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ছিল। এই তুঙ্গভদ্রা তীরে শৃঙ্গগিরিতে শঙ্করাচার্য্য সরস্বতী স্থাপন করিয়া “আকম্পং ছিরাভব মদাশ্রমে, বলিয়া চলিয়া যান। গভীর প্রজ্ঞাশীল সম্রাটগণের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা থাকিলে দর্শক কিছু দূর কষ্ট স্বীকার করিয়া শঙ্করের এই মঠ দর্শন করিবেন। প্রচারিত গ্রন্থাদি বাতীত শঙ্করাচার্য্যের যমুনাটক প্রভৃতি মোহমুগ্ধেরের ত্রায় অনেক জ্বলিত কবিতা আছে। শৃঙ্গগিরি বা সিংড়ার এই মঠ অনেক প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইবে। শঙ্করাচার্য্য হইতে এখন ঐশংগ ও কদম্বীতে বিদ্যমান আছেন।

বঙ্গারী গমন ইচ্ছা না হইলে গুড়াকল হইতে প্রধান রেল সেনানিবেশ স্থান গুটি চলিয়া যাইবে। পথে পাছাড় খাত করিয়া রাস্তা সমান করা হইয়াছে। গুটি হইতে পূর্বমুখে রেল গাড়ী পর্বতময় উচ্চবচ ভূমি পার হইয়া পার্শ্ব তীরে উপস্থিত হইল। ৬৪ ফীট অন্তর ২৮ খণ্ডানে পার্শ্ব ৩৭০ ফীট অন্তর ৪০ খিলানে চিত্রাবতী পার হইয়া পল্লীপুরিত নীল ও কার্পাসের সমতল ক্ষেত্র সকল অতিক্রম করিতে করিতে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইল। তাহার পর ২৪০০ ফীট বিস্তার পাওয়া নদী, তীর মিল্ল বিসম ও পরিবর্তনশীল। নদীবেগেরও স্থিরতা নাই, বর্ষে বর্ষে খাত পরিবর্তন করে। সময়ে সময়ে চৌদ্দ ফীট জল উঠিয়া দিক প্রাবিত করে। এই নদী পার হইয়া রোলাতলা নাল। অতিক্রম করণ কড়প নগরে উপস্থিত হইলাম। কড়প বহুজনপুত্র, গাজাজের বাগ-জোয় প্রধাম প্রবাহ স্থান। প্রায় বার্ষিক ২৫ লক্ষটাকা প্রবাহ এখান হইতে মাজাজে প্রেরিত হয়। কার্পাস, নীল, তামাক ও কুহুম ক্রমাগত মাজাজে

চালান হইবে না। কাপড়, কবল ও বিবিধ ধাতুদ্রব্য দোকান পরিপূরিত। কুশকা রর দোকানে নানাবিধ গুণায় পাত্র। চাল, রাগী, জোয়ার, বাজরা নানা স্থানে গাদী করা বহিয়াছে। সেগুন, মারিকেল, খর্জুর, তাল, নিম, বাবলা প্রভৃতি রক্ষ জেলায় বিস্তর থাকায় উচ্ছাত দ্রব্যের অসম্ভাব নাই। কড়প, জেলার রাজধানী ও ইংরাজদের সেনানিবেশ স্থান। নগরের ৭ মাইল উত্তর পূর্বে গামার তীরে হীরক খনি আছে। কড়প পার হইয়া তম্রাধী এক ক্ষুদ্র নদী। ৬০ ফীট অন্তর ভাট খণ্ডে এই নদী পার হইয়া প্রায় ২৭ মাইল বেগ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া পূর্বমুখে হ্রদের ভাবে চলাবে। তদনন্তর চেয়ার নদী। তুঙ্গভদ্রা ও চিত্রার পর এই সেতু গণনার যোগ্য। ইহার ৩৮ বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগ ৬৪ ফীট অন্তর। চেয়ার হইতে ভূমি খারায় পার্শ্বতীয় ভাব গারণ করিল, স্থানে স্থানে গভীর খাত। এই সকল সামান্য খাত পার হইতে হইতে বালাপিলিতে পূর্ব ঘাট বা মহেন্দ্র পদত অতিক্রমের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। পথ ক্রমে উচ্চ হইয়াছে। কিয়ৎকাল পরে ত্রিপতি ফৈসন বা বালাজী। পূর্ব-হোয়ারি বালাদির মন্দির সতি বিশাল সিংহাসনোপরি বালাজীর প্রস্তর-ময় মূর্তি উপবিষ্ট। বান্দাবস্ত প্রায় জগন্নাথের ত্রায়। দাক্ষিণ্যতোর মধ্যে এই গার্গ্য অতি প্রসিদ্ধ। জগন্নাথ ক্ষেত্রের ত্রায় বালাজীর প্রসাদ ভঙ্গণেও নোকে ভাতিভেদ স্বীকার করে না। বার্ষ বার্ষ এখানে বিস্তর নাকী উপস্থিত হয় এবং প্রসাদ দেশ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার জগন্নাথ ও দাক্ষিণ্যতোর বালনাথ প্রসিদ্ধ। পূর্বতের উচ্চতার কারণ ত্রিপতি পার হইয়া নাগারীর নিকট পাহাড় কাটিয়া পথ সমান করিতে হইয়াছে। নাগারীর পর অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। তদনন্তর আর্কনথ ফৈসন। এই স্থান হইতে তিনদিক তিন রেল গিয়াছে। পূর্বে মাস্ত্রাজ, দক্ষিণে কাকীপুত্র ও পশ্চিমে ভারতের সর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় গিয়াছে। পূর্বগামী রেল আরোহণ করিয়া ৪২ মাইল পরে মাস্ত্রাজ পতিচিহ্ন। মাস্ত্রাজের ফৈসন রায়পুরমে সাগর তট অবস্থিত। সম্মুখে বাণেশ্বরের ক্ষেত্র। মাস্ত্রাজ নগর কল পুষ্পোপাশ্রিত উদ্যান ও শৃঙ্খল, হীরা, মুক্ত, লতিকা সাগর তীরে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৯ মাইল বিস্তারিত।

পূর্ব পশ্চিমের বিস্তার কোন কোন স্থানে ৩০ মাইল। সাগর তীরে যেখানে গবর্ণমেন্টের অফিসাদি আছে সেই স্থানটী সুদৃশ্য। এখানে দেখিবার মধ্যে কেল্লা, কর্ণাটের নবাবের গৃহ, গিরজা, হিবর সাহেবের কবর ও সিংহ ব্যাড়া দি পূর্ণ পিপলছ গার্ডেন প্রধান। কেল্লা মধ্যে টিপু সুলতানের দুই রহৎ তোপ আছে। কেল্লার ভিত্তি সাগরে সংলগ্ন। মাস্ত্রাজের সমুদ্র নিতান্ত অস্থির। ইহার ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া হৃৎকম্প হয়। শীতকালে মাস্ত্রাজের সাগর যে দেখিয়াছে সেই জানে যে সাগর কি ভয়ঙ্কর। কাহার সাধ্য যে জাহাজ কি বোট লইয়া তীরে অগ্রসর হয়। তক্তার নারিকেলের দড়ি বাঁধিয়া নৌকার মত করিয়া দেশীয় লোক জাহাজে কথঞ্চিৎ যাতায়াত করে। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞা বুজি এই সাগরে দেশীয় মাঝির নিকট পরাভূত হইয়াছে। যখন উল্লে ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে গভীর গর্জন, মধ্যস্থলে প্রবল বাতায় গম গম শব্দ, নিম্নে প্রচণ্ড দাক্ত ক্ষুভিত সাগরের কল্লোলধ্বনি, তীরে পর্বতাহতক্ষেণপুঞ্জ ও দিক্ পরিধির প্রান্তপৰ্য্যন্ত অন্ধকারময় সাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ এককালে ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তখন বোধ হয় ঈশ্বর! এ কোন্ সৃষ্টিতে উপস্থিত হইলাম। প্রকৃতি যে কি ভয়ঙ্কর ও মানব যে কত ক্ষুদ্র তাহা যুগপৎ অন্তরে উদিত হওয়ায় চক্ষু আপনা হইতেই মুদিত হইয়া সেই অনন্ত পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। এইরূপ সাগরের পার্শ্ব দিয়া আমরা মাস্ত্রাজ হইতে আর এক রেল অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলাম। কিয়দূর পরে চেঙ্গলপট্টু। মাস্ত্রাজ হইতেই তৈলঙ্গ ভাষা শেষ হইয়া তামিল প্রাবিড়ী বা আকই ভাষা আরম্ভ। মাস্ত্রাজ হইতে পশ্চিম ঘাট পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব দক্ষিণস্থ বিভাগে এই ভাষা প্রচলিত। এখন হইতে জলকে নীচ জলং বা তান্নি, টাকাকে রুপেরা, এক পরসাকে কল আনা, দুই পরসাকে আরে, তিন পরসাকে মুকাল আনা, চটীকে সরম, চাউলকে আরিসি, হুঙ্কে পাল, কলকে পড়ম, স্থপারিকে পাকমরম, পানকে বেটলি, লক্ষ্মারিচকে মলাগি, খর্জুরকে ইহম পানই, এখানে আইসকে ইজেন্ডরা, কোন দিকে পথকে ইজাবাড়ী কহিবে। তামিল ভাষায় বর্ণমালার বর্ণের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ নাই। খ গ ঘ ছ ইত্যাদি বর্ণবিশিষ্ট শব্দ সমস্তই সংস্কৃত-

ভিলাপুর পার হইয়া দক্ষিণ পানার সঙ্গমে দক্ষিণ আর্কাডুর রাজধানী কডালোর বন্দর । এখানে বিস্তর ইংরেজের বাঙ্গালা । ইহার পর প্রাচীন কডালুর নগর । তাহার পর লৌহের কারখানা স্থান পোর্টনভো । পোর্টনভোর পর তীর্থস্থান ময়বরম । এখানকার মন্দির গুলি অতি শোভা-শালী । তদনন্তর কয়ুকোনম । ভারতের মধ্যে এই স্থানে বেদের অধিক আলোচনা দেখিলাম । এখনও প্রবাহিতেরা রীতিমত বজ্র কুণ্ডলি করিয়া থাকেন । ইহার প্রধান অংশ নাগোর নগর সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও জাহাজে পূর্ণ । এখানে ১৫০ ফুট উচ্চ এক স্তম্ভ আছে, কে যে প্রস্তুত করিয়াছে এবং কেন যে করিয়াছে তাহার কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না । প্রাচীন কয়ুকোনম নগর কাবেরীর উত্তর দ্বারার মধ্যভাগে সংস্থাপিত । এই স্থান প্রাচীন চোলবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল । চক্রেখরের মন্দিরের সম্মুখস্থ কুণ্ডে দ্বাদশবর্ষান্তে মাঘ মেলা হইয়া থাকে । এই স্থান হইতে মহাতীর্থ কাবেরী সাগর সঙ্গমে স্নান করা যায় । সময়ে সময়ে কাবেরীর মুখে সামুদ্রিক বিধাত্ত সর্প প্রবেশ করে । এজন্য সাবধান হওয়া উচিত । কয়ুকোনমের পর কয়েক ফেটন পার হইয়া এই রেল ক্রমে সাগর তীর ছাড়িয়া কাবেরীর তীরে তীরে ত্রিচূনাপল্লী হইতে নিগাপটম গামী রেলের সহিত তানজোরে গিয়া মিলিয়াছে । সাগর সমীপস্থ এই সকল বিভাগের দৃশ্য অতি মনোহর । পুণ্যসলিলা কাবেরী কলিকণ আদি শাখা বিস্তার করিয়া গঙ্গার ছায় প্রবাহিত হইতেছে । ভাগীরথী তীরের ছায় সেই শ্যামল শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র, সেই ধাত্তের দোলায়মান মস্তক, সেই নারিকেলের নিকুঞ্জবন ও সেই তালরাজির বিস্তীর্ণ শ্রেণী । গুবাক রুদ্ধ সকল খেন প্রকৃতি ভূষণ মানসে রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে । কত শত কদলী রুদ্ধ কলভরে অবনত । মধ্যে মধ্যে বংশশুল্ক ও আত্মের নিবিড় ছায়া । রাখালগণের সেই বংশীয়ব, কোমল পত্রে আবৃত পক্ষীর দূরব্যাপী শব্দ ও বটতলে ক্রীড়মান বালকগণের সঙ্কলিত হসি হৃদয় আনন্দনীরে নিমগ্ন করে । নীরম দক্ষিণাত্যে আসিয়া পুনরায় যে স্বদেশের দৃশ্য অবলোকন করিব তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না । তানজোর বা তানজবুর নগরও অতি উৎকৃষ্ট ও শোভাশালী । সরল পথ ও সুন্দর গহরাজি । কেলা হইটী অতি

সুদূত । রাজবাটী প্রশস্ত ও মনোহর । কিন্তু ক্ষুদ্র কেল্লার মধ্যস্থ মন্দিরই অতি আশ্চর্য্য । এই মন্দির এত উৎকৃষ্ট যে ইহার ঢুলা শীর্ষ শোভাময় উচ্চ ও সুগঠিত মন্দির ভারতে অল্প দেখা যায় । উচ্চতা প্রায় ২০০ ফীট এবং সর্ব্বাঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তরে নির্মিত । ইহার সভামণ্ডপের ষাঁড় কৃষ্ণ প্রস্তরে এমন চমৎকার রূপে নির্মিত হইয়াছে যে, ইহার গঠন দেখিয়া ইংরেজেরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । ষাঁড়ের উচ্চতা ৮ হাত । নানাস্রব্য পূর্ণ তান্জোর নগরে রেশম ও কার্পাসের কারবার অনেক । কাঞ্চীর দক্ষিণ তীরস্থ সहरतली সমন্বিত এই নগর সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনায় পূর্ণ ।

আর্কোণম হইতে মাস্ত্রাজ গমন ও তথা হইতে সাগরের তীরবর্তী রেল দিয়া তান্জোর গমন ইচ্ছা না হইলে দক্ষিণ শাখা রেলে ব্রাহ্মণ ও তাঁতি-পূর্ণ কাকীপুর নগরে গমন করিবে । কাকীপুর নগর এখনও “নগরেষ্ কাক্ষি”, নামের স্বার্থকতা করিতেছে । পথ পরিস্কৃত ও বাজার সুপ্রশস্ত । উত্তর দিকে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল রক্ষ । নগর মধ্যে মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির । এই মন্দির এত বৃহৎ যে অভ্যন্তরে হাজার স্তম্ভযুক্ত ধর্ম্মশালা বা অতিথিশালা আছে । সিঁড়ির দুই দিকে প্রস্তরের দুই হাতী রথসহ দণ্ডারমান । সিঁড়ি দিয়া উত্তীর্ণ হইলে বহুদূর পর্য্যন্ত ঝাড়, জঙ্গল, ঝিল, ও পাহাড় সকল নেত্র গোচর হয় । এইটীর নাম শিবকাক্ষি । ইহার এক ক্রোশ দূরে বিষ্ণুকাক্ষি । এখানে বরদরাজ বিষ্ণুর মন্দির আছে । এই মন্দির আড়ম্বরে ও সৌন্দর্য্যে শিবমন্দির অপেক্ষাও অধিক । দরজার সম্মুখে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত তাহার গকড় স্তম্ভ । কাক্ষিতে প্রায় ১৫০ উৎকৃষ্ট মন্দির আছে । কাক্ষিনগর হিন্দুদের মহাতীর্থ । “অযোধ্যা মথুরায়া কাশী কাক্ষি অবন্তিকা । পুরী দ্বারা বতীটৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা ।”, এখানে চোলবংশীয় রাজারা কিছুকাল রাজধানী করেন ।

দক্ষিণের শাখা রেলে কাক্ষিপুর গমন ইচ্ছা না হইলে আর্কোণম হইতে আর্কট গমন করিবে । মাস্ত্রাজ হইতে আরকট আসিতে করতিলার নদীর ৩০ ফীট অন্তর ২৬ খিলানযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রস্তর সেতু । আরকট প্রবেশ মুখেও ৫৬ খিলানযুক্ত পাইনি নদীর গ্রানাইট নির্মিত সেতু । আর্কট

গমন কালে এই জেলায় চাসের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইবে । কূপ ও পুষ্করিণীর সংখ্যা নাই । শুনা যায় ৩৫৯৯ গ্রাম মধ্যে চারিহাজার পুষ্করিণী ও ১৯ হাজার কূপ আছে । ইহার উপর নদী ও প্রভাবণের জল খালযোগে আসিতেছে । এক কাবেরীপাক পুষ্করিণী দীর্ঘ ৮ ও প্রস্থ ৩ মাইল । খাজ ও কাপাস বিস্তর উৎপন্ন হয় । কিন্তু অধিকাংশ মৃত্তিকা বালুকাময় ও গ্রীষ্মকালে ঘোর গ্রীষ্ম । আরকট নগর ষাণ্মাসবাহিনী পালার নদীর ডাইনতীরে অবস্থিত । মুসলমানদের সময় এই নগরের বড় ধুম ধাম ছিল । এখন কেবল ভগ্নকল্লা নবাবের ভগ্নবাটী ও অপরাপর ভগ্নাবশেষ দেখিবার যোগ্য । আরকট হইতে ১৫ মাইল পরে সেনানিবেশ স্থান ভিলোর বা বেঙ্গুরু । ভিলোরের শিবমন্দির দর্শনযোগ্য । ভিলোর পার হইয়া পথে গরিয়টম নদী । ইহার দুই শাখার উপর দুই পুল । প্রথমটী ২৪ ও দ্বিতীয়টি পঞ্চ খিলান বিশিষ্ট । গরিয়টমের পর পথ ক্রমে আয়াস সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে । পদে পদে নদী ও খাল । এমন কি ১১০ মাইল মধ্যে ৯৫ সেতু । পালারের সেতুর ১৪ খিলান ৩০ ফীট ও পাঁচ খিলান ৬৪ ফীট বিস্তৃত । পানারের সেতু ১৮ খিলান প্রত্যেক ৩০ ফীট । পালার ও পানারে যে সকল নদী পড়িতেছে তাহাদের সকলেরই সেতুর খিলান ৩০ ফীট বিস্তৃত । কেবল জন্তীপোরাণের ৫ খিলান ১৫ ফীট ও গদারের ১২ খিলান ২০ ফীট বিস্তৃত । পালার হইতে পানার পর্য্যন্ত অপরাপর নদীর মধ্যে কড়ারের ৫ গদারের আর এক স্থলে ৩ পালার নদীর ৭ ও মুর্ণাপটীর ৭ খিলান । প্রত্যেক ৩০ ফীট বিস্তৃত । পানার হইতে সালেম নদী যাইতে আছুর নদীর সেতুর ৭ ও সিভরি নদীর ৪ খিলান । প্রত্যেক খিলান ৩০ ফীট । যাহা হউক এই সকল সেতু পার হইয়া সালেম যাইবার কালে ইচ্ছা হইলে জলারপেট হইতে ডাইন রেল বেঙ্গলুর যাইবে । এই নগর মহীশূর দেশের সর্ব্ব প্রধান স্থান । ইহার চতুর্দিকে লালমৃত্তিকার প্রাচীর । বাজার চৌড়া ও নারিকেল রক্ষে পূর্ণ । কল্লা উচ্চ ও শুষ্ক ও পাহাড় খাত করিয়া পরিখায়ূত করা হইয়াছে । ইহার এক কোশ দূরে সেনানিবেশ স্থান । দেখিবার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হাউস, উদ্যান ও গবর্ণমেণ্টের আর আর স্থান প্রদান । এখানে চিকিৎসা-

পুরের আমদানী মিছরি উৎকৃষ্ট। বেঙ্গলুর হইতে ডাক গাড়ীতে ৭৫ মাইল দূরে অনেকে ত্রিরঙ্গপত্তন ও তথা হইতে ১০ মাইল দূরে মহীশূর নগর যায়, যাইতে ২৪ ঘণ্টা লাগে। পথে দেখিতে দেখিতে গেলে মহীশূরকে এক বিস্তীর্ণ অধিত্যকা বলিয়া বোধ হইবে। ভূমি সম বিষম ও স্থানে স্থানে এক একটা গওশৈল প্রকাণ্ড শির উন্নত করিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে খাচ্চা রাগী তামাক ও কাকর জমী। কোন কোন স্থানে শ্লেট লোহ লবণ সোডা রূপা ও সোণা পাওয়া যায়। স্থান নীরস। নিম্ন স্থানস্থ গ্রামে কইপোকাকর বড় উপদ্রব। লোকের ব্যবহারও অদ্ভুত। কেহ বিবাদ করিয়া গাধা মারিয়া কোন গ্রামে ফেলিয়া দিলে গ্রামকে গ্রাম উঠিয়া যাইবে। স্থানে স্থানে শিবের চড়ক হয়। এখানকার রাজার আয় ৭০ লক্ষ টাকা। মহীশূর নগর দক্ষিণে দশ মাইল দূর থাকিতে কাবেরীর দ্বীপমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিরঙ্গপত্তন নগর পাওয়া যায়। এই স্থানে হাইদর আলির রাজধানী ছিল। ত্রিরঙ্গপত্তনের মধ্যে দেৱা দেৱীত উছান, টিপু ও হাইদরের কবর, মসজীদ, টিপুর ভগ্নবাটী, মহীশূরের বাঘ, ত্রিরঙ্গজীর মন্দির ও দেওয়ানের সেতু দর্শন যোগ্য। কাবেরীর দুই ধারার উপর নিরৈট পাথরের পুল। ৬৬ স্তম্ভে তিন তিন শ্রেণীর উপর পাথরের তক্তা পাড়িয়া পুল হইয়াছে। ত্রিরঙ্গপত্তনের পর মহীশূর নগর। মহীশূর লালমাটির প্রাচীর বেষ্টিত। কেল্লামধ্যে রাজবাটী। নিকটে এজেন্টের উৎকৃষ্ট গৃহ। নগরের ৫ মাইল দূরে পর্বতোপরি সরোবর। পর্বত শীর্ষে এজেন্টের সুদৃশ্য বাঙ্গালা। পাহাড় পার্শ্বে ১৬ ফীট উচ্চ প্রস্তরের একটা নন্দী বাঘ। অনতিদূরে রাজার প্রকাণ্ড হস্তীরথ। মহীশূরের ৪০ মাইল দৈশান কোণে শিবসমুদ্রে কাবেরী প্রপাত দেখিবার যোগ্য।

বেঙ্গলুর ও মহীশূরাদি দেখিতে ইচ্ছা না হইলে মালেম চলিয়া যাইবে। নগর পর্বতদ্বয়ের মধ্যে ৭ মাইল বিস্তৃত এক নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত। চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকা লাল ও কর্করযুক্ত। স্থানে স্থানে পাথর উঠিয়াছে। নগরের ৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে এক খণ্ড উষরভূমি ম্যাগনিসিয়া পূর্ণ। ম্যাগনিসিয়াম সল্ট ও ছিমেণ্ট এই মাটি হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার

অধিকাংশ লোক কার্পাসের ব্যবসায় রত । দক্ষিণাত্যের এই সকল বিভাগে নানা স্থানে লোহ খনির চিহ্ন পাওয়া যায় ।

সালেম ফ্রেসন ত্যাগ করিয়া চারিদিকেই সমতল ক্ষেত্র নয়ন গোচর হইবে । কিছুদূর পরে পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী প্রবাহিত হইতেছে । ৬৪ কীট অন্তর ২২ খণ্ডযুক্ত সেতুতে নদী পার হইয়া ইরোড জঙ্গলন । ইরোড হইতে এক শাখারেল পশ্চিম মুখে গিয়া পশ্চিম সাগর স্পর্শ করিয়াছে । পশ্চিম সাগর তীরস্থ মলয়গিরি দর্শন করিবার জন্য আমরা ঐ রেলের আরোহণ করিলাম । ক্রমাগত সমতল ক্ষেত্র ও মাধ্যমাধ্য সেতু । ২২ সেতু পার হইয়া কোয়ম্বাটুর নগর । কোয়ম্বাটুর নীল নদীর বামতীরে অবস্থিত । এইটী টিপু প্রধান সেনানিবেশ স্থান ছিল । কোয়ম্বাটুর জেলায় উৎকৃষ্ট তামাক ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হয় । চন্দনরক্ষ ভূরি ভূরি । স্থানে স্থানে লোহ ও গোদন্তের খনি, এখানকার লোক বাঁড়ের উপাসক । কোয়ম্বাটুর হইতে উত্তরমুখে এক শাখা রেল নীলগিরি পর্বতের প্রত্যন্ত দেশ মিটাপোলিয়ম পর্যন্ত গিয়াছে । নীলগিরির শিখরস্থিত উটকামণ্ড-গাম্ভীর্ণ মিটাপোলিয়ম হইতে হৃদয় সমতল পথ দিয়া ৬ মাইল দূরে কুলার পর্যন্ত যায় । কুলারে পর্বত আরম্ভ । কুলার হইতে প্রাচীন পথ দিয়া ৯ মাইল দূরে এবং নূতন পথ দিয়া ১৬ মাইল দূরে কুন্নুর । পুরাতন পথে তজ্জার ভাড়া আট টাকা নূতন পথে গাড়ী চলে একত্র খরচ অল্প । এক পথে গমন ও অপর পথে প্রত্যাগমন করিলে উভয় পক্ষের মনোরম সৌন্দর্য্য নেত্রগোচর হয় । কুন্নুর হইতে উটকামণ্ড পর্যন্ত গাড়ী চলিবার যোগ্য বাঁধা পথ আছে । সমগ্র উৎকৃষ্ট, ষোড়শগাড়ী ভাড়া দশটাকা । স্বাস্থ্যপ্রদ, উটকামণ্ড নগর সাগর হইতে ৭৩৯১ কীট উচ্চ সংস্থিত । সাহেবদের বাটী এবং পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারের সংযোজক অকপ নীলগিরির স্বাভাবিক ভাবই উটকামণ্ডের শোভা । এখানে গ্রীষ্মের প্রাচুর্য্য নাই । উপরে হস্ত সাত মাইল বিস্তীর্ণ এক সরোবর আছে । ইচ্ছা হইলে দর্শক পর্বতোপরি পাঁকড়া নদীর প্রপাত দেখিতে পারেন । কেহ কেহ বলে নীলগিরি রামায়ণের দন্দুর পর্বত । উটকামণ্ড দর্শন ইচ্ছা না হইলে কোয়ম্বাটুর পার হইয়া ক্রমাগত পশ্চিম রেল চলিবে । উভয় পার্শ্বে

পার্বত্য উচ্চাবচ ভূমি ও খাত । স্থানে স্থানে জঙ্গল । ওয়ালিয়রের জঙ্গল নিত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর । ৩০ ফীট অন্তর পঞ্চকুরবিশিষ্ট সেতুতে ওয়ালিয়র ও ১৫ খণ্ডবিশিষ্ট সেতুতে কোলিগাড পার হইয়া আমরা মলয় পর্বতের সুপ্রসিদ্ধ খাত পালঘাটে প্রবেশ করিলাম । পালঘাট পার হইয়া রেল পনানি নদীর পার্শ্বে পার্শ্বে তীরতলা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে । তীরতলা হইতে বেপুরের নিকটস্থ হইলে পশ্চিম সাগরের কল্লোলধ্বনি কর্ণ গোচর হইতে লাগিল । পালঘাট হইতে বেপুর পর্য্যন্ত রেল বসাইতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছে । মলয় হইতে ভূরি ভূরি স্রোতস্বতী তীব্রবেগে সাগরে পতিত হওয়ায় তদুপরি অতি ফক্টে সেতু নির্মিত হইয়াছে । এই মলয় পর্বতের বন শোভা অতি রমণীয় । ইহার বন দেখিলে রামায়ণের বর্ণন স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় । শাল তাল তমাল নীপ কিংশুক কদম্ব ভেলা বেতস চম্পক নক্তমাল, এক এক বেত ২২৫ ফীট লম্বা । ভূরি ভূরি চন্দন রক্ষ । কত জাতীয় কতরূপ কত বিশাল তক বিবটাকার শাখা বিস্তার করিয়া বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়াছে । এক একটা সেগুন ৩০ হাত উচ্চ । তালের ঘটাই বা কত এবং তাহার পত্রের বিস্তারই কি ভয়ঙ্কর । নিবিড় নীলমেঘের আয় নানাবিধ রক্ষ অবিরলভাবে সজ্জিত রহিয়াছে । ভয়ঙ্করলতা সকল ভীষণ ভুজঙ্গের আয় তাহার ডাল হইতে উর্দ্ধডালে যেন লম্ব দিয়া উঠিতেছে । মাতঙ্গের বৃংহিত, ব্যাঘ্রের ছকার ও বানরের চীৎকারে বন দিবানিশি কম্পিত হইতেছে । বহু মাতঙ্গের গাজ ঘর্ষণে, দন্তাঘাতে ও শাখা ভগ্ন শব্দে কর্ণকুহর বধিরীকৃত । কোথাও বহুমুখিষ ছুটিয়া যাইতেছে, কোথাও এক এক দলে অসংখ্য মাতঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে, কোথাও ভল্লুকে ভূমি বিদীর্ণ করিতেছে, কোথাও নানা জাতীয় হরিণ বিচরণ করিতেছে ও কোথাও কপিপুল লম্ব বম্ব প্রদান করিতেছে । নিবিড় অরণ্যমধ্যে আরণ্যরথ (গয়াল) সুখেতে শয়ান রহিয়াছে । কোন স্থানে নিস্তব্ধ বনে নিরন্তর কিল্লীরব, শুষ্কপত্রোপরি সর্পের গাত্র ঘর্ষণ ও দূর শাখায় উপবিষ্ট পক্ষীর সময়ে সময়ে চিচিকুচি ধ্বনি, কখন কখন নিজেব পদশব্দে বহুজন্তু ভ্রমে নিজেই শঙ্কিত হইতে হয় । কোথাও বা মাকত যোগে পুষ্পরেণু আনিয়া নাসিকা ও চক্ষু আচ্ছন্ন করিতেছে ও কোথাও বা

কণ্টক রূক্ষে গাত্র বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে। গহন বনের এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া মন ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। একেই পর্বত ভয়ঙ্কর, তাছাতে বন ভয়ঙ্কর, তত্পরি ভীষণ জন্তুর চীৎকার ও নদীগণের ঝঙ্কার শব্দ। নানাস্থানে কদলী কানন ও পর্বতপ্রান্তে এলা বন সকল সুদীর্ঘ হরিদ্রাবনের আয় জঙ্গলাবস্থায় বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়াছে। নানাবিধ ফল, দাড়াচিনি ও জায়ফল রূক্ষে নানা দিক শোভিত। সাগর প্রান্তে নারিকেল রূক্ষের দোলায়মান মস্তক সকল লক্ষিত হয়। লোকালয়ের নিকট আশ্র ও কাঁটাল রূক্ষোপরি গোলমরিচের * লতা উঠিতেছে। এখানকার লোকেরা স্বভাবতই ক্ষেত্রমধ্যে বাড়ী করিয়া থাকে। ইহাদের ব্যবহার অদ্ভুত। সর্বদেশীয় আইনকর্তাদিগকে ইহারা মূঢ় করিয়াছে। স্ত্রীজাতি দশমবর্ষে বিবাহ করে। পতির নিকট গ্রাসাচ্ছাদন লয় কিন্তু পতির সহিত সাক্ষাৎ নাই। পথের লোক ডাকিয়া উপপতি করে। তাহার বিশেষ জাতি বিচার নাই। যে যত অধিক উচ্চ শ্রেণীর লোক উপপতি করিতে পারে সে তত সম্ভ্রান্ত। পুত্রেরা বাপের নাম জানে না, মামার নামে পরিচয় দেয়। মাতা বাটীর সর্ব্ব সর্ব্বা এবং পথের পুরুষ আকর্ষণে কুল গরিমা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠা কন্যা বাটীর কন্যা। স্ত্রীলোকেরাই স্বার্থ মালিক। গরিব ভাগিনেয় নাম মাত্র মাতুলের বিষয়ের অধিকারী হয়। মলবারের প্রধান ব্রাহ্মণের নাম নায়র নামে খ্যাত। ঘরের ব্যবহার ঐরূপ কিন্তু ব্রাহ্মণেরা শূদ্র স্পর্শ করে না। এ প্রদেশের মৃত্তিকা লাল, নদীতীর বালুকাময় এবং গরুগুলি এত ক্ষুদ্র যে চাস চলে না। এক একটা গরু দেখিতে ছাগলের মত। কোচিন মঙ্গলুর প্রভৃতি এই সকল স্থানে অনেক খ্রীষ্টান ও জৈনের বাস। দেশীয় ভাষা মলয়ালম। মঙ্গলুরের অতি অল্প লোক তুলসী কহে। মলবার উপকূলে সাগরে বহুরূপ আশ্চর্য্য মৎস্ত পাওয়া যায়। এক জাতীয় মৎস্ত হইতে কডলিভরের আয় তৈল প্রস্তুত হইয়া মাস্ত্রাজে বিক্রীত হয়। সময়ে সময়ে মৎস্ত এত ধরা পড়ে যে লোকে ষোড়াকে পর্য্যন্ত মৎস্ত খাওয়ায়। চন্দন, মরিচ, জায়ফল,

* পৃথিবীতে বার্ষিক সাড়ে ছয় লক্ষ মণ মরিচ বায় হয়।

জৈত্রী, সাণ্ড, কফি ইত্যাদি দ্রব্য এখানকার প্রধান রপ্তানি । মাটির নিম্নে ও শিখরের উপর যে চন্দন থাকে তাহারই সারভাগ অতি সুগন্ধ । জায়ফলের গাছ লেবুরমত, ফলও তদ্রূপ । ইহার আচার ও মোরক্বা খাইতে বড় সুস্বাদ । আঁটিটা জায়ফল । এই মলয়গিরি হইতে মলয়া-
নিল প্রবাহিত হয় । দক্ষিণে এই বায়ুর প্রবাহ অত্যন্ত বেশী । বাঙ্গালায় তত অধিক বোধ হয় না । দক্ষিণ পশ্চিমাগত মৌসুমী বায়ুতেই যত মেঘ আনিয়া উপস্থিত করে । এজন্ত সৰ্ব্ব ও মলয়ের বর্ষা অতি অল্পত । প্রায় ৯ মাস বৃষ্টি হইয়া থাকে । কুপেরাজল খারাপ হইলে লোকে আমলা পাতা ভিজাইয়া শোধন করে । পরশুরাম, মলবার কানাদা ও কোকন সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া বসতি করান । ইহার প্রাচীন নাম কেরল দেশ । শঙ্করাচার্য্যের এই দেশে জন্ম হয় । এখানে এখনওয়াইনদ প্রদেশে সোণার আকর বাহির হইয়াছে । নিজ বেগুরেই লোহার কারখানা আছে । মলয়ের পূর্বে পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ কুর্গ রাজ্য । ইহার অরণ্য মলয়ের সহিত সংযুক্ত ও ভয়ঙ্কর বাইগনে পূর্ণ । এখানে লোকে তালকাবেরী ও লক্ষ্মণ তীর্থে স্নান করিতে যায় । দর্শক মলয় হইতে ষ্টিমার যোগে মঙ্গলুরে গেলে হুনাবারের নিকট সরস্বতীর আশ্রম প্রাপ্য দেখিয়া যেন নয়ন আর্দ্র করেন । বসে হইতে দক্ষিণমুখে ষ্টিমার যোগে বিস্তর লোক আগমন করে । বসে হইতে কারাবার পর্য্যন্ত ভাড়া প্রথম শ্রেণী ৭০ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণী ৩৫ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণী ১২ টাকা । কারাবার হইতে কুমতা পর্য্যন্ত ৪০ মাইল মনহল ভাড়া ১২ টাকা । কুমতা হইতে হুনাবার ১২ মাইলে মনহল ভাড়া ৩ টাকা । হুনাবার হইতে নদী যোগে গিরিশপা গ্রাম পর্য্যন্ত ১৮ মাইল নৌকায় যাইতে হয় । গ্রাম হইতে জলপ্রপাতের নিকট পর্য্যন্ত ১৮ মাইল যাইতে মনহল ভাড়া মাড়ে চারি টাকা । গিরিশপা গ্রামে দর্শনশালা আছে । এই সকল বন্দোবস্ত জন্ত কারাবার কুমতা ও হুনাবারের মামলতদার অর্থাৎ ডেপুটি কালেক্টরদিগের সাহায্য আবশ্যক । খুঁজিয়া লইলে বসে হইতে স্বল্পবয়ে অনেকে ভাড়াবহা ষ্টিমার কুমতা পর্য্যন্তই পাওয়া যায় । মঙ্গলুর হইতে উত্তরমুখে গেলে স্বল্পই ব্যয় । শীতের প্রারম্ভে যাওয়াই ভাল, কারণ বর্ষার শেষে জ্বর কানাদার জঙ্গলে

রাজধানী করে। যাহা হউক এক্ষণে আমরা প্রপাতের সমীপবর্তী হইলাম। সমুদ্রের বনের আবরণ খুলিয়া গেলে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! দর্শক কোথায় তোমার সাহস! অশনি তাড়িতের আয় চকিত হইবে। তোমার নেত্র মুদিত হইবে, ইন্দ্রিয় শিথিল হইবে, শরীর স্পন্দিত হইবে, তুমিও চক্ষু কর্ণ আবদ্ধ করিয়া ভূতলে পড়িবে। যেন শত শত বজ্রাঘাত হইতেছে আর কি বলিব! জলের কি ভীষণ গর্জন! কি ভয়ঙ্কর আশ্ফালন! কি ঘোর আবর্ত! ধূমের আয় জলক্ষুলিঙ্গে নভোমণ্ডল অক্লীভূত, পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চূড়া, তরুণির ভীষণ বৃক্ষ সমূহের শীর্ষ সকল কম্পিত হইতেছে। এ ভীমরূপ বর্ণিত হইবার নয়, এ ভীমরূপ ভুলিবারও নয়। বিয়ংকাল ভূতলে পড়িয়া থাকিলে ক্রমে অভ্যাস পাইয়া আসিল এবং ইন্দ্রিয়গণ মবল হইয়া স্বকার্যে রত হইল। তখন আমরা অঙ্গের অঙ্গের অগ্রসর হইয়া দেখিলাম এতটা ভয়ঙ্কর ঋত, শিলাময় অনাচ্ছাদিত ও রুম্বর্ণ প্রায় ৯০০ ফীট গভীর হইবে। ইহার পার্শ্বদেশ বর্তুলাকার এবং এরূপ আনত যে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যহস্তে নির্মিত হইয়াছে। এই ঋতে সরস্বতী করক শাখা বিস্তার করিয়া পতিত হইতেছে। প্রধান শাখার পতন কালে কেন সমন্বিত ঘূর্ণমান এক প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ হইয়াছে। উহার বেগ এত তীব্র ও এত বেগে ও এরূপ বলে নিম্নে পতিত হইতেছে যে ঐ নদী পতিত হইবামাত্র সরলভাবে জল বহুদূর বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং জল ক্ষুলিঙ্গে বনের উপর আকাশমণ্ডলে এক খানি অপূর্ব মেঘ উৎপন্ন হইয়াছে। অপরাপর শাখা গুলি পার্শ্বদিয়া পড়িবামাত্র প্রস্তরের যাত প্রতি-যাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। প্রধান শাখার প্রপাত পৃথিবীর মধ্যে একটা অদ্বুত প্রপাত বলিয়া বর্ণিত হয়। জগদ্বিখ্যাত নারেগ্রায় ইহা অপেক্ষা অধিক জল পতিত হয়, কিন্তু ইহার উচ্চতা নারেগ্রা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার উচ্চতা ৮৮৮ ফীট এবং ইহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৬০০০ ঘন ফীট জল পড়ে। ক্রিস্টী সাহেব কহিয়াছেন যে, নিম্নে নামিয়া দর্শন করিলে ইহার ভীষণ ভাব এত দূর বোধ হইবে যে ইহাকেই জগতের সর্বপ্রথম বলিতে হইবে। কিন্তু নিম্নে নামিবার উপায় নাই। অসম নাহগী ব্যক্তির উপস্থিত শিলাতলে শয়ন করিয়া তাহা হইতে মুখ বাড়ি-

ইয়া ইহার নিম্নভাগ দেখিতেছে। এক সঙ্গে দৃশ্যমান এই ৪ জল প্রপাতের ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শক জন্মেও ভুলিবেন না। ত্রিকূট ইহার খট্টাদেশের প্রপাত কহিয়াছেন, হনাবাদের নিকট আমাদের দুর্গম গোকর্ণ মহাবলেশ্বর তীর্থ ও এক বিস্তীর্ণ হ্রদ। শিবের নাম পশুপতি। “ঘোরেন তপসা লঙ্কং রাবণাখ্যেন রাক্ষসাঃ, ইত্যাদি বলিয়া লোকে শ্রব করিতেছে। বস্বে ইহাতে বিস্তর মহারাজীয় যাত্রী আইসে।

পশ্চিম সাগরাদি দেখিতে ইচ্ছা না হইলে ইরোড জঙ্গলন হইতে প্রধান রেল চলিয়া যাইবে। ইরোড তাগ করিয়া ওয়ালিয়র বা নরেল তীর পর্য্যন্ত ভূমি ক্রমশই ঢাল। প্রজার ধাত্ব ক্ষেত্র তাগ করিবার জন্ত প্রস্তরময় উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া বহু কক্ষে রেল নীত হইয়াছে। কোথাও বা মৃত্তিকা স্তূপাকার কোথাও বা খাত করিতে হইয়াছে। নরেল পার হইয়া কিছুদূর পরে এক পাহাড় কাবেরী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পাহাড় কাকরের ভূমি হইতে প্রায় ১৮১ ফীট উচ্চ। কক্ষে রেল এই পর্বত পার হইয়া ঢাল অবলম্বন পূর্বক কাবেরীকে ডাঙনে রাখিয়া কাকরের সমীপবর্তী হইল। কাকরের নিকট অশ্বামতী নদী কাবেরীতে পতিত হইয়াছে। ইহার বিস্তার প্রায় সহস্র ফীট ও বালুকা অভ্যন্ত গভীর এই নদী পার হইয়া আমরা কাবেরীর ক্ষেত্র দিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর পরে কড়মতি ও কাবেরী সঙ্গম। কাবেরীর জলপ্লাবন হইতে পথ রক্ষা করিবার জন্ত ভূমি উচ্চ করা হইয়াছে। পার্শ্বে ধাত্বক্ষেত্র ও উচ্চাবচ ভূমি। এই সবল ভূমি তাগ করিয়া রেল কাবেরীর তীরে তীরে ত্রিচূনাপল্লী নগর পহুছিয়াছে। নগরের দক্ষিণ প্রান্ত উচ্চাবচ প্রস্তরপূর্ণ বালুকাময় ও অল্পর্বরা। কাবেরীর দিকের মৃত্তিকা লোহিত বর্ণ ও বালুকা মিশ্রিত। প্রাচীর বেষ্টিত এই নগর পর্বতোপরি সংস্থাপিত। ৫০০ ফীট উচ্চ পর্বতোপরি হুর্গে ধাপে ধাপে আরোহণ করিবার সময় কাবেরীর দিকে অতি মনোহর দৃশ্য লক্ষিত হয়। অপর দিকের স্থানে স্থানে নারিকেলের নিকুঞ্জ। এখানকার তামাক, মাটির ত্রব্য, অস্ত্র শস্ত্রাদি লৌহের ত্রব্য, অলঙ্কার ও ঘোড়ার সাজ এদিকে প্রসিদ্ধ। স্বর্ণ রৌপ্যের ত্রব্যের জন্ত নেরুপ কাশীর, বটক, কচ, লাঙ্গা ও বর্ষা প্রসিদ্ধ। ত্রিচূনাপল্লী ও মেই

রূপ প্রসিদ্ধ । ত্রিচূনাপল্লী হইতে দেড় মাইল দূরে সুবিখ্যাত শ্রীরঙ্গম । ইহার তুল্য অদ্বুত মন্দির আমি ভারতে দেখি নাই । মন্দিরে একটি সমগ্র গ্রাম আছে । লক্ষা গমন কালে শ্রীরাম কাবেরী নদীর মধ্যস্থিত এই দ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন । দ্বীপের দৈর্ঘ্যতা ১৩ মাইল হইবে । ইহারই উপর শ্রীরঙ্গজীর মন্দির সংস্থাপিত । মন্দিরের ঘের প্রায় ৪ মাইল হইবে । প্রবেশ দ্বারের প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের দৈর্ঘ্যতা ৩৩ ফীট ও বেটন ১৫ ফীট হইবে । এইরূপ প্রতি সাড়ে তিনশত ফীট অন্তরে ছয় দ্বার পার হইতে হইবে । তাহার পর ২৫ ফীট উচ্চ ও ৪ ফীট বিস্তৃত চারিদিকে আর চারি চারি দ্বার পার হইতে হইবে । এই সপ্তদ্বার পার হইবার কালে এক এক দ্বারের পর মহুঘোর বসত বাটী, দোকান, বাজার, ধর্মশালা, দানশালা ও মন্দিরপূর্ণ এক এক গ্রাম লক্ষিত হইবে । একটা অতিথিশালা এত বৃহৎ যে তাহাতে সহস্র স্তম্ভ আছে । যাহা হউক এইরূপে সপ্তদ্বারের পর শ্রীরঙ্গজীর স্বর্ণবর্ণ কলসেমণ্ডিত অতি প্রকাণ্ড প্রধান মন্দির লক্ষিত হয় । তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে জড়ীভূত শ্রীরঙ্গজীর কমণীর মূর্তি । ছত্র দণ্ডাদি সমস্তই নিরেট স্বর্ণের নির্মিত । দেবতার আমবাে চতুর্দিক আকর্ষণ এবং সমস্তই বলমূল্য । হিন্দুব্যতীত অপর জাতি চতুর্থ দ্বারের পর আর প্রবেশ করিতে পারে না । ত্রিচূনাপল্লী ত্যাগ করিয়া প্রায় ৩৮ মাইল নিম্ন ভূমি বর্ষে বর্ষে জলপ্লাবিত হয় । এজ্জা পথ ৬ ফীট উচ্চ করা হইয়াছে । ইহার পর ৪০ মাইল ধাত্তক্ষেত্র পার হইয়া পুনরায় এপথে তানজোর দিয়া তৎসমীপস্থ পূর্ব বর্ণিত বাঙ্গালার জায় দেশ সকল দেখিতে দেখিতে সাগর তীরে নিগাপটম নগরে পঁতছিলাম । নিগাপটম হইতে ত্রিচূনাপল্লী পর্য্যন্ত ৭৮ মাইল মধ্যে ৮৯ সেতু । ইহার মধ্যে দ্বাদশটির খিলান প্রায় ৩০ ফীট । নিগাপটমে পুনরায় পূর্বসাগর দর্শন ইচ্ছা না হইলে প্রধান রেল অবলম্বন করিয়া ডিন্ডিগল চলিয়া যাইবে । সুদৃশ্য ডিন্ডিগল নগরের কেল্লা ৪০০ ফীট উচ্চ পর্বতোপরি সংস্থিত । পর্বতের শিখরে একটি উৎকৃষ্ট দেবমন্দির আছে । ডিঙিগল পার হইয়া দক্ষিণমুখে মহুরার সেতুবন্ধরামেশ্বরের ফেসন পঁতছিব । লক্ষা বাইবার জন্ত স্টিমার পাইতে ইচ্ছা হইলে বা কত্যা কুমারীতে গিয়া ভারতের শেষ সীমায় দাঁড়া-

ইতে ইচ্ছা হইলে টুইটিকরণ বা টিনিভেলি ফেসনে গিয়া রেল শেষ করিবে । কেবল সেতুবন্ধ দর্শন ইচ্ছা হইলে মহুরার পর আর ঘাইবার প্রয়োজন নাই । মহুরানগর ব্যাংক বা ভিগে নদীর ডাইনতটে সংস্থাপিত । সহরের চারিদিকে প্রাচীর পথগুলি অতি প্রশস্ত । এখানকার পার্বতীর মন্দির ভারতে সুবিখ্যাত । প্রায় ৭ বিঘা ভূমি ব্যাপ্ত করিয়া আছে । ত্রিমল-নাথকের চৌলট্রী অতি সুগঠিত । এই প্রশস্ত গৃহের ১২৫ স্তম্ভের খোদকারী অতি চমৎকার । প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষও দর্শনযোগ্য । একটা ভগ্ন গম্বুজ ৬০ গজ চৌড়া । মহুরা জেলার স্থানে স্থানে রৌপ্য উৎপন্ন হয় । এই স্থানের লোকেরা জাতা, জাতশূদ্র আদি একত্র হইয়া এক স্ত্রী বিবাহ করে । পূর্বে মহুরানগর প্রাচীন পাণ্ডাদিগের রাজধানী ছিল । এই পাণ্ড্যদেশে ঈর্জুন প্রকাশিত নারীতীর্থ । এই দেশে হালাস্মতীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ, বাকগতীর্থ, কন্যাকুমারীতীর্থ ও সূর্য্যারকতীর্থ । এই স্থানে দুর্গা সহ মহিষা-সুর যুদ্ধ হয় । এই দেশের উপকূলে মুক্তা জন্মে । এই দেশের লোক কাষ্ঠে মৃদঙ্গ ও নল, ফুলে মজা, ফলে তৈল, আঁশে রজ্জু আদি করিয়া এক নারিকেল রন্ধ বহুকপে ব্যবহার করে । এখানে লঙ্কার অমদানী অনেক, অপকৃষ্ট রত্ন স্থলভমূল্যে বিক্রীত হয় । চৈত্র বৈশাখ ও ভাদ্র আশ্বিন জ্যৈষ্ঠ তুলিবার কাল । প্রায় আড়াইশত নৌকা সমুদ্র মধ্যে নঙ্গর করে । ডুবুরীদের পৃষ্ঠে দীর্ঘে অর্দ্ধহাত ও প্রস্থে ১ গোয়া পাথর বাঁধা । হাতে চামড়া জড়ান ও অস্ত্র । গলায় জালের থলি ও তাহাতে দীর্ঘরশি লাগান । এবং পায়ের তলে একখান বড় পাথর । পৃষ্ঠের পাথরের বলে তরঙ্গ ভাসিয়া যায় না ও চল্লিশ হাত জলের নীচে হাঁটিয়া বেড়ায় । হাতের চামড়ার জন্ত জ্যৈষ্ঠ তুলিতে কষ্ট পায় না, গলায় থলিতে প্রায় ৫০০ করিয়া জ্যৈষ্ঠ তুলিয়া আনে । প্রায় আধঘণ্টা থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হইলে গলায় রশিতে টানদিলে নৌকার লোকে টানিয়া উঠায় । গলায় রশির এক প্রান্ত নৌকার লোকের হস্তে থাকে । পদতলের প্রান্তরের ঝোঁকে শীঘ্র জলের নিম্নে গিয়া পড়ছে । সাগরের জল স্বচ্ছ ও পরিস্কৃত, নিম্নের সকল দ্রব্য নিম্নে গিয়া স্নান দেখা যায় । ছাঙ্গরে আক্রমণ করিলে ডুবুরীরা জলখোলা করিয়া রক্ষা পায় অথবা অস্ত্রদ্বারা তাহাকে বধ করে । সময়ে

সময়ে গবর্ণমেন্ট ঝিণ্ডকের হাজার ত্রিশ টাকা বিক্রয় করেন । কাহারও অদৃষ্টে উত্তম মুক্তা বাহির হয়, কেহবা কিছুই পায় না ।

মহারা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে স্থবিধাত সেতুবন্ধ রামেশ্বর । যেখানে অযোধ্যাপতি রাম সাগর পার হইয়াছিলেন । মহারা হইতে বাতায়াত গাড়ী ভাড়া ১৫ টাকা । মহারার নিম্ন ভূমি অস্বাস্থ্যকর । তিনদিনের যত কমে হয় রাস্তা শেষ আবশ্যক । ভারত হইতে লক্ষা পর্য্যন্ত সাগর এখন ৬০ মাইল বিস্তীর্ণ । এই ৬০ মাইল বাণ্ড করিয়া ভাঙ্গা সেতু । সেতু প্রায় ১২ মাইল ভারতের সহিত সংলিপ্ত । ভারত হইতে ১ মাইল ভাঙ্গা । তাহার পর ১১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল বিস্তীর্ণ রামেশ্বর দ্বীপ, তদনন্তর প্রায় ১৬ মাইল ভাঙ্গা । জোয়ারের সময় এই স্থানে জল থাকে কিন্তু ভাটার সময় বালি ও পাথর জাগিয়া উঠে । এইটিকে 'রামঝড়কা' স্তম্ভের উপর হইতে সমুদ্রের উপর একটি কাল রেখার আয় দেখায় । তাহার পর সেতুর অংশ ১৮ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত লোক পূরিত মান্নার দ্বীপ । যাহা রামচন্দ্রের সেতুর অংশ ছিল এখন তাহা মান্নার দ্বীপ ও তাহার উপর কেল্লা-যুক্ত নগর । ইহার পর ২ মাইল ভাঙ্গা । এই ভাঙ্গা পার হইলেই লক্ষা । এখানেও জল বড় কম । এত কম যে ভাটার সময় মান্নার দ্বীপ হইতে মানুষ ও গরু পার হইয়া লক্ষা যায় । পূর্বে এই সেতুর উপর দিয়া লোকে লক্ষা বাতায়াত করিত । সমুদ্রের ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ১৪৮৪ খৃঃ অব্দ অবধি চলাচল বন্ধ হইয়াছে । এই সেতুর উভয় পার্শ্বে সাগরের জল কম ও অভ্যন্তরে বালি ও পর্বত । এই সকল ভাগ সেতুর অংশ ছিল । এজ্ঞা ক্ষুদ্র নৌকাদি ব্যতীত জাহাজ চলিতে পারে না । আমরা ব্যাগাক নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু দূরে ভারতের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া পূর্ব ও পশ্চিম সাগরের কিছু কাল লীলা দেখিতে লাগিলাম । ভয়ঙ্কর বানরী সেনা সহ সেই ধর্ম্মীর উপস্থিত হইলে সেতু বাঁধিবার সময় এখানে কি যমূল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল । আজ আমি নিস্তক্কে দণ্ডায়মান ? অরে আর্ধ্য-দের গৌরবের ভূমি । আমি শত শত নমস্কার করি । এ ডানিউব বাঁধা নাই । পার যে নজর হয় না ! একে দুর্দান্ত রাবণ । নল এ ভীষণ বিস্তার ক্রমে সরতে করিল, নয় পাশাণে বুনিয়াদ পত্তন করিয়া বাঁধিবার বিলক্ষণ

কৌশল আছে । বাতুল্য ভয়ে লিখিলাম না । আমরা পোতে রাত্রি নয়টায় আরোহণ করিয়া প্রাতে রামেশ্বর পৌঁছিলাম । সেতুর অংশ রামেশ্বর দ্বীপ নিম্নে বালুকাময় ও বাবলা বৃক্ষে আকীর্ণ । চাঁসের স্পর্শক নাই । দেবতার আদেশানুগারে কেহই দ্বীপে হুলকর্ষণ করিতে পারেনা । অধিকাংশ দ্বীপ বাসী দানের উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত করে । রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড ও খোদকারীতে পূর্ণ । দেখিতে অত্যন্ত চমৎকার । ইহার দ্বারদেশ প্রায় শত ফুট । উহার উপর অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর । চতুষ্পাশ্বকার এই সুবিস্তীর্ণ মন্দিরের দ্বারপ্রাণী দ্বারা আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম । পূর্বদিকের বারাণ্ডা মন্ত্রীসহ পলিগায় রাজমূর্তিপূর্ণ করিয়াছে । এই সকল প্রস্তর মূর্তির গঠন তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে । পলিগার রাজা এই স্থানে দানশালা স্থাপন করিয়াছেন । বাহিরে বিস্তর লিঙ্গমূর্তি । পূর্বদিকে প্রস্তরের উচ্চ বেদীর উপর কতকগুলি মূর্তি বসিয়া আছে । এই সকল দর্শন করিয়া আমরা রামেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইলাম । মধ্যস্থলে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি কুণ্ডমধ্যে সংস্থিত । কুণ্ডের উপর অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইয়াছে । লিঙ্গের নিম্নভাগ স্বর্ণমণ্ডিত, অনবরত মস্তকে গঙ্গাজল ও বিলুদল পড়িতেছে । অর্দ্ধ অঙ্ককার গৃহ ক্ষীণদীপশিখাযোগে জ্বলমান । চারিদিকে চন্দনের ছড়া ও ত্রিপুণ্ড্রপারীরা মহাদেবের স্তব করিতেছে, অভ্যন্তরে যাত্রীকে প্রবেশ করিতে দেয় না । এই মন্দির পবন বন্দর হইতে প্রায় ৯ মাইল দূর । পবন বন্দরে যাত্রীরা নৌকা হইতে নামিয়া থাকে । পথিকদের থাকিবার ধর্মশালা মন্দ নহে । অবিবাহিত পাণ্ডা মহাশয়ের বৈঠকখানাটা ইংরেজি প্রথায় নির্মিত । ভাগিনেয়েরা উত্তরাধিকারী হয় । নিকটে চৌলটি ও টোনা-খুড়ি বা নলমন্দির, নিকটস্থ সরোবর সাগর হইতে নীচ, তথাপিও ইহার জল স্নানার্থ । এখানে বিস্তর লোক স্নান করিতেছে । সেতুতে ভারতাবধি লক্ষাধিক ২৪ তীর্থ আছে । প্রথমে চক্রতীর্থ । এই স্থানে ধর্ম পুষ্করিনী, দেবীপট্টন ও নবপাশাণ স্থান । ইহাই সেতু মূল । ইহার পশ্চিমে রামের দর্ভশয্যা স্থান । তদনন্তর চক্রতীর্থ দক্ষিণে গন্ধমাদন, উত্তরে বৈতাল বরদ-তীর্থ । গন্ধমাদন সমস্ত সেতু আচ্ছন্ন করিয়া আছে । ইহার উপর পাণ-বিনাশাখ্য, সী এসর, মঙ্গল, অহুতকূপ, ব্রহ্মকুণ্ড, হুম্মৎকুণ্ড, অগস্ত্য তীর্থ,

রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ, জটা লক্ষ্মী, অগ্নি, চক্র, শিব, শঙ্খ, যমুনা, গঙ্গা, গয়া, কোটি, সাধামৃত মানস ও ধনুষ্কোটি অবশিষ্ট এই ২২ তীর্থ পরে পরে আছে, কত লোক ভক্তিভাবে স্তব করিতেছে। “দশযোজন বিস্তীর্ণং শত যোজন মায়তং । রামচন্দ্র সমাদিকং নলদণ্ডয় সঙ্কিতং । সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্ত ব্রহ্মহত্যাং বাপোহতি । দশকণ্ঠ শিরশ্ছেদ হেতবে সেতবে নমঃ । কেতবে রামচন্দ্রস্ত মোক্ষমার্গক হেতবে ॥”, সেতু আর কি তোমায় দেখিতে পাইব ! এখন বিদায় হই !!!

সম্পূর্ণ।

মসজীদবাগি ঙ্গিট ২ সংখ্যক ভবনে সেনযন্ত্রে

শ্রীহীরালাল ঘোষদ্বারা মুদ্রিত।

